KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভেনিউ, কল-১৩
Collection : KLMLGK	Publisher [illegible]
Title চতুরঙ্গ	Size 7"x9.5" 17.78 x 24.13 c.m.
Vol. & Number: 46/1 46/2 46/3 46/4 46/5	Year of Publication May 1985 Jun 1985 July 1985 Aug 1985 Sep 1985
	Condition : Brittle Good ✓
Editor : [illegible]	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

হুমায়ুন কবির এবং আতাউর রহমান-প্রতিষ্ঠিত

চতুরঙ্গ

জুন
১৯৮৫

চতুরঙ্গ

ভারতবর্ষ কি একজাতি-একদেশ? অতীতেও
কি তা ছিল? এদিনের বিচ্ছিন্নতাবাদের
রক্তাক্ত সমস্যাকে ভিন্ন এক মানদণ্ডে
বিচার করতে চেয়েছেন **শিবনারায়ণ রায়**—
এম জে আকবরের 'ইনডিয়া :
দ্য সীজ উইদিন' বইটির সমালোচনা সম্ভবত
উত্তপ্ত বিতর্কের ঝড় তুলবে।

ভারতে রাজনীতি এখন আত্মসুখসন্ধানীদের
কাছে এক লোভনীয় বৃত্তি হয়ে
দাঁড়িয়েছে—যা কয়েক দশক আগেও
ছিল দেশসেবা নামে সম্মানিত।
কেন এই অপগুণান্তর? রাজনৈতিক দলগুলির
ভূমিকা কী? **ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের**
'আলাদিন আর জিন' প্রবন্ধে
এইসব প্রশ্ন উত্থাপিত।

প্রাচীন এবং মধ্য যুগের বাঙলা
সাহিত্য সম্পর্কে বাংলাদেশে সাম্প্রতিক
গবেষণার বিবরণ দিয়েছেন **দেবীপদ ভট্টাচার্য**।

আরো চারজন তরুণ পাঠকের দৃষ্টিতে
'প্রগতি এবং দারিদ্র্য' প্রবন্ধের বিচার

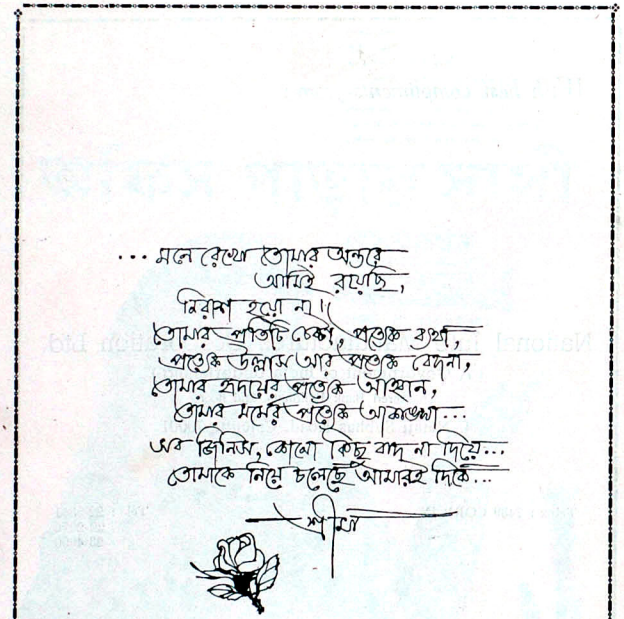

... মনে রেখো তোমার অন্তরে
আমিই রয়েছি,
নিরাশ হয়ো না।
তোমার প্রতিটি চেষ্টা, প্রত্যেক ব্যথা,
প্রত্যেক উল্লাস আর প্রত্যেক বেদনা,
তোমার হৃদয়ের প্রত্যেক আহ্বান,
তোমার মর্মের প্রত্যেক আকাঙ্ক্ষা...
সব জিনিস, কোনো কিছু বাদ না দিয়ে...
তোমাকে নিয়ে চলেছে আমারই দিকে...

— শ্রীমা

বর্ষ ৪৬। সংখ্যা ২
জুন ১৯৮৫
জ্যৈষ্ঠ ১৩৯২

আলাদিন আর জিন ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ৯৩
পদ্মাপারে বঙ্গসাহিত্যচর্চার কিছু নিদর্শন দেবীপদ ভট্টাচার্য ১০৬
তুলনামূলক সাহিত্য অমিয় দেব ১২৩

অন্ধের নিশ্চিত পা-ফেলা আবুল হোসেন ১০৩
শেষ কথা রঞ্জন ভাদুড়ী ১০৪
তার অনাথ উত্তরাধিকার সোফিওর রহমান ১০৫

পোকামাকড়ের ঘরবসতি সেলিনা হোসেন ৯৮
ক্রান্তদর্শী অন্নদাশঙ্কর রায় ১১৩
ঢোলগোবিন্দ-র আত্মদর্শন সুভাষ মুখোপাধ্যায় ১৩৩
বেনোজল সমরকুমার লাহিড়ী ১৪১

গ্রন্থসমালোচনা ১৪৭
শিবনারায়ণ রায়, অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অলোক রায়,
বারিদবরণ ঘোষ, ভাস্কর মুখোপাধ্যায়, আবদুর রউফ

ঢাকার চিঠি ১৬৫
সৈয়দ আবুল মকসুদ

আলোচনা ১৬৮
ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, রাজ্যেশ্বর মিত্র

স্মরণে ১৭৩
জগদীশ ভট্টাচার্য, সন্তোষ গঙ্গোপাধ্যায়

পাঠকের দৃষ্টিতে ১৭৫
পুষ্কর গুপ্ত, অসীমকুমার মুখোপাধ্যায়,
পৃথ্বীশ সানা, নীলমণি ধর

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম. ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

প্রচ্ছদচিত্র : রনেনআয়ন দত্ত

মুখপাতের ছবি। মুর্তজা বশীর
শিল্পপরিকল্পনা। রনেনআয়ন দত্ত
প্রধান সম্পাদক। রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত

বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য কর্তৃক সম্পাদিত, শ্রীমতী নীরা রহমান কর্তৃক নবজীবন প্রেস, ৬৬ গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ থেকে অন্তরঙ্গ প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে মুদ্রিত ও ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত। ফোন : ২৭-৬৩২৭

কলিকাতা বিমান-বন্দরের কাছে গড়ে উঠছে শিল্পীদের গ্রাম

arts acre

(একটি শিল্পমহাবিদ্যালয়সহ অতিথিশালা, প্রেক্ষাগৃহ, প্রদর্শনীশালা, পাঠাগার, শিল্পীদের বাসগৃহ ও অন্যান্য কর্মশালা)

আমরা সকল শিল্প-পিপাসু জনসাধারণের কাছে আর্থিক সাহায্যের আবেদন জানাই

ইচ্ছুক দাতাদের কাছে অনুরোধ তাঁরা তাঁদের দান ব্যাঙ্ক-ড্রাফ্‌ট, চেক অথবা মনি অর্ডার "আর্টস একর" এই নামে কেন্দ্রীয় কার্যালয় ৩৭সি কলেজ রো কলিকাতা ৯, এই ঠিকানায় সরাসরি পাঠিয়ে দিন।

বি: দ্র: ১৯৬১ সালের আয়কর আইনের ৮০ জি ধারা অনুযায়ী এই দান আয়কর-ছাড়যুক্ত।

We produce to share :

Life like machines in the hand of production-conscious workers responds through hard work which today we call productivity.

As a part of the Keysector of economy, Durgapur Steel responds to the call of greater productivity and shares its responsibilities in realising the hopes and aspirations of the nation.

STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED

DURGAPUR STEEL PLANT

বিড়িওয়ালা (লিনোকাট)। মূর্তজা বশীর

আলাদিন আর জিন

ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

আজ মনে হয়, এ কোনো প্রাগৈতিহাসিক অন্ধকার যুগের কথা।

১৮৩২ সালে ব্রিটেনের পারলামেনট যখন রিফরম অ্যাকট পাস করল, অর্থাৎ ভোটের অধিকার প্রসারিত করে, সর্বসাধারণের মধ্যে নয়, কেবলমাত্র মধ্যবিত্ত শ্রেণী পর্যন্ত পেঁছে দিল, তখন রক্ষণশীল টোরি দলের নেতা ডিউক অব ওয়েলিংটন আক্ষেপ করে বললেন, "এর পর থেকে কোনো ভদ্রলোক আর পাবলিক অ্যাফেয়ারসে, অর্থাৎ রাজনীতিতে যোগ দিতে পারবেন না।"

স্বনামধন্য ওয়াটারলু-বিজেতা 'ভদ্রলোক' বলতে যে শ্রেণীকে বুঝিয়েছিলেন, সমাজের সেই মুষ্টিমেয় উচ্চতম শ্রেণী তো রাজনীতিতে তাঁদের আধিপত্য অনেক দিন হল হারিয়েছেন। আমাদের সমাজের উদারতর সংজ্ঞা অনুযায়ী যাঁরা ভদ্রলোকের মর্যাদা পেয়ে থাকেন, আমাদের রাজনীতিতে তাঁদেরও প্রভাব-প্রতিপত্তি সংকুচিত হয়ে আসবে, সর্বব্যাপ্ত ভোটের অধিকারের যুগে তাকে অনিবার্যই বলা চলে। ইতর-ভদ্র ভেদাভেদজ্ঞানটাই এখনকার দিনে, প্রায় বলা যায়, অভদ্রোচিত।

অন্য ভেদাভেদ

বেশ কথা। শ্রেণীভেদ অনুযায়ী অধিকারভেদ যত কমে আসে, শুধু তত্ত্বের দিক থেকে নয়, ব্যবহারিক দিক থেকেও যত কমে, ততই ভালো, গণতন্ত্র ততই সার্থক। কিন্তু গণতন্ত্রের স্বার্থেই, কিছু শ্রেয়োবোধ রাজনীতিতে সক্রিয় থাকা প্রয়োজন। ভদ্র রীতি-নীতি ; শিষ্টতা ; শুধু নিজের নয়, অপরের অধিকার সম্পর্কেও বিবেচনা ইত্যাদি সভ্য সমাজের ধরন-ধারন রাজনীতিতে অভিপ্রেত বলে মানতে হয়। অবশ্যই সে আদর্শ থেকে বিচ্যুতি ঘটতে পারে—সে বিচ্যুতি অনিচ্ছাকৃত হতে পারে, সাময়িক উত্তেজনার কারণে হতে পারে, আবার কখনও-বা রণকৌশলের প্রয়োজনে ইচ্ছাকৃতও হতে পারে। তাতে মারাত্মক কোনো ক্ষতি হয় না, যদি না সেই আদর্শটাকেই কোনো এক রাজনৈতিক পন্থা থেকে বিচ্যুতি বলে রাজনীতিকেরা ভাবতে আরম্ভ করেন।

সংসদীয় গণতন্ত্রে রাজনীতিকের লক্ষ্য শেষ পর্যন্ত রাজ্যবিধানসভায় কিংবা লোকসভায় পেঁছনো, কেননা রাজনৈতিক ক্ষমতা সেখান থেকেই হাতে আসে। এবং সব রাজনীতিকই জানেন, সেখানকার সভাকক্ষে সভ্যজনোচিত বিধিনিয়ম খুব বেশি দূর পর্যন্ত অগ্রাহ্য করলে কক্ষ থেকে বহিষ্কারের আদেশ আসতে পারে। তা যদি না হত, অচিরে সভার কাজ অচল হয়ে পড়ত।

কিন্তু রাজনীতির উদার ক্ষেত্র থেকে কে কাকে বহিষ্কার করবে? দল থেকে বহিষ্কার করতে পারেন দলীয় কর্তৃপক্ষ, নির্বাচনের সময়ে বিমুখ হতে পারেন ভোটার, নির্বাচিত হলেও সে নির্বাচন খারিজ করতে পারেন নির্বাচনী

কর্তৃপক্ষ, কিন্তু 'আমার পিতার গৃহে অনেক মহল'। কোথাও না কোথাও গিয়ে রাজনৈতিক পুনর্বাসন অবশ্যই হবে। কোনো না কোনো স্তরে নেতৃত্বের আস্বাদ যিনি একবার পেয়েছেন, হাতির শুঁড়ের মতো তাঁর ঘ্রাণেন্দ্রিয় সর্বদা উঁচু করে তোলা থাকে, কোনো দিক থেকে বাতাসে ক্ষমতার গন্ধ ভেসে আসে। কার সাধ্যি তাঁকে সেই গন্ধের অনুসরণ থেকে নিরস্ত করে।

কিছু লোক আছেন

সভাকক্ষের বাইরে রাজনীতিকের কোনো আচরণবিধি নেই। ডাকতারদের যেমন মেডিক্যাল কাউন্সিল আছে, যার তালিকা থেকে নামকাটা গেলে বৃত্তিলোপ ঘটে, সেরকম কোনো অরাজনৈতিক সংস্থাও রাজনীতিকদের জন্যে নেই, যার প্রবর্তিত আচরণবিধি ভঙ্গ করলে রেজিসটার থেকে নাম কাটা যেত, এবং তার ফলে রাজনীতিকের বৃত্তি ত্যাগ করতে হত। হায়, এ অলীক কল্পনা। সবাই জানেন, রাজনীতি কোনো বৃত্তি নয়, ব্রত। জনসাধারণের প্রতিনিধি হয়ে, হয় সরকারি ক্ষমতা হাতে নিয়ে নয়তো সরকারের বিরোধিতা করে, আজীবন দেশের এবং দশের—বিশেষ করে যারা নিপীড়িত বঞ্চিত শোষিত তাদের—সেবা করে যাওয়ার ব্রত।

আজকের দিনে এই কথাগুলো কানে বিদ্রূপের মতো শোনাতে পারে বটে। কিন্তু এ কথাও না মেনে কোনো উপায় নেই, গণতন্ত্রের ধারণাটাই যদি অলীক কল্পনা-বিলাস না হয়, অর্থাৎ বাস্তব জগতে তার যদি কোনো ভিত্তি থাকে, তবে অবশ্যই ধরে নিতে হবে—কিছু লোক আছেন যাঁরা ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো সময়ের অপব্যয় বলে মনে করেন না, যাঁরা পাবলিক অ্যাফেয়ারসে নিজেদের নিয়োজিত করতে প্রস্তুত, যাঁরা পাড়ায় জনজাল জমলে পাড়াসুদ্ধ লোকের পক্ষ নিয়ে করপোরেশনের অফিসে গিয়ে হাজির হন, যাঁরা গ্রামে জলকষ্ট হলে জেলাসদরে গিয়ে সরকারি অফিসে অশান্তি করেন। বেশির-ভাগ লোকই এসব ঝুটঝামেলা থেকে শতহস্ত দূরে থাকবেন, এঁরা এগিয়ে এসে ঘাড় পাতবেন। এঁরাই ধাপে-ধাপে গ্রাম থেকে অঞ্চল, তারপর জেলা স্তরের স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসনে উঠে আসবেন, তারপর রাজ্য-বিধানসভায়। তাঁদের মধ্যে কেউ-কেউ হয়তো ভারতীয় সংসদ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছবেন। গণতন্ত্রের এই হল প্রত্যাশা। এ প্রত্যাশা যদি সম্পূর্ণ অবাস্তব হয়, তা হলে গণতন্ত্রই অবাস্তব।

তা নয়। গণতন্ত্র সম্পূর্ণ অবাস্তব নয়। আবার সম্পূর্ণ বাস্তবও নয়। সত্য এবং অহিংসার মতো গণ-তন্ত্রও একটা আদর্শ। তার অভিমুখে আমরা অগ্রসর হতে পারি কিন্তু কোনো দিন বলতে পারব বলে মনে হয় না—"লক্ষ্যে পৌঁছে গেছি, পূর্ণ গণতন্ত্র কায়েম করেছি।"

গণতন্ত্রে রাজনীতিক

সে আশা করি না। তার একটা কারণ, যে যতই বলুক জনসাধারণের রাজনৈতিক চেতনা ইত্যাদির কথা, শেষ পর্যন্ত দেখা যাবে, গণতন্ত্রের প্রধান নির্ভরতা সৎ, সক্ষম, সক্রিয় রাজনীতিকদের ওপর। জনসাধারণের রাজনৈতিক চেতনা যতই প্রবল হোক, গণতান্ত্রিক শাসনের এমন কোনো ব্যবস্থা আজ পর্যন্ত কোথাও কার্যকর হয়েছে কিনা সন্দেহ (প্রাচীন গ্রীস এবং আধুনিক সুইজার-ল্যানডের কথা বাদ দিলে), যাতে জনসাধারণ, এমনকি পরোক্ষভাবেও, নিজেরাই নিজেদের শাসন করে থাকে। তাহলে গণতন্ত্রে শাসন করে কে? আমাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা মানে তো আমরাই। গণতন্ত্র মানেই তো তাই। ডেমক্র্যাসির হুবহু তরজমা গণতন্ত্র—অর্থাৎ যে শাসনব্যবস্থায় জনগণ সর্বেসর্বা। বিলক্ষণ। জনগণই তো সর্বেসর্বা, সবার ওপরে তারাই মালিক।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শাসনভার যাঁদের হাতে, গণতন্ত্রে তাঁরা হলেন রাজনীতিক। নানা 'তন্ত্রে' নানা ধরনের ব্যবস্থা। রাজতন্ত্রে রাজা শাসন করেন, গোষ্ঠীতন্ত্রে একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠী নিজের হাতে ক্ষমতা তুলে নেয়, ইত্যাদি। অবশ্য কোনো কোনো রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর মতে, নামে যে 'তন্ত্র'ই চালু থাক, কাজে দেখা যায়, সমাজের একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীই দেশশাসন করছে। সে তর্ক আপাতত দূরে থাক। যা নিয়ে কোনো তর্কের অবকাশ নেই, তা হল—গণতন্ত্রে ক্ষমতার হাতবদল হয়, আজকের সরকারি দল কাল সরকার-বিরোধী দলে পরিণত হয়, জনসাধারণ ভোট দিয়ে কখনো রামকে গদিতে পাঠান, কখনো শ্যামকে। সেই বাছাইয়ের অধিকার জনসাধারণেরই

বটে। কিন্তু তাকে বাছাই করতে হয় রাজনীতিকদের মধ্যেই কাউকে না কাউকে। ক্ষমতা কাল যাঁদের হাতে ছিল তাঁরাও রাজনীতিক, আবার আজ নতুন যাঁদের হাতে দিলাম তাঁরাও রাজনীতিক। তোমাদের রাজত্ব, এবং ক্ষমতা, এবং গরিমা, চিরতরে, চিরতরে, চিরতরে।

তিনি কেমন হবেন?

তা, সে রাজনীতিক, তিনি যে দলেরই হন, কেমন হবেন? বাস্তবকে স্বীকার করবার পরও আমাদের প্রত্যাশা যেটুকু অবশিষ্ট থাকে তা হল : তিনি স্বার্থচিন্তাশূন্য হবেন না জানি, কিন্তু তাঁর নির্বাচকমণ্ডলীর স্বার্থ এবং তার ওপরে দেশের স্বার্থও মনে রাখবেন ; ক্ষমতা চাইবেন জানি, কিন্তু ক্ষমতার লোভে ধর্ম বিসর্জন দেবেন না ; তাঁর পদের উপযুক্ত এবং জনপ্রতিনিধি হিসেবে প্রাপ্য মানমর্যাদা এবং সুযোগ-সুবিধা আদায় করে নিতে ভুল-বেন না জানি, কিন্তু সেসব পেয়ে যেন মাথা ঘুরে না যায় তাও দেখবেন ; নিজের দায়িত্ব এবং পদমর্যাদা অনু-যায়ী জীবনযাত্রার মান এবং তদুপযোগী আর্থিক সংস্থান তাঁর জন্যে থাকবে, অবশ্যই তা চাইবেন, কিন্তু প্রভূত ধনসম্পদের লোভ পরিহার করবেন। সর্বোপরি, দেশের আইন মেনে চলবেন, তা সে ট্রাফিক আইনই হোক, অস্ত্র-আইনই হোক, আর ভ্রষ্টাচারনিরোধক আইনই হোক। আক্ষরিক অর্থে এবং গভীরতর তাৎপর্যে আইন মানবেন। ইন লেটার অ্যানড স্পিরিট।

আরও একটা কথা তিনি মনে রাখবেন। সমাজ-তান্ত্রিক শাসনে দেশের আপামর সাধারণের ভালো করবার জন্যে সরকারের হাতে এখন প্রভূত ক্ষমতা। তবু তাকেও ছাপিয়ে গিয়ে, যে ক্ষমতা আইন দেয় নি, তার দিকে হাত বাড়াবার লোভ দমন করাই ভালো। কেননা, ক্ষমতা ক্রমশ বাড়িয়ে দেয় ক্ষমতার লোভ, অবিধেয় উপায় সব উদ্দেশ্যকে শেষ পর্যন্ত একেবারে হজম করে ফেলে। সদুদ্দেশ্য দিয়ে বাঁধানো সড়ক সরাসরি স্বেচ্ছাচারের নরকে পৌঁছে দেয়। লোকে ধরে নিতে আরম্ভ করে—মুখে যিনি যত বড়ো-বড়ো নীতির কথা বলেন, বড়ো-বড়ো আদর্শের প্রতি অবিচল আনুগত্য ঘোষণা করেন, আসলে তিনি তলে-তলে দুর্নীতি আশ্রয় করেন তত বেশি। এর থেকে জনসাধারণের মনে যে-কোনো সৎ সংকল্প এবং সাধু প্রচেষ্টার প্রতি একটা অবিশ্বাস জন্ম নেয়। এই অবিশ্বাসের চেয়ে বড়ো শত্রু গণতন্ত্রের আর নেই।

অবিশ্বাসের কারণ

অবিশ্বাসের কারণ গণতন্ত্রে অহরহ জন্মায়। তার কারণ গণতন্ত্রের প্রক্রিয়াটা বড়ো বেশি কথার ওপর ভর দিয়ে চলে। নির্বাচনের সময় বড়ো-বড়ো কথার ঝড় বয়ে যায়। ছোটো-বড়ো নেতারা ছোটো-বড়ো সভায়—এবং প্রচার-মাধ্যমগুলির সহায়তায় বড়ো-বড়ো কথা, সংকল্পের কথা, আদর্শের কথা, উপদেশ দেশময় অনবরত ছড়িয়ে দেন। মন্ত্রীদের তো কথাই নেই। মন্ত্রীর মুখের বচন না হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন থেকে আরম্ভ করে রিকশা-স্ট্যানডের উদ্বোধন পর্যন্ত কিছুই সুসম্পন্ন হয় না। এবং কথা বলতে গেলেই তাঁদের এমন অনেক কথা বলতে হয় যা, তাঁরা আশা করেন, হাওয়ায় ভেসে হাওয়াতেই মিলিয়ে যাবে ; যা, তাঁরাও জানেন—কাজের কথা নয়, কথার কথা।

আশ্চর্য লাগে, তবু গণতন্ত্রের ওপর লোকের আস্থা উঠে যায় নি। তবু লোকে আশা করে গণতন্ত্রের রাজ-নীতিকেরা যেমনই হোন, গণতন্ত্রের রাজনীতির মধ্যে সারবস্তু কিছু আছে। তাই এখনও গ্রামাঞ্চলে পর্যন্ত শতকরা ৭০-৮০ ভোট পড়ে। কিন্তু তাই বলে মনে করা উচিত নয়, গণতন্ত্রের রাজনীতিকের ওপর বিশ্বাস এবং আস্থা লোকের যতই কমুক, গণতন্ত্রের রাজনীতির উপর আস্থা চিরদিন অটুট থাকবে। রাজনীতিকদের সময় থাকতে অবহিত হওয়া উচিত, রাজনৈতিক দলগুলির উচিত, নির্বাচনী ইশতাহার এবং স্লোগান রচনায় মুনশিয়ানা কতটা দেখানো যায় সেদিকে মনোযোগ একটু কম দিয়েও, দলের চরিত্রটাকে সাধারণের আস্থাভাজন কী করে করা যায় সেদিকে একটু বেশি নজর দেওয়া।

দলীয় চরিত্রের কথা বলতে গেলে, দেশের বৃহত্তম রাজনৈতিক দলের চরিত্রেই কলঙ্ক সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে। কিছুদিন আগে কলকাতার ইংরেজি সাপ্তাহিক 'সানডে' ভারতীয় রাজনীতির অপরাধের জগৎটার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিয়েছিল। সেই সংখ্যাটিতে অবশ্য

বোমবাইয়ের অপরাধের জগতের পাণ্ডা বলে কথিত এক ব্যক্তি বুক ঠুকে ঘোষণা করেছিলেন, "পলিটিকস মে সব চোর হ্যাঁয়।" কিন্তু সমগ্রভাবে তাতে প্রকাশিত যাবতীয় বিবরণ পড়ে ধারণা হয়, কংগ্রেসই দুহাত প্রসারিত করে বড়ো উদার আহ্বান জানিয়েছিল, "কে কোথায় আছ ধান্দাবাজ, ডান্ডাবাজ, কালোবাজারি, চোরাকারবারি, এসো আমার বুকে আশ্রয় নাও।"

অস্বাচ্ছন্দ্য

শ্রী রাজীব গান্ধী শুধু দেশের প্রধানমন্ত্রী নন, কংগ্রেসেরও সভাপতি। তিনি অবশ্যই এ বিষয়ে অবহিত। নির্বাচনের আগে যে হারে তিনি পুরনোদের ছাঁটাই করেছিলেন তাতে ধারণা হয়েছিল, এবারে নতুন, পরিচ্ছন্ন চেহারার কংগ্রেস দেখা যাবে, আবার অনেক দিন পরে। সে আশা এখন দেখা যাচ্ছে কংগ্রেসের নবীন সভাপতি সর্বাংশে পূর্ণ করতে পারেন নি। নানা জায়গা থেকে এখনও খবর আসছে, কংগ্রেসে কোথায় কোনো পরিচিত অপরাধী, কোনো সমাজবিরোধী এখনও বহাল তবিয়তে আসর জাঁকিয়ে বসে আছে। এসব খবর যদি সত্যি নাও হয়, যদি মিথ্যা অপবাদই রটে থাকে কোনো-কোনো ভালো লোকের নামে, তবু সাধারণভাবে এ ধারণা এখনও বেশ বলবৎ—এ রাজনীতিতে ভালো লোক কোণঠাসা, যারা মন্দ তাদেরই বোলবোলাও। অন্তত এটুকু আমরা বাইরের লোকেরাও বুঝতে পারি, ঠিক এই মুহূর্তে রাজনীতির যে ধারাটা আমাদের দেশে প্রবল, একজন সৎ, বিবেকবান এবং শোভন স্বভাবের লোক তাতে অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন।

এর একটা উদাহরণ সম্প্রতি হাতে এল। কলকাতার একাধিক সংবাদপত্রে একটি খবর বেরিয়েছে। তাতে প্রকাশ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কংগ্রেসের সভাপতিকে শ্রীঅশোক সেন নাকি এক চিঠিতে জানিয়েছেন, কলকাতা করপোরেশনের আসন্ন নির্বাচনে কংগ্রেস থেকে এমন কোনো-কোনো ব্যক্তিকে মনোনীত করা হয়েছে যাঁরা সমাজবিরোধী বলে পরিচিত, জোর করে সৎ লোকদের কাছ থেকে টাকা আদায় করে থাকেন, ইত্যাদি। এবং, শ্রীঅশোক সেন নাকি লিখেছেন, শ্রীপ্রণব মুখোপাধ্যায় নিজের মুখে তাঁর কাছে স্বীকার করেছেন, এইসব ব্যক্তিকে মনোনয়ন দিতে তিনি বাধ্য হয়েছেন। কেননা, তা না হলে কেউ-কেউ নাকি পদত্যাগ করতেন।

এই হল খবর। চিঠির মর্ম, আগেই বলেছি, একাধিক কাগজে বেরিয়েছে। চিঠির কথা কংগ্রেসের কেউ সরাসরি অস্বীকার করেন নি, যদিও শ্রীপ্রণব মুখোপাধ্যায় তারপর ঘোষণা করেছেন, অবাঞ্ছিত কোনো ব্যক্তিকে কংগ্রেস মনোনয়ন দেয় নি, যাদের দেওয়া হয়েছে তারা সবাই পরোপকারী, সচ্চরিত্র, সমাজসেবক।

এদিকে ১৭ মে-র আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত একটি রিপোর্টে বিশেষ বিশেষ দলীয় প্রার্থীর নাম উল্লেখ করে, তাঁদের সম্পর্কে সমাজবিরোধী, অপরাধমূলক কাজকর্মের অভিযোগের উল্লেখ করা হয়েছে। এই বিবরণীতে অবশ্য শুধু কংগ্রেসের নয়, বামফ্রন্টের প্রার্থীর নামও আছে।

সাধারণ সংবাদপত্রপাঠকের পক্ষে এর পর কী ধারণা করা স্বাভাবিক? হতে পারে সব খবরই ভুল। কিংবা হতে পারে, সমাজবিরোধী বলে যাঁদের উল্লেখ করা হয়েছে, জনসেবার উৎসাহের আধিক্যে, কিংবা যৌবনধর্মের স্বভাবে, তাঁরা কখনো-সখনো একটু-আধটু ভুলচুকই খালি করে ফেলেছেন, তার বেশি কিছু নয়। এ কথাও ঠিক—পাড়ার পাঁচজনের বিপদে-আপদে এইসব যুবকেরাই, যারা পুজোর সময়ে চাঁদার জন্যে একটু জোর-জুলুম করে থাকেন, তাঁরাই আবার এগিয়ে আসেন।

আলাদিনের জিন

এবং একথাও অতি অবশ্য ঠিক, নীচের তলার রাজনীতি দীর্ঘকাল ধরে এইসব যুবকবৃন্দের সাহায্য নিয়ে এসেছে। সেদিক থেকে দেখতে গেলে, রাজনীতির একে অপর পিঠ বলা যেতে পারে। এর কথা পাঁচজনের কাছে বলে বেড়ানোও চলে না, আবার এ না হলেও চলে না।

রাজনীতির সঙ্গে যাঁদের প্রত্যক্ষ কারবার, তাঁরা এসব খবর রাখেন, অন্যরাও মাঝে-মাঝে তার আঁচ পায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও আদর্শপরায়ণ, সৎ, পাবলিক অ্যাফেয়ারসে আগ্রহী ব্যক্তিরা রাজনীতির পথে এগিয়ে এসেছেন। বর্তমানে কি সেখানে এমন একটা আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছে যে তাঁরা সেখানে অপাঙ্‌ক্তেয়? কেন এমন হল?

যারা লোকচক্ষের আড়ালে থেকে রাজনীতিকের প্রয়োজনীয় সংগঠনের নীচের তলাকার কাজ এতদিন অল্পস্বল্প কোনো পুরস্কারের আশায় করে এসেছে তারা কি এখন প্রকাশ্যে এসে নিজেদের কাজের পুরো দাম চুকিয়ে নিতে চাইছে? নাকি, তারা মনে করছে, আলাদিনের জিন হয়ে আর থাকব না, এবার আলাদিন হব?

এই বিপদ থেকে গণতন্ত্রকে রক্ষা করবার উপায় নির্ধারণ করা সর্বাগ্রে প্রয়োজন, রাজনীতিকদের পক্ষেই প্রয়োজন। কেন-না, গণতন্ত্র না থাকলে রাজনীতিকও থাকবেন না।

পোকামাকড়ের ঘরবসতি

সেলিনা হোসেন

ওদের যাত্রার প্রস্তুতি প্রায় শেষ। করম আলী মিঠে পানির ঘড়া নিয়ে নৌকোয় তুলছে। শিলনোড়া ঘাড়ে বাদল নেমে গেছে অনেকক্ষণ। মালেক বালুর মধ্যে পা দাবিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। এটা ওর প্রিয় অভ্যেস। অভ্যেসগুলো অনেকের সংগে মেলে না বলে বাঁকা চোখে দেখে কেউ-কেউ, আসলে কোনো কারণ নেই। তবুও এমনই হয়, এমনই হয়—ও নিজেকে সান্ত্বনা দেয়। এই মাটি, জলবায়ু, নদী, সাগর, গাছপালা এভাবেই চলে আসছে, মালেক সেখানে একটা সংযোজন মাত্র। সেজন্যেই ওর প্রিয় অভ্যেস নিয়ে আলাদাভাবে বাঁচতে পারে না, বাঁচা যায় না। অভ্যেসগুলো সকলের সংগে এক না হলে কেমন যেন একঘরে হতে হয়, তবু এসব ও ছাড়তে পারে না। ও বিড়বিড় করে—ছাড়া উচিতও নয়। ছাড়লে নিজের থাকে কী! ও দুপদাপ পা ফেলে বেশ খানিকটা দ্রুত হেঁটে আসে। নদীর কান্দায় কুইচ্চা ধরতে যেতে হবে ওকে। ছোটো-ছোটো মাছ দিয়েও বড়শির টোপ হয়, তবু কুইচ্চা লাগে, এটাই হাঙরের প্রিয় খাবার। দেখতে লাল রঙের, অনেকটা লিকলিকে সাপের মতো। ধরতে খুব খারাপ লাগে। তবু উপায় নেই—কাজটা ওকে করতেই হয়। মুনসী, মেহের, করম সুবিধে করতে পারে না। বেতের ডোলা আর কোদাল ঘাড়ে নিয়ে পারাবনের ভেতর দিয়ে নদীর দিকে যেতে হয়। বেতের ডোলায় ছ-সাত দিন একনাগাড়ে কুইচ্চা ভিজিয়ে রাখলে কিছু হয় না, দিব্যি তাজা ফটফটে থাকে।

মেঘলা বলে আজ তেমন গরম নেই, বেশ ঠাণ্ডা বাতাস আসছে নদীর ওপর থেকে। এদিকে কাদা তেমন নেই, জোয়ারের জল এত দূর এগোয় না। গুনগুনিয়ে গান গেয়ে হাঁটবার সময় ঘাসের লতায় পা আটকে গেলে হোঁচট খায়। হঠাৎ মনে হয়, কাছ থেকে হাসির শব্দ আসছে। হাসিটা পরিচিত। পায়ের নীচে লগলগে মাটি বুঝি আলগা হয়ে যাচ্ছে। ও ডোলা রেখে গাছের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়ায়। শুকুরের ভারি মোটা কণ্ঠ বুঝতে অসুবিধে হয় না। পায়ের আঙুলের মাথায় দাঁড়িয়ে ওদের অবস্থাটা দেখে। ডান দিকের বাঁধের মাথায় বড়ো পাথরের ওপর সাফিয়া বসে আছে। ভঙ্গিটা মালেকের কাছে দুর্বিনীত মনে হয়—মুহূর্তে তেতো হয়ে ওঠে জিভ। ওর একটু নীচে শুকুর, বিগলিত এবং কামার্ত। সাফিয়ার হাঁটুর ওপর শুকুরের থুতনি। সে

হাসছে। সাফিয়ার মুখ নীচু, শুকুরের চুলের ভেতর হাত, কখনো ঠেলে দেয়, কখনো কাছে টানে।

মালেকের বুকের ভেতর দপদপানো রাগ—বাড়ছেই, বাড়ছেই। রুদ্ধ অক্ষমতার সংগে বিবমিষা।

ও আর দাঁড়ায় না। অন্য পথে দ্রুত নদীর কান্দার পথে নেমে যায়, ডোলাটা ছুঁড়ে ফেলে কোদাল দিয়ে মাটি কোপায়। দরদরিয়ে ঘাম পড়ে। কেবলই ভেসে ওঠে সাফিয়ার সুখী চেহারা, ভাবে গদোগদো। ওর কোদাল থেমে যায়। শুকুর একটা গুন্ডা। আসলে ও শুকুর না—শুয়োর। দুজনে কবে কখন এত কাছাকাছি এল একটুও টের পায় নি। বাড়ি-ফেরার কথা ভুলে যায়। জলেকাদায় মাথামাখি হয়ে সারাদিন কুইচ্চা তুলে ডোলা ভরতি করে দিলে। ওগুলো নৌকোয় মেহেরের কাছে পেঁছে দিতেই ও আঁতকে ওঠে—অ মা, অ্যাতক্কিন? অ্যাত কম সময়ত ক্যানে পারিলা?

—শালা, দিয়ম পোন্দে লাথি। হুদা ত্যালানি।

মেহের অপ্রস্তুত হয়ে যায়।

—আপনার যে ক'ত্তে কী হয় ন বুঝি।

—চুপ, শালা।

মালেকের টকটকে লাল চোখের দিকে তাকিয়ে মেহের আর কথা বলে না। নদীর পানিতে গোসল সেরে ভিজে লুঙ্গি সপসপিয়ে ঘরে ফেরে মালেক। খিঁচিয়ে-থাকা মেজাজকে কিছুতেই বাগে আনতে পারে না।

—মালেক আইস্যোস না?

মায়ের কথার জবাব দেয় না। দুপদাপ শব্দে জানান দেয় যে ও এসেছে। ঘরে কেউ নেই। সালেকটা কখনো ঘরে থাকতে চায় না, আজ ওকে আচ্ছামতো পিটুনি দেবে। লুঙ্গি বদলে একগামলা ভাত খায়। শাঁটকির ভরতা বাটা ছিল। সারাদিনের ক্ষুধায় একগামলা ভাত অমৃত। ভাত ওর ভীষণ প্রিয় খাবার, ভাত ছাড়া অন্যকিছু খেতে ভালো লাগে না।

—অ বাবা, কতা না কর ক্যা?

—বেশি বকবক ন কইরগ্যা, মা।

বুড়ি কথা বলে না। একটু পরে শোনা যায় গুনগুন কান্নার ধ্বনি। ভাত খেয়ে বেরিয়ে আসে ও। মার কান্নায় আজ ওর বিরক্তি।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। নারকেলগাছের মাথার ওপর পাখির কিচিরমিচির। মনে হয় যেন প্যারাবনে শোনা হাসির শব্দ—চটুল এবং ছিনালিপনায় ভরা। দ্রুত হেঁটে সাফিয়ার ঘরের সামনে এসে দাঁড়ায়। ঝাঁপ ঠেলে উঁকি দিতেই দেখল, ও মুক্তোর দালাল হাবিবের সংগে কথা বলছে। জয়গুন কুয়োতলায় বাসনকোসন ধোয়ায় ব্যস্ত। ঝাঁপ সরিয়ে ঢুকে পড়ে মালেক।

—ওমা, তুই ক'ত্তে আইলা?

—ন দেখর ক'ত্তে?

মালেক বারান্দায় উঠে বসে। হাবিব তড়িঘড়ি বলে, আঁই অন যাই গই সাফিয়া বু।

—আইচ্ছা। কালুয়া আইস্যো।

হাবিব অন্ধকারে মিলিয়ে যাবার পরও মালেক চুপচাপ বসে থাকে। ও চলে গেলেও মনে খুশি জাগে না, বরং অবসাদ আর ক্লান্তি ওকে বিমর্ষ করে তোলে।

—কতা ন কওজ্যে? ভাসান দিবা ক'ত্তে?

—পরুয়া।

মালেক ঠাণ্ডা মাথায় জবাব দেয়। কী যে হয়! যে উত্তেজনা নিয়ে এসেছিল তার এককণাও এখন আর নেই। সাফিয়ার দিকে তাকাতে ইচ্ছা করে না—প্রবল ঘৃণা গলগলিয়ে উঠছে। শ্লাবিত হচ্ছে বুক, কণ্ঠনালী, জিহ্বা, মুখের ভেতর। সাফিয়া কাছে এসে বসতেই ও চেঁচিয়ে বলে, এইবার উগ্যা বিরাট হাঙর ধইজ্যম। শাহপরি দ্বীপত যা কোনোদিন কেউ ন পারে।

—হ, মুরোদ।

ও ঘাড় বাঁকায়। মালেক খপ করে হাত ধরে।

—মনত হয় তোঁয়ারে টুরা টুরা করি হাঙরর মুখর টোপ বানাই।

হাত মুচড়ে যায় সাফিয়ার। অবাক হয়। মালেক কখনো এত দুঃসাহসী হয় নি। আজ কী হল? একটু অন্যরকম। একটু, একটু বদলে যাচ্ছে। ভালোই লাগে সাফিয়ার। এমন পুরুষই ও চায়—যে রাগ আর মেজাজের মধ্য দিয়ে ভালোবাসে। তবু এই মুহূর্তে মালেকের দুর্বিনীত ভঙ্গির কাছে পরাজিত হবে না বলে এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নেয়।

—একদিন তোঁয়ারে খুন করি সাগরত যাইয়াম। আর ন ফিজম।

—ন পারিবা। আঁই তোঁয়ারে চিনি।

সাফিয়া খিলখিলিয়ে হাসে—হাসতেই থাকে। জয়-

গুন ধমক দেয়—এই সইন্ধ্যা বেলা অ্যা কঁরি ন হাসিস, সাফিয়া।

—ক্যা মা? কী হয়? ও মার গলা জড়িয়ে ধরে।

—চ মাইয়ার কাণ্ড! ক'ত্তে যে কী হয়!

জয়গুন সাফিয়ার হাত ছাড়িয়ে হাঁসের খোপ বন্ধ করতে যায়।

—মনত রঙ থাইলে কত কী হয়!

মালেকের কণ্ঠের জ্বালা সাফিয়ার কানে খট করে বাজে। ও বুঝে ফেলে যে শুকুরের সংগে ওর সম্পর্কের ব্যাপারটা মালেক জেনে ফেলেছে। জানুক, কিছু এসে যায় না। ও শুকুরকে ভালোবাসে। জোর আছে, জিদ আছে, মরদের মতো সাহস আছে। মালেক তো ভেড়ুয়া। এখন আবার তেজ দেখাতে এসেছে!

—যাই, চাচী।

—বও বাজান, মুড়ি খ।

—না।

মালেক উঠোন পেরিয়ে গিয়েও ফিরে আসে। সাফিয়া খুঁটিতে হেলান দিয়ে চুরুট ধরাচ্ছে।

—হ্যাঁবি কিয়র লাই আসিল? মুক্তা না বেঁচি ফেলাইলাম?

—অ্যানে আসিল।

—অ।

সাফিয়ার নরম কণ্ঠ মালেক ধরতে পারে না। ওর পিছু-পিছু উঠোন পেরিয়ে কেন আসে তাও বুঝতে পারে না।

—তইলে পরুয়া ভাসিবা?

—হ।

—যওনের আগে ন আইবা?

—বহুত দরদ দেখি।

—তোঁয়ার লাই তো দরদ আছে। ন দেইলা ক'ত্তে?

মালেক বোকার মতো দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর চলতে আরম্ভ করে। এই জ্বলজ্যান্ত মিথ্যা বাক্যটি বুঝি সাফিয়ার নয়, অন্য কারো। আসলে এটা ভাবারও কোনো কারণ নেই। নিশ্চয়ই সাফিয়ার কোনো ব্যাপার আছে যেজন্যে এমন ভালো কথা বলে, গায়ে গড়িয়ে পড়ে। ভাবতে গিয়ে কণ্ঠ বাড়ে ওর, বাড়ে নিদারুণ মর্মজ্বালা। ওর কাছে সাফিয়ার প্রয়োজন—ভালোবাসা নয়। প্রয়োজনটা কী বুঝতে পারে না। অন্ধকারে নাফের পাড়ে এসে দাঁড়ায়। এই জীবনযাপনের ফাঁকি এবং বঞ্চনা ওর চোখের সামনে বর্ষার নদীর মতো বিস্তৃত হতে থাকে। ফাঁকি শুধু দুজন মানুষের মধ্যে নয়, সমগ্র জনগোষ্ঠীর। কেমন করে এটাকে দূর করা যায়? অক্ষরজ্ঞানহীন, মূর্খ লোকটা কখনো এমন দার্শনিক হয়ে যায়, যার প্রতিকার তার জানা নেই, অথচ যন্ত্রণার লোহার শিক মগজের মধ্যে আটকে থাকে।

ও ঘাসের ওপর পা ছড়িয়ে ব'সে কপিলাগাছের কাণ্ডে শরীরের ওজন ছেড়ে দেয়। মাথার ওপর গোল হয়ে আছে ঘন ডালপালা। ও বিড়ি ধরায়। পাশের বেতের ঝোপে কিসের খশখশ শব্দ! ভয় লাগে—সাপ না তো? নৌকোর মাঝিদের আলাপের মৃদু শব্দ আসছে। সামনে নদীর পানি কালো, দিগন্ত কালো, কোত্থাও কোনো আলো নেই। বড়ো ভালো লাগে এই পরিবেশ। এই বসে-থাকা, এই হাঙর-ধরা, রান্নার কাছে দু-দণ্ড কাটিয়ে আসা, অন্ধ মা-র বুক-নিংড়ানো ভালোবাসা—সবকিছুর মধ্য দিয়ে দিন গড়ায়, মাস ফুরোয়, বছর পেরিয়ে যায়। বছরের পর বছর—হাজার হাজার বছর। ফাঁকি আর বঞ্চনা, দুঃখ আর হাসির মধ্যেই মানুষ বেড়ে ওঠে, জীবনকে ভালোবাসে, লাঞ্ছনায় কুণ্ঠকে গিয়ে পোকা হয়ে মরে। ওর কেমন নেশার মতো লাগে। নিজের প্রতি ভালোবাসা বাড়ে, সবার জন্যে কিছু করার আকাঙ্ক্ষায় প্রাণ ব্যাকুল হয়ে ওঠে। এই মুহূর্তে ও সিদ্ধান্ত নেয় সবাইকে ডেকে ও একটা দল গড়বে, নিজেদের মঙ্গল কিভাবে করা যায় সে সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা হবে। তারপর কাজে নামবে। নামতেই হবে। কেউ দায়িত্ব নিয়ে না এগুলে কিছুতেই অবস্থার পরিবর্তন হবে না। এ দায়িত্ব ওকে নিতে হবে। চিন্তায় ও উত্তেজিত হয়। কিভাবে কাজে এগুবে তার ছক ঠিক করে।

তখনি শুনতে পায় হাসির শব্দ। মালেক কান পাতে। বুঝতে পারে শুকুর আর সাফিয়া। মুহূর্তে নেশা ছুটে যায়। ওরা ওকে খেয়াল করে না। আরো ডান দিকে এগিয়ে গিয়ে নদীর পাড়ে গিয়ে বসে। মালেক নিঃশব্দে উঠে আসে। বেতবনের খশখশ শব্দ ওকে যেন তাড়া করে আসছে। ও দ্রুত পা চালায়।

বিছানায় ঘুম আসে না ওর। সমুদ্রের ছবি ভেসে ওঠে। ও জানে সমুদ্রে গেলে ওর নিজের ওপর আস্থা

বেড়ে যায়। যাবার এক-দুই দিন আগে থেকে এ-বোধে আক্রান্ত হয় ও। মালেক প্রাণপণে সেই বোধ আঁকড়ে ধরে, বিভিন্ন রেখার চিত্রে উলটেপালটে দেখে, ভুলে যেতে চায় পারিপার্শ্বিকের অস্বস্তিকর ঘটনা। তোরাব আলী ওকে ভরসা করে। মুনশী, মেহের, করম গুরুর মতো মানে। শুধু সমুদ্রের কারণে। সমুদ্রের বুকে দক্ষ মালেক ওদের বড়ো ভরসা। ওর আত্মবিশ্বাস দ্বিগুণে হয়ে ওঠে। একদিন ও বিরাট একটা হাঙর ধরবে—এই স্বপ্ন দেখতে-দেখতে ঘুমিয়ে যায়।

প্রতিবারই ওরা সমুদ্রে ভাসার আগে নৌকোর চারপাশে ভিড় জমে। আজও অনেকে এসেছে। তোরাব আলীও। মালেককে এটা-ওটা উপদেশ দিচ্ছে। কখনো নীচু স্বরে কথা বলছে, কখনো কাউকে গালাগালি করছে। মালেক সবকিছু উপেক্ষা করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। সমুদ্রে গেলে ওর মা-র বড়ো কষ্ট হয়। গত রাতে মা প্রায় অর্ধেক রাত কেঁদেছে। প্রয়োজনের চাইতেও ওর অনুপস্থিতিতে বুড়ি বিষণ্ণ থাকে। মালেক কাছে থাকলে অন্ধদশা সহনীয়, নইলে দুর্বিষহ। মায়ের কান্নায় মালেকের মন দুর্বল হয়ে থাকে। দুদিন খুব খারাপ কাটে। তারপর সমুদ্রের নীল পানিতে ডাঙার কথা ভুলে যায়। মুনশী, মেহের আর করমের বাবা ভাই এসেছে বিদায় দিতে। মেহের ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদছে। কাঁদা ওর অভ্যেস। সমুদ্র থেকে যদি ফিরতে না পারে, সেজন্যে ওরা বিমর্ষ থাকে। এইসব প্যাচ-প্যাচানি মালেকের একেবারে অসহ্য। কেন যে সমুদ্রে যাবার আগে ছেলেগুলো দুর্বল হয়ে যায়! অথচ গভীর সমুদ্রে গেলে ওদের সাহস ফিরে আসে, অন্যরকম হয়। কিছু করার থাকে না বলে কি? মালেকের হাসি পায়—নিরুপায়ের সাহস, জোর-করে-ধরে-রাখা সাহস। নৌকো যখন ভাটির টানে নদীর দিকে নেমে যেতে থাকে তখন করম আর মেহেরের বৈঠার ছলাত-ছলাত শব্দ ওঠে। মালেক মুনশীর পিঠ চাপড়ে দেয়।

—সাগরত যাইতে হইলে বুকের বল সাগরত্তুন বেশি রাখন পড়ে। কলিজা অ্যাত বড়ো রাখিবি যার একুল ওকুল দিক গন ন যায়। ল, কাজত লাগ, ডোলাত্তুন কুইচ্চা বার করি টুরা কর। বঁড়শিত গাথি ফেলি।

মুনশী পাটাতনের নীচ থেকে ধারালো দা টেনে বার করে। নৌকোয় টেনে তোলার সংগে-সংগে এই দা দিয়ে হাঙরের দাঁত কেটে ফেলতে হয়। নইলে নৌকো কেটে ফেলে, মানুষ সামনে পেলে তো কথাই নেই—মাংসে আমূল বসে যায় দাঁত। মালেক ডোলা থেকে কুইচ্চা বের করে মুনশীর দিকে এগিয়ে দেয়। ও মাপমতো কেটে-কেটে স্তূপ করে। মাথার ওপর চড়চড়ে রোদ, অঘ্রানের মিঠে বাতাসে গায়ে তেমন বাধে না।

দূরে দেখা যায় সেনট মার্টিনের নারকেলসারির সবুজ রেখা—দেখা যায় প্রবালের পাথরগুলোর মোটা কালো দাগ। মেহের আর করমকে সেনট মার্টিন বাঁয়ে রেখে চলে যেতে বলে, কাছাকাছি গেলে ও হয়তো নেমেও পড়তে পারে। কিছুক্ষণ পরে সবুজ রেখা মিলিয়ে যায়। চার দিকে সীমাহীন জলরাশি, ওপরে ঝকঝকে মারবেল-পাথরের আকাশ। কখনো-কখনো দু-একটা গাঙচিল উড়ে যায়। বঁড়শিতে কুইচ্চা গাঁথায় মনোযোগী হয় মালেক। পানির ভেতর কুইচ্চার টুকরো জোনাকির মতো জ্বলে—দুশো বঁড়শিতে ঠিক একথোক ফুলের মতো। শুকুর আর সাফিয়ার মুখ ভেসে ওঠে। মালেক ঠাঁ-ঠাঁ হাসে। চমকে ওঠে সবাই।

—কিয়র মালেক ভাই?

—ওই মুনশী, নোঙ্গর ফ্যাল। চা হ্যাণ্ডে কাদা না বালি?

—আপনে হাসান ক্যা?

—সাগরত আইলে আঁর বুকথান দশহাত বাড়ি যায়। বুইজ্যো না মুনশী, পানির মদ্দে ঘর বানান গেলে আঁই এতেই থাই যাইতম। ডাঙায় কোন্ শালায় ফিরত?

মুনশী লোহার-শিকল-বাঁধা নোঙর নামিয়ে দেয়। কাদা উঠে আসে। কাদামাটিতে হাঙর কম থাকে, বালিমাটিতে বেশি।

—দেইখ্যো না মালেক ভাই?

—হ, বামত কাটো। সামনত বালিমাটি। সাফসুরত দেখা যাজ্যে।

নৌকা সেদিকেই এগোয়। এবার আর নোঙর ফেলে যাচাই করতে হয় না। পানি দেখেই বোঝে মালেক। বঁড়শি নামিয়ে দেয়। জোয়ার চলছে। জোয়ারে সুবিধা বেশি। বাতাস অনুকূলে। মালেকের ফূর্তি বেড়ে যায়। ভুলে যায় ডাঙার জীবনযাপনের ছেঁড়াবেড়া তেনার মতো দিন। সাফিয়ার প্রত্যারণাও ক্ষমা করে দেয়। সমুদ্রে এলে

ও রাজা—হিংসা-মলিনতার ঊর্ধ্বে এক সিংহ-হৃদয়ের মানুষ।

বেশ দূর দিয়ে চলে-যাওয়া ট্রলার থেকে ডাক ভেসে আসে—হেই মালেক!

ও সাড়া দেয় না। নজর এখন ফাতনার নড়ে-ওঠায়। খাই দেখেই ওর বুক ছলকে ওঠে—ধরেছে। তবে বেশি বড়ো না, ছোটো। দু-একটা যা পিঠ ভাসিয়েছে তখনই দেখেছে গায়ের রঙ মেটে, পাকা রঙ ধরে নি। বড়োগুলো ছাইরঙের হয়। ঘণ্টাখানেক খেলিয়ে বঁড়শি ওঠায় মালেক—ছোটো-ছোটো পাঁচটা। মোহর চটপট ম্যানেজ করে ফেলে। দাঁত কেটে চালান করে দেয় পাটাতনে। বঁড়শির অর্ধেক টোপ শেষ।

—চান মালেক ভাই, ক্যা ঘোড়েল, বেগ্যান খাই গিয়ে।

—হ, আবার নতুন করি গাঁথন লাগিব।

—এই বেলাত আর ন। ভাটির টানে আবার ফিযুম। অন ভাত বয়াই, মালেক ভাই?

—হ, তাই কর।

মালেক বিড়ি ধরায়। ভটভট শব্দ করে তোরাব আলীর ট্রলার এসে যায়। মাছের ট্রলার তো, আশেপাশেই থাকে, হাঙরের অপেক্ষা করে। এই মূল্যবান জিনিসটি তোরাব আলী নষ্ট হতে দিতে চায় না। হাঙর পাঁচটা উঠিয়ে নিয়ে ওদের বড়ো-বড়ো দুটি ইলিশ দেয়। মেহের কচকচিয়ে কাটে। ভাত নামিয়ে ইলিশ ভাজে।

নোঙর ফেলে বিশ্রাম নিচ্ছে ওরা। খিদে চনমনিয়ে বাড়ে। দুপুর গড়িয়ে গেছে। চারদিকে কোথাও একটা গাঙচিল নেই। যতদূর চোখ যায় শুধু আকাশ আর পানি। ইলিশের গন্ধে ওর জিভ ভিজে ওঠে। ক্ষুধার সময় গলা ভরিয়ে খেতে পারা একটা চমৎকার আনন্দ। সবকিছু অন্য রকম হয়ে যায়। নইলে মরণ, অন্ধকার ঘনিয়ে ওঠে। হাঙর ধরার সময় তোরাব আলী উদার। ওদের চিড়ে-গুড়, মিঠে পানি, বিড়ির প্যাকেট পাঠায়। এটুকু ওদের বাড়তি লাভ—দেবার কথা নয়, তবু দেয় তোরাব আলী। জানে, মালেকের মেজাজ ভালো থাকলে টাঁকের কড়ি, নইলে ঠনঠন। শূন্য ট্রলার ফিরে গেলে তোরাব আলীর কিছু করার থাকে না হাত কামড়ানো ছাড়া। তাই মালেককে তোয়াজই সই।

—মালেক ভাই, ভাত লন।

মুনশী ডাকে, মালেক শানকি এগিয়ে দেয়। একবারই রাঁধে ওরা। রাত্রিবেলা এই ভাত ঠান্ডা হবে, ইলিশের স্বাদ কমে যাবে, উপায়হীন খেতে হবে। এভাবেই কেটে যাবে সমুদ্রের কটা দিন। তবু আনন্দ, নষ্টামির আর জ্যোৎস্নার। মালেক কারো সঙ্গে কথা না বলে একটানে ভাত খেয়ে শেষ করে।

—মালেক ভাইর কি বেশি খুদা লাগিল?

—হ রে করম। প্যাট কান চাঁই করি উঠিল।

—এই মৌসুম আঁরার লাই ভালা, ন মালেক ভাই?

—ছোডো হাঙর ধরিয়ারে কোনো সুখ নাই। ডর হাঙর চাই।

—মারে আঁর ভয় লাগে। ছোডাই ভালো। বিপদ কম।

মালেক হা-হা করে হাসে।

—আই ডর হাঙর ধইত্যাম চাই। ত্যামুন উগ্যা হাঙর যা কেউ কোনো দিন ধরতি ন পারে।

মালেকের প্রত্যয়দৃঢ় কণ্ঠে গম্ভীর হয়ে যায় পরিবেশ। কেউ কথা বলে না। ওরা কি নিজেদের মধ্যে শক্তি খুঁজছে? নাকি বিপদের আশঙ্কায় চুপসে আছে? মালেক একে একে প্রত্যেকের মুখের দিকে তাকায়। ওরা নির্বিকার, কিছুটা উদাসীন। যেন এই সমুদ্রে ওদের ভালোমন্দ নেই, ওরা ডাঙায় ফিরতে পারলে বাঁচে, আপন বাসাবাড়ি খুঁজে পায়। সমুদ্রে ওদের নির্ভরতা কম, ফলে ভীরু এবং সাহসহীন। এভাবে পাঁচ দিন, দশ দিন, পনেরো দিন কেটে যায়। কখনো হাঙর ওঠে, কখনো ওঠে না। ক্লান্তি নেই মালেকের, নতুন-নতুন জায়গা খুঁজে বঁড়শি ফেলে। তবে এ মৌসুম ভালো, এ পর্যন্ত দেড়শো ধরেছে। পাটাতনে আছে গোটা বিশেক। ট্রলার আসবে আগামী কাল। ও মনে-মনে দমে যায়—একটাও বড়ো ঘাই পেল না। এই মৌসুমে বুঝি আর বড়ো হাঙর ধরা হল না। সাফিয়ার কাছে বড়ো মুখ করে বলে এসেছিল।

[ক্রমশ

অন্ধের নিশ্চিত পা-ফেলা

আবদুল হোসেন

ছেড়ে-আসা আশা-আকাঙ্ক্ষারা
কখন পিছনবাড়ির আবর্জনাস্তূপ থেকে
গুটিশুটি উঠে এসে
জমজমাট আসর জমিয়ে বসেছে বৈঠকখানায়।
সম্মুখের খোলা মাঠে
প্রতিদিনের সুখদুঃখের
পরম নির্লিপ্ত পায়চারি।
আর শূন্যের আবছা স্বপ্নগুলো ভাসতে-ভাসতে
চৈতন্যের ঘাটে ভেড়ে।
সেই সঙ্গে অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ
অনবরত স্থান বদলায়
এক মিউজিক চেয়ারের খেলায়।
আর সেই তিন জুয়াড়ি
জন্ম জীবন ও মৃত্যু
বাজি ধরে পাশা খেলে।

নিয়তির স্বচ্ছ পানিতে আমি যখন
মুখদেখার সময় পাই
এইসব ভাঙা-ভাঙা ছবি কাঁপতে দেখি,
ঠিক যেন এক জ্যোতিষীর গোলকে।
দেখি আর অস্তিত্বের অন্ধকার পথে
অবিরাম পারাপার করতে থাকি
অন্ধের নিশ্চিত পা-ফেলায়।

শেষ কথা

রঞ্জন ভাদুড়ী

মুমূর্ষু এয়োতী বৃদ্ধা শুয়ে রয়েছেন সেই খাটে
যে-খাট যৌতুক হয়ে এসেছিল ষোড়শীর সাথে,
যে-খাট বাসকশয্যা পেতেছিল প্রথম রাত্রিতে।
এখন বয়স্ক খাটে নাভিশ্বাস শয়ন পেতেছে।

অথর্ব অশীতিপর বৃদ্ধ বসে আছেন শিয়রে—
মমির মতন মুখে ফুটে আছে নিরুপায় ভীরু ব্যাকুলতা,
কণ্ঠায় উৎকণ্ঠা ঝুলে আছে।
থম মেরে গেছে আজ কলকণ্ঠ বাড়ির শৈশব—
ভুলে আছে দাপাদাপি খুনসুটি খেলাধুলো হাসি।
ঘরে বারান্দায় পায়ে পরিমিত বিষণ্ন ব্যস্ততা।
ওষুধ ডাক্তার নার্স বেডপ্যান অক্সিজেন-সিলিন্ডার নল
অচিরেই হয়তো-বা এসবের প্রয়োজন শেষ হয়ে যাবে।

অবশ্য শেষের আগে আরম্ভেরও রেশ থেকে যায়—
এমনও তো হতে পারে, বৃদ্ধা একবার
চোখ মেলে তাকাবেন সংজ্ঞালোপ মুমূর্ষা কাটিয়ে,
মুখের-উপরে-ঝুঁকে-পড়া তাঁর ব্যাকুল বৃদ্ধকে
অস্পষ্ট স্খলিত কণ্ঠে শোনাবেন—'আমি চলে গেলে
কে তোমাকে দেখবে ভেবে যেতেও পারি না!'
এবং বৃদ্ধও হয়তো শ্রেয়সীর সেই শেষ কথা
শোনার অপেক্ষাতেই বাক্যহীন রয়েছেন বসে।

তার অনাথ উত্তরাধিকার

সোফিওর রহমান

বেকার তরুণের মুখের মতো ভেসে আছে দ্বীপ
ওপরে চাঁদের আলো, অলৌকিক প্রতিশ্রুতি
জীবনের নিশ্চিন্ত সম্ভার ঝুলে আছে মঞ্চে,
আপাতত কয়েক গেলাস গুরুপ্রসাদী পান করে
রঙ্গশ্যামের মিছিলে নামো, এদেশ শস্যশ্যামা হবে।

বেকার তরুণের চোখের মতো ঝুলে আছে কালো মেঘ
ও কার ঘামের শিল্প? পিতাদের সাবিত্রী আশা—
বর্ষার শস্য-প্রলেপ বুঝি এইবার ঝরাবে নিশ্চয়তা
সাতমাত্রা ভালোবাসা এদেশে বাঁচাবে রাধার শিকড়,
ক্ষুধার কাঁকড়া-অন্তগুলি অন্নপ্রণয় পাবে
বৃদ্ধেরাও বাঁচবে দুধে-ভাতে।

মন্ত্রপাঠ হল, আর শপথ, আর
মেঘের শুকনো রেণু বৃদ্ধ পিতাদের চোখে
বর্ষা হয়ে ঝরল মঞ্চের সম্মুখে।

পদ্মাপারে বঙ্গসাহিত্য-চর্চার কিছু নিদর্শন

দেবীপদ ভট্টাচার্য

দেশ ভাগ হলেও ভাষা ভাগ হয় না। জার্মানি, কোরিয়া তার দৃষ্টান্ত। ভিয়েতনামও উত্তর-দক্ষিণ-ভেদে একদা ভাগ হয়েছিল। এই ভাগাভাগি রাজনৈতিক দাবাখেলার ফল, সাম্প্রতিক দুনিয়ার প্রধানত দুটি প্রবল প্রতিস্পর্ধী শক্তির রেষারেষির দৃষ্টান্ত। পঞ্জাব ও বঙ্গদেশ দ্বিখণ্ডিত হলো এবং ভারত ও পাকিস্তান দুটি পৃথক রাষ্ট্ররূপে গড়ে উঠলো 'ধর্মে'র ভিত্তিতে, মেনে নিলো বৃটিশ সরকারের কূট ভেদনীতির প্রস্তাবকে। কন্‌গ্রেস বা মুসলিম লীগের নেতাদের এ ছাড়া গত্যন্তর ছিলো না। সেদিন পূর্ববাংলার নাম হলো 'পূর্ব পাকিস্তান'। তারপর অনেক জল বহে গেছে পদ্মা মেঘনা দিয়ে। ১৯৫২ সালের 'ভাষা আন্দোলন' থেকে শুরু করে পরবর্তী কালের 'মুক্তিযুদ্ধে'র রক্তস্নানের মধ্য দিয়ে স্বাধীন 'বাংলাদেশে'র আত্মপ্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা ঘটে গেছে। উভয় বঙ্গের মধ্যে রাজনৈতিক বিভাজন-রেখা টানা থাকলেও ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির আদান-প্রদান বন্ধ নেই। আমরা সততই উৎসুক ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা সংক্রান্ত গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকা দেখবার জন্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকেরা ব্যক্তিগতভাবে কিছু কিছু বই পাঠান, কিছু বা সংগ্রহ করা যায় 'বইমেলা' থেকে, এখানকার কোনো কোনো প্রকাশকও বই সংগ্রহে সাহায্য করেন। এইভাবে দেখতে পাই বাংলা ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে সেখানে নানা ধরনের উল্লেখযোগ্য গবেষণামূলক গ্রন্থ নিয়তই প্রকাশিত হচ্ছে। অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান কিছুদিন আগে 'চর্যাগীতিকা' সম্পাদনা করে বার করেছেন।[১] মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ডঃ শহীদুল্লা, ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী, ডঃ সুকুমার সেন চর্যাগীতিগুলির পাঠনির্ণয় ও সম্পাদনার ক্ষেত্রে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। রাহুল সাংকৃত্যায়ণ বৌদ্ধ শাস্ত্রে ও সাহিত্যে সুপণ্ডিত, তিব্বতী ভাষা ও সাহিত্যে তাঁর অধিকার সুবিস্তৃত। তিনিও চর্যাগীতিগুলির পাঠ নির্ণয় করেছেন। এঁদের সকলের নির্ণীত পাঠ ও ব্যাখ্যা আলী আহসান শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখেছেন। কিন্তু মনে হলো তিনি যেন সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিতে চান চর্যাগীতিগুলির তিব্বতী অনুবাদকে। তাঁর মতে

[১] চর্যাগীতিকা [বৌদ্ধগান ও দোহা] বাংলা একাডেমী ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪

শাস্ত্রীমহাশয় তিব্বতী অনুবাদের কথা তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লেখ করলেও, পাঠনির্ধারণের জন্য ব্যবহার করেন নি, ডঃ বাগচী বহুক্ষেত্রে সাহায্য নিয়েছেন, ডঃ শহীদুল্লাও নিয়েছেন। রাহুলজীর ক্ষেত্রে তিনি নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারেন নি। তিনি মনে করেন নরওয়ের অধ্যাপক পার কোয়ার্ন সম্পাদিত 'অ্যান অ্যান্থোলজি অব বুদ্ধিস্ট তান্ত্রিক সঙস্‌ (১৯৭৭) বইটির প্রামাণ্য সর্বাধিক। কেননা তিনি মুনিদত্তের সংস্কৃত টীকা ও চর্যাগীতির তিব্বতী অনুবাদ উভয়ই অনুপুঙ্খভাবে বিচার করেছেন এবং সেই পথে চর্যার মূল পাঠ প্রস্তুত করেছেন। কিন্তু পার কোয়ার্নের বইটি লেখকের হাতে আসে চর্যাগীতির পাঠ ছাপা হবার পরে। ফলে ঐ গ্রন্থের সাহায্য তিনি নিতে পারেন নি বলে জানিয়েছেন। আমরা ঐ বইটি এখনো দেখিনি। আলী আহসান যে 'পাঠ' প্রস্তুত করেছেন সে 'পাঠ' শাস্ত্রী, বাগচী, শহীদুল্লা ও রাহুলজীর 'পাঠ' সামনে রেখে, কখনো বা 'তিব্বতী' অনুবাদের ভগ্নাংশের সহায়তায়। তিব্বতী অনুবাদ থেকে যে-পাঠ তৈরী হয় তার মূল্য অস্বীকার্য নয় কিন্তু সেই অনুবাদ যে সর্বত অভ্রান্ত এ দাবিও বাড়াবাড়ি বলেই মনে হয়। অনেকেই জ্ঞাত আছেন তিব্বতী অনুবাদে কোনো-কোনো ক্ষেত্রে অর্থ না জানার ফলে শব্দের অনূদিত রূপ না বসিয়ে মূল শব্দটি রেখে দেওয়া হয়েছে।

আলী আহসান তাঁর গ্রন্থটিতে 'প্রাসঙ্গিক' অংশে জানিয়েছেন "চর্যাগীতিকার তত্ত্বের দিকটা বাদ দিলে এর মধ্যে ভাষার এবং সামাজিক কার্যকারণের একটি আশ্চর্য চিত্রলিপি আছে। আমি বর্তমান গ্রন্থে সেদিকটার উপর জোর দিয়েছি।" 'ভূমিকা' অংশে তিনি 'চর্যাগীতিকায় জীবনবোধ ও সমাজচিত্র' এবং 'চর্যাগীতিকায় শিল্পবোধের পূর্ণতা' নিয়ে পরিচ্ছন্ন মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন। চর্যাগীতির সাধনতত্ত্ব, সামাজিক চিত্র অথবা ভাষা ব্যাকরণ নিয়ে আলোচনা বেশি হয়, শিল্পরূপ নিয়ে, গঠন বা অবয়ব নিয়ে বিশেষ হয় না।

চর্যাগীতিগুলিতে ছন্দের ধ্বনিতরঙ্গ, ছন্দোবিন্যাসের পরিণতরূপ, ভাষার শৃঙ্খলিত রূপকল্প তিনি নিপুণভাবে পাঠকের চোখে ধরিয়ে দিয়েছেন এবং তিনি এই স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে "পরিপূর্ণভাবে জ্ঞানসম্পন্ন অর্থাৎ সর্বতোভাবে বুদ্ধিমান কোনো ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারো পক্ষে এভাবে পদরচনা সম্ভব নয়।" আলী আহসান পরিমিতবাক্‌, কোথাও কোনো বক্তব্যাতিরেক বা জটিলতা নেই।

তবু তাঁর বিজ্ঞানসম্মত সযত্নসম্পাদিত গ্রন্থে পাঠনির্ণয়ের ক্ষেত্রে কিছু অসুবিধার সম্মুখীন হতেই হয়, যেমন দেখি ১৪ সংখ্যক চর্যার নির্ণীত পাঠ—

> গংগা জউনা মাঝে রে বহই নাঈ
> তঁহি বুড়িলী মাতঙ্গী **পোইআ** লীলে পার করেই ॥
>
> (পৃ. ৬৪)

যদিচ এই গ্রন্থের অন্যত্র পাওয়া যাচ্ছে

> গংগা জউনা মাঝে রে বহই নাঈ
> তঁহি **চাঁড়লী** মাতংগী **আপাই** লা লীলে পার করেই।
>
> (পৃ. ১০)

অথবা ১০ সংখ্যক পদে নির্ণীত পাঠ পাই—

> নগর বাহিরি রে ডোম্বী **তোহোরি** কুড়িআ
> ছোই ছোই **জাইসি** বামহণ নাড়িআ ॥
>
> (পৃ. ৫৯)

কিন্তু চর্যাগীতির শব্দ ছন্দ চিত্রকল্পের আলোচনাকালে তার সৌকর্যের নমুনা দেখাতে গিয়ে তিনি বসান—

> নগর বাহিরে রে ডোম্বী **তোহরী** কুড়িআ।
> ছোই ছোই **জাহি সো** বাহ্মণ নাড়িয়া ॥
>
> (পৃ. ২৭)

এই ধরনের পাঠ-বৈষম্য পাঠকের বিভ্রান্তি ঘটাবে। পরবর্তী সংস্করণে এ সব ত্রুটি তথা মুদ্রণপ্রমাদ বর্জনীয়।

চর্যাগীতিগুলির মধ্যেকার সকল তাত্ত্বিক ও তান্ত্রিক সাধনরহস্য ভেদ করে 'জনসাধারণের কণ্ঠস্বর' শুনতে পেয়েছেন আলী আহসান। তিনি বলেন—

> 'চর্যাগীতিকায় সর্বপ্রথম ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর নিরন্ন আশ্রয়হীন জনসমাজে পরিত্যক্ত দুর্বল মানুষের আর্ত কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম।' (পৃ. ২২)

এখানে তাঁর প্রগতিশীল দৃষ্টির পরিচয় সুস্পষ্ট।

কিন্তু শুধু প্রাচীন যুগের চর্যাগীতির সম্পাদনা নয়, আলী আহসান মধ্যযুগে উত্তর ভারতের হিন্দী-অবধী কাব্যধারার সঙ্গে ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে বাংলা কাব্যের যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল সেদিকেও গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন। আবদুর রহমানের 'সন্দেশ রাসক' বা জায়সীর 'পদুমাবত' মধ্যযুগের কাব্যের মূল্যবান সম্পদ। সুফীমতের ধর্মসাধনা যে-রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানকে আশ্রয় করেছিল ষোড়শ শতকের গোড়ায় কবি কুত্‌বনের 'মৃগাবতী' তার দৃষ্টান্তস্থল। আরাকান রাজসভায় ও চাটিগাঁ অঞ্চলে সুফীধর্মের প্রভাব প্রবল ছিল

বলেই উত্তরভারতের সুফীকবিদের (কবি সাধন, মনুঝন, জায়সী প্রভৃতি) কাব্য দৌলতকাজী, আলাওল, মুহম্মদ কবীর প্রভৃতি কবিদের উপজীব্য হয়েছিল। যতদূর মনে পড়ে অধ্যাপক এনামুল হকের 'আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্য' এ বিষয়ে প্রথম পূর্ণাঙ্গ প্রকাশিত গ্রন্থ। এর পর অনেকেই এঁদের কাব্য নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা করেছেন, বিশেষ করে আলাওলের "পদ্মাবতী" নিয়ে। আলী আহসান দীর্ঘকাল মধ্যযুগের হিন্দী-অবধী কাব্য-সাহিত্যের একনিষ্ঠ চর্চায় নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছিলেন, সেজন্য ঐ কাব্যধারায় যে অনুবাদ-অনুসরণ মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে ঘটেছে সে সম্পর্কে তাঁর আলোচনা ও সিদ্ধান্ত সর্বত্রগামী।

এই সূত্রে অধ্যাপক আহমদ শরীফ (চট্টগ্রাম বিশ্ব-বিদ্যালয়ের নজরুল-অধ্যাপক) প্রণীত 'বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য' (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড) গ্রন্থ সম্পর্কে বঙ্গ-সাহিত্যানুরাগীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা কর্তব্য বলে মনে করি।[১]

তিনি তাঁর প্রয়াস সম্পর্কে জানিয়েছেন 'বাঙালীর রচনায় বাঙালীর চিত্তচরিত্রের যে প্রকাশ ঘটেছে' তাকেই বুঝবার ও বোঝাবার আগ্রহে এই গ্রন্থ রচিত হয়েছে। লেখক প্রাচীন ও মধ্যযুগের মধ্যে তাঁর খণ্ড দুটিকে আবদ্ধ রেখেছেন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে তিনি জানিয়েছেন রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক তথা সামাজিক-সাংস্কৃতিক সব ধরনের উপাদানের বিচার বিশ্লেষণ প্রয়োজন সাহিত্যের ইতিহাস রচনায়। কেননা 'সাহিত্য জীবন-বিচ্ছিন্ন কোন সৃষ্টি নয়' এবং 'জীবন নিরবলম্ব নয়'। ঐতিহাসিক (ব্যাপক অর্থে) দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বঙ্গ-সাহিত্যের ইতিহাস প্রথম রচনা করেন অধ্যাপক সুকুমার সেন। বাঙালী সমাজের বিবর্তনের সঙ্গে বঙ্গসাহিত্যের যে অনিবার্য রূপান্তর ঘটেছে তাঁর রচিত গ্রন্থেই প্রথম সে পরিচয় লাভ করি। আহমদ শরীফ ভৌগোলিক, নৃতাত্ত্বিক উপাদানকেও গ্রহণ করে একটি কর্মপ্রহেন-সিভ বা ব্যাপক বাতাবরণ রচনা দ্বারা সাহিত্যের ইতিহাস প্রণয়নের প্রশংসনীয় প্রয়াস পেয়েছেন। তবে তিনি 'ইতিবৃত্ত' বা 'ইতিহাস' শব্দের বদলে কোথাও বা ভ্রান্ত-পদ 'ইতিকথা' ব্যবহার করে ভালো করেন নি। তাছাড়া বঙ্গদেশে ইসলাম প্রচারে কোনও মুসলিম রাজশক্তি সহযোগিতা করেনি, জোর করে কাউকে ধর্মান্তরিত করা হয়নি; হুসেন শাহের আমলে কোনো মুসলমান কর্মচারী হিন্দু প্রজার উপর দৌরাত্ম্য বা পীড়ন চালায়নি এসব মন্তব্যে তিনি ইতিহাস-সম্মত নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির পরি-চয় দেননি। কিন্তু তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি অবশ্যই মূলত অসাম্প্র-দায়িক ও উদার মানবতাবোধসঞ্জাত। 'বাঙালীর সংস্কৃত চর্চা ও সংস্কৃত রচনা' অংশে তিনি সুশীলকুমার দে ও সুকুমার সেনের তথ্য ও সিদ্ধান্তকেই অনুসরণ করেছেন, কখনো বা শহীদুল্লার। 'সেক শুভোদয়া' গ্রন্থটিকে তিনি 'বাঙলায় প্রথম পৌরমাহাত্ম্য বা পৌর-মঙ্গল' কাব্য বলেছেন এ সিদ্ধান্ত গ্রহণীয় কিন্তু 'সেক শুভোদয়া' গৌড়বিজয়ের [তুর্কি বিজয়ের] অব্যবহিত পরে অর্থাৎ ১২০৪ খৃষ্টাব্দে রচিত, এ মন্তব্য অধিকাংশ ঐতিহাসিক মেনে নেবেন না। 'চর্যাগীতি' সম্পর্কে তিনি বলেন "চর্যাগীতি **লিখিত** রচনাও নয়, বাঙলাও নয়—শৌরসেনী প্রভাবিত অর্বাচীন গৌড়ী-মাগধী অবহট্‌ঠ এবং **মৌখিক** রচনা'। অধ্যাপক আলী আহসান এই মত হয়ত সম্পূর্ণ স্বীকার করবেন না। তিনি চর্যাগীতির অবয়ব বিচার করে দেখিয়েছেন—'চর্যাগীতিকার একটি ভাষার এবং একটি চিন্তার একটি সফল পরি-সমাপ্তির রূপই আমরা আবিষ্কার করি।' লালন মদন বাউল গগনহরকরা প্রভৃতির রচিত সাধন-সংগীত সম্পর্কেও একথা প্রযোজ্য। ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতক এই দুশো বছরের বাংলা সাহিত্যের নিদর্শন লুপ্তির কারণ সম্পর্কে তাঁর অভিমত গ্রহণীয়। কিন্তু সেখানেও শাহ মুহম্মদ সগীরকে কৃত্তিবাস-পূর্ব যুগের কবি হিসাবে স্বীকার করা সম্ভব নয়। তেমনি 'নিরঞ্জনের রুষ্মা' (উষ্মা)য় [সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকের রচনা] তিনি 'ভাষায় কিছু কিছু প্রাচীনতার ছাপ' দেখলেও অন্যেরা দেখবেন না। চর্যাগীতি প্রসঙ্গে তিনি সুদীর্ঘ আলো-চনা করেছেন সে আলোচনা তত্ত্ব ও তথ্যনিষ্ঠ, লেখকের বিস্তৃত অধ্যয়ন ও নিবিড় অনুসন্ধানের পরিচয়প্রদায়ী। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নামটি সম্পাদক বসন্তরঞ্জন রায় প্রদত্ত।

[১] বাঙলা ও বাঙলা সাহিত্য, বর্ণমিছিল, ঢাকা : ১৯৭৮
বাঙলা ও বাঙলা সাহিত্য, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৮৩

কবি কি নাম দিয়েছিলেন জানবার উপায় নেই। তবে লেখকের মন্তব্য যে কৃষ্ণকে লোকচক্ষে হেয় করাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। তিনি শাক্ত ছিলেন, যুগপ্রভাবে হয়তো বৈষ্ণব বিদ্বেষীও'। এ ব্যাখ্যা কেউ মানবেন না। আসলে রাধা-কৃষ্ণের প্রণয়রসাত্মক প্রচলিত লোকগাথার সঙ্গে ভাগবত পুরাণ ও গীতগোবিন্দ কাব্যের ঈষৎ মিশ্রণ ঘটিয়ে কবি এই অভিনেয় কাব্যটি রচনা করেন। একে 'কৃষ্ণধামালী' বলায় রুষ্ট হবার কিছু নেই। এর পিছনে বৈষ্ণব-শাক্তের দ্বন্দ্ব সক্রিয় থাকার কোনো প্রচেষ্টা না দেখাই সংগত। মধ্যযুগে বাঙালী মুসলমানের সাহিত্যচর্চা প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক ও সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ তাঁর মুক্তবুদ্ধির উজ্জ্বল উদাহরণ। 'অনুবাদ সাহিত্য' নামটির বদলে হিন্দী সাহিত্যের ইতিহাসের মতো 'ভাষা-পুরাণ'-সাহিত্য লিখলে মনে হয় ফল ভালো পাওয়া যাবে। কেননা কৃত্তিবাস, মালাধর বা কাশীরাম কেউই রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবতের 'অনুবাদ' করেন নি। কৃত্তিবাসের কাল নিয়ে 'পণ্ডিতেরা বিবাদ করে লয়ে তারিখ সাল' এবং সকলেই কৃত্তিবাসের দীর্ঘ-আত্মবিবরণীকে প্রামাণিক ধরে নিয়ে আলোচনা বা বিতর্কে অগ্রসর হয়েছেন। কৃত্তিবাসের সংক্ষিপ্ত আত্মবিবরণী নিয়ে মতদ্বৈধ নেই। কিন্তু বদনগঞ্জের হারাধন দত্তের সংগ্রহ ছাড়া গোটা বঙ্গ-দেশের কোথাও এই দীর্ঘ আত্মবিবরণীর সন্ধান মেলে না। নলিনীকান্ত ভট্টশালীর সংগৃহীত রামায়ণ পুঁথিতে দীর্ঘ আত্মবিবরণীটি আছে বটে, কিন্তু সেটিও 'বদন-গঞ্জের'ই পুঁথি! কৃত্তিবাসের কাল নিয়ে যত বিতর্ক তার মূলসূত্র এই দীর্ঘ আত্মবিবরণী, সেজন্য বদনগঞ্জের পুঁথির 'প্রামাণ্য' নিয়েই প্রশ্ন ওঠে। বলা বাহুল্য হারাধন দত্তের পুঁথির ওই অংশটি বহুকাল অন্তর্হিত। বঙ্গদেশে সর্বাধিক পরিচিত কবি কৃত্তিবাসের প্রদত্ত দীর্ঘ আত্ম-বিবরণী একমাত্র বদনগঞ্জে পুঁথিবদ্ধ হয়ে রইল আর কোথাও তার হদিশ মিলল না, এজন্যই এর প্রামাণিকতা সংশয়মুক্ত নয়। 'বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৮৩ সালে প্রকাশিত হয়। লেখক মধ্য-যুগের বাঙালীর কোনো রচনাকেই তুচ্ছ করেন নি, কেন না তিনি মনে করেন ভাবী কালের ইতিহাসকারের কাজ হবে এই তথ্যকে 'স্ব স্ব রুচি বুদ্ধি, জ্ঞান প্রজ্ঞা, জীবন-দৃষ্টি অনুযায়ী তথ্যে ও যুক্তিপ্রমাণে, তত্ত্বে ও তাৎপর্যে, বিচারে ও বিশ্লেষণে এ ইতিহাসকে কালোপযোগী রূপ দান করা'। এই দৃষ্টিভঙ্গির জন্য তিনি আমাদের শ্রদ্ধার্হ। তাঁর বই পড়ে আমার মনে হয়েছে তিনি কোনো অচলায়তনে নিজের চিন্তা ও চেতনাকে গণ্ডীবদ্ধ করেন নি, সাধারণ মানুষের বা জনজীবনের ভূমিকাকে অস্বী-কার করেন নি বরঞ্চ অঙ্গীকার করেছেন এবং সেজন্য তাঁর রচিত 'বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য' গ্রন্থটি অনেকটা পিপলস্ হিসট্রি অব বেঙ্গলি লিটারেচাররূপে এখন-কার পাঠকদের কাছে সমাদৃত হবে। সমাজ, সংস্কৃতি ও সাহিত্যকে মিলিয়ে তিনি বইটি লিখেছেন, তার পরিমাণগত ও গুণগত উৎকর্ষ স্বীকার্য। বিশেষ করে সুফী ধর্ম-সাধনা প্রসঙ্গে তিনি বৌদ্ধ ও হিন্দু যোগ-সাধনার তুলনামূলক আলোচনা দ্বারা যে-সিদ্ধান্তে উপ-নীত হয়েছেন তার মূল্য কম নয়। তাছাড়া সুফী ও বৈষ্ণব মতের সমন্বয় ও বৈষ্ণব পদসাহিত্যে তার প্রকাশ, মুসলমান পদকর্তাদের 'রাধাকৃষ্ণ' বিষয়ক পদরচনার তাৎপর্য লেখক সুন্দরভাবে ধরে দিয়েছেন। এই গ্রন্থের শেষ অধ্যায় (১৮) 'সাহিত্যে বিধৃত সমাজ ও সংস্কৃতির রূপরেখা' বাঙালীর ইতিহাস-লেখকদের বিশেষ কাজে লাগবে। আহমদ শরীফ এমন অনেক পুঁথির উল্লেখ করেছেন যাদের কথা আমাদের জানা ছিল না এবং সেগুলি অমুদ্রিত অবস্থায় বিদ্যমান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমৃদ্ধ পুথিশালার সঙ্গে লেখকের হাতে এসেছে শ্রুতকীর্তি আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের বিপুল পাণ্ডুলিপিসম্ভার। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একসময় 'পাণ্ডুলিপি-পাঠ' অবশ্য-পাঠ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল (এখনকার কথা ঠিক জানি না)। 'পাণ্ডুলিপি পাঠ ও পাঠসমালোচনা' (১৯৭৬) নামে অধ্যাপক মোহাম্মদ আবদুল কাইউম রচিত বইটি এদিক থেকে কালোপযোগী হয়েছে। ডক্টর এস্. এস্. কাত্রের 'ইনট্রোডাকশান অব ইনডিয়ান টেকনিসুয়াল ক্রিটি-সিজিম' গ্রন্থটি তাঁর প্রধান সহায়ক হয়েছে পাঠসমা-লোচনার পদ্ধতি ও পুথি সম্পাদনার রীতি সম্পর্কে। বাংলা পুথির পাঠ-নির্ণয়, বর্জনীয় পাঠ, তোলা পাঠ, প্রক্ষিপ্ত পাঠ, স্বীকৃত পাঠ প্রভৃতি নিয়ে বহু পণ্ডিত-ব্যক্তি আলোচনা করেছেন, কিন্তু একটি নির্দিষ্ট পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ বোধ করি রচিত হয় নি। অধ্যা-পক কাইউম সে-অভাব কিছুটা মিটিয়েছেন। কেন না 'প্রসঙ্গাগুলি যেমন 'পাণ্ডুলিপিতে পাঠবিকৃতির

কারণ' বা 'পাঠসমালোচনার পদ্ধতি' আরো জটিল দৃষ্টান্ত সহ বিস্তৃত বিচারের অপেক্ষা রাখে। 'কবি শকাঙ্ক' এবং 'অব্দ ও বর্ষ গণনা' অধ্যায় দুটিতে পুথির কালনির্ণয়ে শকাব্দ, হিজরী অব্দ, মল্লাব্দ, বঙ্গাব্দ, সম্বৎ, মঘীসন, লক্ষণাব্দ, ত্রিপুরাব্দ, চৈতন্যাব্দ, নেপাল সংবৎ, নসরত শাহী সন, দানিশাব্দ প্রভৃতির গণনারীতি দেখানো হয়েছে। এর ফলে নবীন গবেষকবৃন্দ উপকৃত হবেন। 'প্রক্ষিপ্ত পাঠনির্ণয়' অংশটি পুনর্লিখিত হওয়া দরকার, তথ্যের অপ্রাচুর্য দূর করবার জন্য। 'বাংলা সাহিত্যে প্রাচীন গ্রন্থ সম্পাদনা' অধ্যায়টি সুলিখিত। একথা অবশ্যমান্য যে পুথি প্রাচীন হলেই 'প্রামাণিক' হয় না। বহুক্ষেত্রে দেখা গেছে বয়োবৃদ্ধ পুথির পাঠের চেয়ে অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালে অনুলিখিত বিশেষ পুথির পাঠ অধিকতর নির্ভরযোগ্য অর্থাৎ 'পুরাণমিত্যেব ন সাধুঃ সর্বম্'। লেখক এই দিকটির দিকে নজর দিয়ে কিছু নির্বাচিত দৃষ্টান্তসহ সমস্যাটিকে বিশ্লেষণ করলে ভালো হত। এই প্রসঙ্গগুলি আলোচনার শেষে 'লিপির উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ' যুক্ত হয়েছে। এই সংযোজনা প্রাসঙ্গিক হয়েছে। 'প্রাচীন পাণ্ডুলিপি পাঠ' অধ্যায়ে 'চর্যাগীতি'র একটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপি থাকা উচিত ছিল। অথবা আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ পুথির, তাতে লিপির বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্য রক্ষিত এবং পাঠকের জ্ঞান ও আনন্দ উভয়ই বর্ধিত হত।

মধ্যযুগের বাংলা গদ্য নিয়ে অধ্যাপক আনিসুজ্জামান সম্প্রতি একটি ছোট বই বার করেছেন। ১৮০০ সালে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে বাংলা গদ্যের বৈচিত্র্য, প্রাচুর্য ও বিধিবদ্ধতা দেখা দেয়। আনিসুজ্জামানের বইয়ের বিষয়বস্তু তার পূর্বের বাংলা গদ্যের রূপ নিয়ে। প্রাচীন বাংলা গদ্য নিয়ে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুশীলকুমার দে, সুকুমার সেন, দীনেশচন্দ্র সেন, শিবরতন মিত্র, জহরলাল বসু প্রভৃতি বিদ্বৎজন আলোচনা করেছেন। আনিসুজ্জামান সকলের ঋণ স্বীকার করেছেন।

শূন্যপুরাণের গদ্য ও সেক শুভোদয়ার গদ্য সম্পর্কে তিনি শহীদুল্লা ও সুকুমার সেনের মতাবলম্বী। তাঁর বইটির নতুন তথ্যগুলির মধ্যে একটি হলো ইনডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে রক্ষিত অনন্তধন বিরচিত 'স্বরোদয়ে'র পাণ্ডুলিপি। লিপিকাল ১৪৫০ শক অর্থাৎ ১৫২৮ খৃঃ। 'স্বরোদয়' আসলে দ্বাদশ শতকে নরপতির লেখা সংস্কৃত 'জয়চর্যা' গ্রন্থের আংশিক গদ্যানুবাদ, জ্যোতিষ ধরনের রচনা। আনিসুজ্জামান মনে করেন অনন্তধন কাউকে দিয়ে এই অনুবাদকর্ম করিয়ে নিয়েছিলেন।

'স্বরোদয়' পুথি থেকে যে গদ্যাংশ (১৮ শতকের) লেখক উৎকলন করেছেন পাঠকদের অবগতির জন্য তার কিছু নমুনা দিচ্ছি :

> যে নামে মনুষ্য সুইলে জাগে জা রব ডাকিলে আইসে যে নামে যে মাত্রা প্রথমাক্ষর থাকে সে মাত্রা তাহার মাত্রাস্বর হএ। যথা দেবদত্ত নাম জাহার তাহার প্রথমাক্ষর দকার তাহাতে একার মাত্রা আছে এতকে একার মাত্রাস্বর দেবদত্তের। ইতি মাত্রাস্বরণ্ড।...

'দেবদত্ত' শব্দকে গ্রন্থের মূল লেখক কয়েকবার ব্যবহার করেছেন তার কারণ মনে হয় তাঁর পাণিনির ব্যাকরণ জানা ছিল। কেননা পাণিনির ব্যাকরণে 'দেবদত্ত' বহুস্থলে দৃষ্টান্তস্বরূপ ব্যবহৃত হয়েছে।

আনিসুজ্জামান সংগত কারণে শঙ্করদেব রচিত অসমীয়া নাটকের ও নেপালে প্রাপ্ত 'গোপীচন্দ্র' ও 'ললিতকুবলয়াশ্ব' নাটকের গদ্য সংলাপ উদ্ধৃত করেছেন। এদের মধ্যে ভারতের পূর্ব-ও উত্তর পূর্ব অঞ্চলে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের হাতে গদ্যরীতি কোন্ রূপ গ্রহণ করছিল তার সুস্পষ্ট ছাপ রয়েছে। অন্যদিকে সতেরো-আঠারো শতকের বৈষ্ণবীয় নিবন্ধে গদ্যের ভঙ্গি সরল ও স্বল্প পরিসরের। 'কারিকা' থেকে প্রদত্ত দৃষ্টান্তে দেখা যায় বাংলা গদ্যের স্বাভাবিক পদবিন্যাসরীতি সেখানে সুরক্ষিত—

> শ্রীপঞ্চমীকে তিনদিন থাকিতে [শ্রীমতী] বাপের বাড়ি যানঃ॥ মাঘ ফাল্গুন চৈত্রের ফুলদোল পর্যন্ত বাপের ঘরে থাকিয়া হুলিখেলা খেলেন॥

লেখক আরো দেখিয়েছেন বৈষ্ণবদের 'আত্মজিজ্ঞাসা'র যে ভঙ্গি—

> তুমি কে। আমি জীব। কোন জীব। তটস্থ জীব। থাক কোথা। ভাণ্ডে। ভাণ্ড কিরূপে হৈল। তত্ত্ববস্তুতে হৈল।...

এই প্রশ্নোত্তরভঙ্গি সতেরো শতকের দোম আন্তোনিও নামধারী পূর্ববঙ্গের বাঙালী খৃষ্টানের রচিত 'ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সম্বাদে' অনুসৃত হয়ে থাকতে পারে বলে লেখকের সিদ্ধান্ত সমর্থনযোগ্য।

কয়েকটি বৈষ্ণব-পুথির গদ্যরচনা বিশ্লেষণ করে লেখক দেখিয়েছেন এর মধ্য দিয়ে বাংলা গদ্যের প্রাঞ্জল

অভিব্যক্তি, তার স্বাভাবিক প্রবাহের রূপ ধরা যায় এবং পরবর্তী কালের গদ্য পরম্পরাহীন আকস্মিক সৃষ্টি নয়। এইভাবে নব্বই পৃষ্ঠার একটি ছোট বইতে লেখক স্বদেশের ও বিদেশের বহু পুথি ও পদের সন্ধান দিয়েছেন। তার জন্য তিনি বঙ্গভাষানুরাগীদের সাধুবাদ পাবেন।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের কাব্য কবিতা ও গদ্যের নিদর্শন নিয়ে আলোচনার সঙ্গে স্বভাবতই আঠারো শতকের শেষে ও উনিশ শতকের গোড়ায় হ্যালেদ, কেরী ও হটনের ইংরেজি ভাষায় লিখিত বাংলা ব্যাকরণগুলি নিয়ে প্রণীত গবেষণা-নিবন্ধ 'এ ক্রিটিক্যাল স্টাডি অব দ্য আরলি বেঙ্গলি গ্রামার' (১৯৮২) বইটির কথা মনে আসে। এই বইটির লেখক মোহাম্মদ আবদুল কাইয়ুম। হ্যালেদের এ গ্রামার অব দ্য বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ (১৭৭৮) প্রকাশিত হবার পর দুশো বছর পার হয়ে গেছে। আলোচ্য বইটিতে হ্যালেদের জীবন ও তাঁর ব্যাকরণ স্থান পেয়েছে ২৭—১২০ পৃষ্ঠা, কেরী ১২১—২১১ পৃষ্ঠা ও হটন ২১২—২৩৯ পৃষ্ঠা। হ্যালেদ, উইলকিনস্, লীডেন সংগৃহীত বিভিন্ন পুথির পৃষ্ঠার প্রতিলিপি গ্রন্থটির আকর্ষণ বাড়িয়ে দিয়েছে। লেখকের সুযোগ হয়েছিল বিলেতে সেই সংগৃহীত বিস্তর পুথি বা বিভিন্ন রচনার পাণ্ডুলিপি দেখবার ও পরীক্ষা করবার। এই পরীক্ষায় স্পষ্টত ধরা পড়েছে হ্যালেদের সাহায্যকারীদের মধ্যে ছিলেন একজন পূর্ববঙ্গীয় মুসলমান 'মুন্শি' অপরজন পশ্চিমবঙ্গীয় ব্রাহ্মণ 'পণ্ডিত'। লেখক নানাভাবে দেখিয়েছেন হ্যালেদের আদর্শ বা 'মডেল' ছিল উইলিয়ম জোন্সের ফার্সি ভাষার ব্যাকরণ (১৭৭১) যার সপ্রশংস উল্লেখ তিনি তাঁর ব্যাকরণের ভূমিকায় করেছেন। হ্যালেদ ব্যাকরণটি লিখেছিলেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কর্মরত 'ফিরিঙ্গীনামুপকারার্থং' এবং তাঁকে দ্রুত অগ্রসর হতে হয়েছিল এই কর্মে, সংস্কৃত ও বাংলাভাষায় অপেক্ষাকৃত অগভীর জ্ঞান নিয়ে। কিন্তু এই ব্যাকরণে দৃষ্টান্ত হিসাবে ব্যবহার্য বাংলা হরফের মুদ্রণের প্রয়োজনীয়তাই উইলকিন্‌স-পঞ্চাননকে ধাতব হরফ নির্মাণের পথে চালিত করেছিল। পুথি-পাণ্ডুলিপির যুগ থেকে মুদ্রণের যুগে উত্তরণ, প্রকৃতপক্ষে মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে পদক্ষেপ। সেদিক থেকে বোল্টস সাহেবের প্রচেষ্টার কথাও হ্যালেদ উল্লেখ করেছেন। আরেকটি কথা মনে রাখা দরকার যে হ্যালেদ-রচিত ব্যাকরণ কেরীর বাংলা ভাষা শিক্ষার প্রথম সোপান।

বহুভাষাবিদ্ হ্যালেদের বাংলা ভাষার প্রতি টান ছিল, সংস্কৃতের প্রতি ছিল শ্রদ্ধা। তাই তিনি সংস্কৃতানুগ 'শুদ্ধ' বাংলার সুপারিশ করেছেন আর মুন্শিরীতির বর্জনের। কাইয়ুম এসবই তাঁর বইতে দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখিয়েছেন, হ্যালেদের ত্রুটি, অসম্পূর্ণতা সবই নির্দেশ করেছেন আবার যথার্থ যা গ্রহণীয় তাকে দেখাতে ভোলেন নি।

কেরী অবশ্য হ্যালেদের এই দৃষ্টিভঙ্গি অর্থাৎ 'শুদ্ধ' বাংলা সৃষ্টির প্রয়াস গ্রহণীয় বলে মনে করেন নি। তাঁর 'এ গ্রামার অব দ্য বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ' (১৮০১) বইটিতে জানিয়েছেন লোকব্যবহারে সুপ্রচলিত আরবি-ফারসি শব্দ গ্রহণে ভাষা সমৃদ্ধ হবে, বিকৃত হবে না। কাইয়ুম কেরীর ব্যাকরণের বিভিন্ন সংস্করণ নিয়ে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করেছেন, ঠিক এ ধরনের কাজ পূর্বে কেউ করেছেন কিনা আমার জানা নেই। তারাপদ মুখোপাধ্যায় 'বাংলা ভাষার ব্যাকরণ' (১৯৭০) নামে যে-বইটি সম্পাদনা করেন, তাঁর মতে সেটি মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের মৌলিক রচনা। কাইয়ুম এই সিদ্ধান্তে সংশয় প্রকাশ করে দৃষ্টান্তসহ প্রমাণ করতে চেয়েছেন আসলে বইটি কেরীর বাংলা ব্যাকরণের দ্বিতীয় সংস্করণের বঙ্গভাষান্তর মাত্র। কিন্তু অধ্যাপক মনসুর মুসা মনে করেন মৃত্যুঞ্জয় ইংরেজি জানতেন না কাজেই তাঁর পক্ষে ইংরেজি থেকে অনুবাদ করা সম্ভব ছিল না। তাঁর মতে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সহকারী গ্রন্থাগারিক মোহনপ্রসাদ ঠাকুর এই ভাষান্তর-কর্তা। অন্যমতে মৃত্যুঞ্জয়-প্রণীত বাংলা ব্যাকরণের ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন কেরী। আশা রাখি এ বিতর্ক এখানেই শেষ হবে না।

এই প্রসঙ্গে আবদুর রহিম খোন্দকারের গবেষণা-নিবন্ধ 'দ্য পোর্তুগীজ কনট্রিবিউশান টু বেঙ্গলি প্রোজ, গ্রামার অ্যানড লেকসিকোগ্রাফি' (১৯৭৬) উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। তিনি মানোএল-এর ব্যাকরণ ও শব্দকোষ রচনা ও সংকলন সম্পর্কে লিখেছেন প্রকৃতপক্ষে ওই ব্যাকরণ একক প্রচেষ্টা নয়, একটি গোষ্ঠীর সম্মিলিত রচনা। ওই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন দোম আন্তোনিও, গোমেজ ও অন্যান্য ব্যক্তিরা। লেখক

'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' (১৭৪৩) সম্পর্কে নতুন কথা বলেছেন। তাঁর মতে এই বইটিতে তিন জনের হাত রয়েছে—মানোএল, তাঁর পূর্ববঙ্গীয় মুসলমান-খৃষ্টান সহকারী এবং হিন্দু পণ্ডিতের ছাত্র কোনো ইউরোপীয়ান। তাঁর সিদ্ধান্ত 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ'-এ দুটি রচনার মিশ্রণ আছে, মূল পোর্তুগীজ থেকে পূর্ববঙ্গীয় খৃষ্টান অনূদিত একটি রচনা এবং মূল বাংলায় লিখিত খৃষ্টধর্ম বিষয়ক পূর্বতন একটি গ্রন্থ, যা মানোএল পোর্তুগীজ ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। কিন্তু আনিসুজ্জামান এই সিদ্ধান্ত গ্রহণে অপারগ। এ নিয়ে আরো যুক্তিনির্ভর গবেষণা বাঞ্ছনীয়।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বঙ্গসাহিত্য নিয়ে পদ্মাপারে নানা দিক থেকে বিতর্ক ও বিচারের বৈচিত্র্য ও প্রাচুর্য আমাদের যুগপৎ মুগ্ধ তৃপ্ত ও উৎসাহিত করে। সেই-সব রচনার সামান্য পরিচয় কয়েকখানি গ্রন্থের সাহায্যে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যানুরাগীদের গোচর করলাম।

পাঠকের দৃষ্টিতে

এই সংখ্যায় একটি সদ্যঃ-প্রকাশিত বইয়ের আলোচনা-প্রসঙ্গে সমালোচক শিবনারায়ণ রায় মন্তব্য করেছেন :

"ভারত একটি স্বাধীন রাষ্ট্র বটে, কিন্তু ভারতবাসীরা কি সাধারণস্বীকৃত অর্থে একটি নেশন? বিকাশ এবং সংহতির জন্য ভারতের পক্ষে নেশন হওয়া কি জরুরি অথবা অনিবার্য? ভারতের সমৃদ্ধ বৈচিত্র্যকে স্বীকৃতি এবং মূল্য দিয়ে এখানে কি এমন এক যথার্থ ফেডারাল বা আমেল ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব নয় যেখানে বহুজাতিকতা রাজনৈতিক-আর্থিক-সাংস্কৃতিক সংহতিকে ব্যাহত না করে বরং উপ-মহাদেশব্যাপী সমামেল বা কনফেডারাল ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটাতে পারে? নেশনের সামূহিক সত্তার উপরে অতিরিক্ত ঝোঁক কি গণতান্ত্রিক বিকাশের প্রবণতাকে দুর্বল করে না?"

এই মন্তব্যের প্রসঙ্গে আমরা পাঠকদের মতামত আহ্বান করছি। রচনার শব্দসীমা ৬০০। ৩ জুলাইয়ের মধ্যে রচনা আমাদের দপ্তরে পৌঁছনো দরকার। মুদ্রিত রচনার জন্য সাধ্যানুযায়ী সম্মানমূল্য দেওয়া হবে।

ক্রান্তদর্শী

অন্নদাশঙ্কর রায়

তেইশ

রাত দুটোর সময় শুতে গিয়ে দেখে যূথিকা তখনো জেগে আছে। ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদছে। চোখের জলে বিছানা ভিজে গেছে।

"ও কী! তুমি কাঁদছ এখনো! একগঙ্গা অশ্রুধারায়ও হিন্দু-মুসলমানের রক্তের দাগ মুছবে না। এ রক্ত বাঙালির বুকের রক্ত। বাঙলাদেশের কলিজার লহু।" মানস সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বলে।

যূথিকা মুখ ঘুরিয়ে নেয়। "তোমার বক্তৃতা শুনতে-শুনতে কান ঝালাপালা। তার ওপর কাব্যি করা শুরু হল।"

মানস বুঝতে না পেরে বোবা হয়ে থাকে। তখন যূথিকাই মুখোমুখি হয়। কাঁদতে-কাঁদতে বলে, "কান্না পাচ্ছে, তাই কাঁদছি। পাঁচ হাজার হতাহত। আরো কত হবে কে জানে! মা-বাবার কথা ভেবে কান্না পাবে না? বাড়ি কিনেছেন পারক সারকাসে। চার দিকে মুসলমান গিজগিজ করছে। ওরা খেপে না গেলে চমৎকার লোক। কিন্তু খেপে গেলে চণ্ডী।"

"না, না, কেউ ও'দের গায়ে হাত দেবে না। স্বয়ং কায়দে আজমের সঙ্গে সিমলায় ও'দের দহরম-মহরম ছিল। সেখানকার ভাইসরিগাল লজে। জিন্না সাহেবের নিশ্চয় সেসব দিনের কথা মনে পড়বে।" মানস স্তোক দেয়।

"তাঁকে জানাবার আগেই যা হবার তা হয়ে যাবে। তোমার যদি দয়ামায়া থাকে তুমি একবার ট্রাঙ্ককল করে খবরটা নাও তাঁরা বেঁচে আছেন কি না। বেঁচে থাকলে নিরাপদ স্থানে সরে গেছেন কি না।" যূথিকা ব্যাকুল-ভাবে বলে।

সে এর আগে কখনো এমন কোনো অনুরোধ করে নি, পাছে মানস ভুল বোঝে। তার বাবা তার স্বামীকে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন, জামাতা বলে স্বীকার করতেই রাজি হন নি। তার মা তো গয়না পর্যন্ত কেড়ে নিয়েছিলেন। সম্পর্ক যখন কেটে গেছেই তখন আবার জোড়া দিতে যাওয়া কেন?

মানস বলে, "আচ্ছা, কাল সকালেই আমি ট্রাঙ্ককল করে খবর নেব। কিন্তু আমার নামে নয়, তোমার নামে।"

"না, না, আমার নামে নয়, আর কারো নামে। বিল

অবশ্য আমরাই মেটাব।" যূথিকা ভেবে পায় না কার নামে।

মানস পরের দিন ট্রাঙ্ককল বুক করতে গিয়ে শোনে কলকাতার লাইন খারাপ। শতখানেক কল জমে আছে। নতুন কল বুক করা বন্ধ। তখন একটা প্রি-পেড টেলিগ্রাম ডাকঘরে পাঠায়। চাপরাশি ফিরে এসে জানায় টেলিগ্রামও কলকাতায় যাচ্ছে না। লাইন খারাপ। অনুমতি নিয়ে নামঠিকানা দিয়েছিল ক্লাবের অনরারি সেক্রেটারি পরমেশ মিত্রের। তিনি ইমপীরিয়াল ব্যাঙ্কেরও এজেন্ট। সর্বজনপ্রিয় পরোপকারী ভদ্রলোক।

এখন কী উপায়? মনে পড়ে যায় যে পুলিশ সাহেবের হেফাজতে পুলিশ ওয়্যারলেস আছে। সেখান থেকে কলকাতায় ওয়্যারলেস মেসেজ পাঠানো যায়। কিন্তু সকলের পক্ষে নয়। কেবল জেলা ম্যাজিসট্রেট আর জেলা পুলিশ সুপারিনটেনডেনটের পক্ষে। তখন ফিদা হোসেনকে অনুরোধ করেন লালবাজারে ওয়্যারলেস করে ওয়্যারলেসে উত্তর আনিয়ে নিতে। তিনি নিজের নামেই মেসেজ পাঠান, কিন্তু লালবাজার সাড়া দেয় না। বার বার তিনবার নিরুত্তর।

খবরের কাগজ আসে নি, আসবেও না। কলকাতা থেকে ট্রেন ছাড়ে নি। একই কারণে চিঠিপত্রও আসে নি, আসবেও না। যাত্রীরাও আসে নি, আসবেও না। মুখে-মুখে কতরকম গুজব রটে যায়। কোর্টে গেলে একজন উকিল বলেন, "কলকাতায় কাল পঞ্চাশ হাজার জন মারা গেছে। তাদের মধ্যে চল্লিশ হাজার হিন্দু।" আরেকজন উকিল এসে জানান, "ষাট হাজার লোক মারা গেছে, তাদের মধ্যে পঁয়তাল্লিশ হাজার মুসলমান।" ঘণ্টায়-ঘণ্টায় গুজব পল্লবিত হয়। কেউ বলে, "পাঁচটা মন্দিরে গোরুর মাথা পাওয়া গেছে।" কেউ বলে, "দশটা মসজিদে শুয়োর ঢুকেছে।" গাঁরজার কথা কিন্তু একজনও বলছে না। যদিও ওটা ব্রিটিশবিরোধী প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস।

"হদিস পেলে?" যূথিকা জিজ্ঞাসা করে। মানসকে ফিরতে দেখে।

"পুলিশম্যান নিজের নামে মেসেজ পাঠিয়েছেন তাঁর বন্ধু শামসুল হুদার নামে। তিনি ডেপুটি কমিশনার। থাকেন পারক সারকাসেই। তাঁর পক্ষে অনুসন্ধান সোজা। কিন্তু দাঙ্গাহাঙ্গামার সময় তো তাঁর চব্বিশ ঘণ্টা ডিউটি। তাঁকে তাগাদা দিয়েও সাড়া মেলে নি। সবুর করো। ধৈর্য ধরো।" মানস কৈফিয়ত দেয়।

যূথিকা মুখ ভার করে থাকে। "মিসেস সরকার কী করে খবর পেলেন? বলে গেলেন সরকার পরিবারের সবাই নিরাপদে আছে।"

"ওঁদের তো টাকার অভাব নেই। বোধহয় রেডিও ট্রানসমিটার আছে। তা ছাড়া আর কোন্ সূত্রে মিসেস সরকার খবর পেলেন?" মানস চিন্তা করে।

দিনের বেলা রেডিওতে যা শোনা যায় তা কতকটা স্থিতাবস্থার। রাত ন-টায় জানায় বাইরে থেকে সৈন্য এসে শান্তিরক্ষায় সাহায্য করছে। কিন্তু কজন হতাহত তার উল্লেখ নেই।

"তার মানে অবস্থা আরো খারাপ।" যূথিকার কণ্ঠ অশ্রুরুদ্ধ।

মানস তাকে কী বলে সান্ত্বনা দেবে? সেও তো শঙ্কিত স্বপনদার জন্যে, বউদির জন্যে। তাঁদের বাড়ির পেছনে মুসলমানদের বসতি। তাঁদের বাবুর্চি আর ড্রাইভার মুসলমান। বেয়ারা আর মেড হিন্দু। ঝিকে ওঁরা মেড বলেন। তার আরো কয়েকজন প্রিয় বন্ধুও তো কলকাতায় নিযুক্ত। প্রকাশকরাও কলকাতানিবাসী।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে মানস রাত জেগে পায়চারি করে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেয় যে তার নিজের কর্মস্থলে তেমন কোনো বিপদ নেই। তবু বলা যায় না। গুজব যেভাবে প্লাবিত হচ্ছে সেখানেও কলকাতার প্রতিক্রিয়ায় মারামারি বেধে যেতে পারে। এক পক্ষ মার দিলে কি অপর পক্ষ মার শোধ দেবে না?

তবে ভরসার কথা সিরাজী আর খান্ দুজনেই অসাম্প্রদায়িক প্রকৃতির অফিসার। তাঁদের কারো বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ শোনা যায় না। তবে মুসলিম লীগ মন্ত্রিমণ্ডলের অধীনে যাঁরা কাজ করেন তাঁদের উপরে শফিকুদ্দীনের মতো মোড়লদের চাপ একেবারেই কি পড়বে না?

কিন্তু এই দুই অভিজ্ঞ অফিসারের নিশ্চয় খেয়াল আছে যে ইনটারিম গভরনমেনট আজ বাদে কাল গঠিত হবে আর তাতে মুসলিম লীগ থাকবে না, কংগ্রেস থাকবে। কাজেই দিল্লী থেকে যে চাপ পড়বে সেটাই কলকাতার মন্ত্রিমণ্ডলকে আর তাঁদের স্থানীয় মোড়লদেরকে অফিসারদের উপর চাপ দেওয়া থেকে নিবৃত্ত

করবে। অফিসাররা আইনমোতাবেক কর্তব্য করে গেলেই স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসবে।

পরের দিনও খবরের কাগজ আসে না, ট্রেন আসে না। রবিবার, চিঠি আসার প্রশ্নই ওঠে না। টেলিগ্রাফ বন্ধ, ট্রাঙ্ক টেলিফোন বন্ধ। পুলিশ ওয়্যারলেস নিরুত্তর। মানস কোর্টে যায় না, কিন্তু গুজব তার কাছে পায়ে হেঁটে আসে। কলকাতায় নাকি দস্তুরমতো যুদ্ধ চলছে। মুসলমানরা নাঙ্গা তলোয়ার হাতে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে। একহাতে তলোয়ার, আরেক হাতে কোরান। ডাক ছাড়ছে "আল্লা হো আকবর।" হিন্দুরা নাকি বোমা ফাটাচ্ছে। কারো-কারো হাতে স্টেনগান। হাঁক ছাড়ছে "জয় মা কালী কলকাত্তাওয়ালী।" ওদিকে শিখেরাও কৃপাণ হাতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। ভবানীপুরকে ওরা মুসলিম-মুক্ত করবে। গোরা সৈনিকরা চারদিকে পাহারা দিচ্ছে। কিন্তু গুলিগোলা এখনো চালায় নি। গোরা পুলিশও নিরপেক্ষ।

এসব গালগল্পের উৎস কী? বারোজনের আড্ডা? না কোনো চোরাই রেডিও ট্রানসমিটার? না লনডনের বি. বি. সি.? মানস এসব গুজবে কান দেয় না। যূথিকাকেও বলে কর্ণপাত না করতে। কিন্তু অশ্রুপাত তা সত্ত্বেও থামে না।

শেষকালে পুলিশ থেকে একজন কনস্টেবল মেসেজ নিয়ে এসে দেখায়। কলকাতা থেকে পুলিশ ওয়্যারলেসে এসেছে। "রায়চৌধুরী পরিবার পুলিশের গাড়িতে স্থানান্তরিত হয়েছেন। নিরাপদে আছেন। হুদা।" পুলিশ সাহেব তার উপরে লিখেছেন, "শো জ।"

মানস যূথিকাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খায়। যূথিকা হেসে বলে, "ছাড়ো। ছাড়ো। দেখছে।" পুলিশের লোক পালায়। মুচকি হাসে।

দীপক আর মণি ছুটে আসে। কী হয়েছে? কী হয়েছে? তখন তাদের খুলে বলতে হয় যে তাদের দাদা-মশায় আর দিদিমা বেঁচে আছেন। তারা অবাক হয়। তাঁদের কথা তো মা কোনোদিন বলে না। প্রশ্ন করলে এড়িয়ে যায়। দীপকের বোঝবার বয়স হয়েছে যে বলবার মতো নয়। সেও আর ও প্রশ্ন তোলে না। কিন্তু মণি মাঝে-মাঝে বায়না ধরে। যূথিকা নিরুত্তর।

রেডিওতে দিনের বেলা যা বলে তা আশাপ্রদ নয়। দাঙ্গা থামে নি। সরকার আরো কড়া ব্যবস্থা করেছেন। রাত নটায় শোনায় দাঙ্গা এবার ভাটার মুখে। কিন্তু হতাহতের সংখ্যা দেয় না। আর শুনেই বা কী হবে? হিন্দু-মুসলমানের শ্রাদ্ধি না এলে ইংরেজের কিসের গরজ! সে তো আরো দশ বিশ বছর সুস্থ শরীরে আর বহাল তবিয়তে রাজত্ব করতে পারবে। সাম্রাজ্যের উপর সূর্য অস্ত যাক এটা কি সত্যি ওরা চায়? ওরা যদি চলে না যায় স্বাধীনতাও হবে না, পার্টিশনও হবে না। না হবে হিন্দুস্তান, না পাকিস্তান। আর কিছু না হোক, পূর্ববঙ্গের হিন্দু মাইনরিটি নিরাপদ।

পরের দিনও খবরের কাগজ আসে না, চিঠিপত্র আসে না। ট্রাঙ্ককল বুক করে না, টেলিগ্রাম পাঠায় না। তেমনি অচল অবস্থা। তবে বিকেলের দিকে দু-চারজন ব্যক্তি পায়ে হেঁটে কলকাতা থেকে পৌঁছয়। যত সব ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর কাহিনী ছড়ায়। তাদেরই হাত থেকে কয়েকখানা দু-পাতার পত্রিকা ধার করে এনে নাজির দেখান মানসকে। হিন্দুদের কাগজে লিখেছে মুসলমানরা হিন্দুদের ধরে নিয়ে গিয়ে নাখোদা মসজিদের প্রাঙ্গণে কোরবানি করেছে। আর হিন্দুরা মুসলমানদের ধরে নিয়ে গিয়ে কালীঘাটের কালীমন্দিরে বলি দিয়েছে। খুটিনাটি সমেত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

মানস তো হাঁ! এ কি কখনো সম্ভব! বাঙালি হিন্দু-মুসলমান কি এত নীচে নামতে পারে! বিশ্বাস হয় না। অথচ হয়ও। যুদ্ধে কী না সম্ভব? ত্রিশ বছরের যুদ্ধে জারমানির ক্যাথলিক আর প্রটেসটানটরা নাকি মানুষের মাংস খায়। সে ঐতিহ্য এখনো লুপ্ত হয় নি। গত মহাযুদ্ধে নাৎসীরা লক্ষ-লক্ষ ইহুদিকে গ্যাস চেম-বারে পুড়িয়ে মেরেছে, তবে খায় নি। হিন্দু মুসলমান যদি এ গৃহযুদ্ধ এক্ষুনি না থামায় তা হলে কার কপালে কী আছে তা কেউ জানে না। হারজিত তো সব যুদ্ধেই থাকে, কিন্তু এই যে ব্রটালাইজেশন, এর জন্যেও প্রস্তুত থাকতে হবে। মানস যূথিকাকে এসব কথা জানায় না। ছেলেমেয়েকেও না।

পরের দিন 'স্টেটসম্যান' পায়। হেডলাইন হল 'গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং'। ভিতরে লিখেছে কলকাতায় যা ঘটে গেল তা ইউরোপের মধ্যযুগের মতো একটা 'ফিউরি'। সীমাহীন উন্মত্ত ক্রোধ। আগুন এখনো নেভে নি। তলে তলে ধোঁয়াচ্ছে। 'অমৃতবাজার' গভীর পরিতাপ প্রকাশ করে হিন্দু মুসলমান উভয়কে দোষ দিয়েছে। এ তোমার

এ আমার পাপ। এরকম যদি চলে তবে স্বাধীনতা দূরে অস্ত। সভ্যতাও থাকে কি না সন্দেহ।

রাস্তায় ঘাটে রাশিরাশি শব। বিস্তর শব গঙ্গায় নিক্ষেপ করা হয়েছে। তাই সঠিক বলতে পারা যাচ্ছে না কত লোক মরেছে। হিন্দু কত, মুসলমান কত। লুটে-পাট অজস্র হয়েছে। গৃহদাহের সংখ্যাও কম নয়। যুদ্ধ-ক্ষেত্রের মতো দৃশ্য। শকুন উড়ে এসে মাংস ছিঁড়ে খাচ্ছে। সরকার আর মিউনিসিপালিটি নাজেহাল। আরাম এসে শব তুলে নিয়ে সৎকার করছে। নইলে মড়ক।

মানস যূথিকাকে দেখাবে কি দেখাবে না? সে ওত পেতে থাকে, ছোঁ মেরে নিয়ে যায়। বিশিষ্ট ব্যক্তি কে কে নিহত তাঁদের নাম তন্ন-তন্ন করে দেখে। না, তার বাবা-মার নাম নেই। বিশিষ্টরা গা বাঁচিয়েছেন, গরিবেরা মরেছে। যারা দিন আনে দিন খায়, পথে না বেরিয়ে পারে না। আর যারা বস্তিতে থাকে।

ওরা দুজনেই স্থির করে যে একদিন অনশনে থেকে নিহতদের জন্যে শোক করবে। ছুটির দিন দেখে। সেদিন তাদের মোরনিং ড্রেস।

এর পরে কাগজ খুললে যথারীতি গালাগাল বর্ষণ। যত দোষ সুহরাবর্দী, যত দোষ বারোজ, যত দোষ জিন্না, যত দোষ ওয়েভেল। গান্ধী নেহরুও বাদ যান না। রোম পড়েছে, নীরো বেহালা বাজাচ্ছেন। গান্ধী বাঙালিকে কোনোদিন ভালোবাসেন নি, জবাহরলাল তো বাঙালিকে ঘৃণাই করেন।

"সত্যি, বাপু কেন একবার কলকাতায় এলেন না?" যূথিকার ধারণা তিনি এলেই সবাই শান্ত হত।

"ওদিকে ওয়েভেল আবার ওয়েভার করছেন। শান্তির জন্যে লীগকে কিছু কনসেশন দিতে হবে। অর্থাৎ কংগ্রেস মুসলিমদের ডুবিয়ে দিতে হবে। নেহরুকে বল জোগাবার জন্যে বাপুকে থাকতে হচ্ছে দিল্লীতে। সেটাই তো প্রথম কর্তব্য। দেশের স্বাধীনতাই তো সকলের আগে।" মানস যতদূর বোঝে।

মাসের শেষে হঠাৎ বাবলী আর তার বান্ধবী আসে দেখা করতে। তারা তেভাগা আন্দোলন উপলক্ষে এ জেলায় পর্যটন করছে। কলকাতার অবস্থা কী রকম জানতে চাইলে বলে, "লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান। লড়াইয়ের ফলে কলকাতা এখন হিন্দুস্থান পাকিস্তান হয়ে গেছে। এক পক্ষ অপর পক্ষের এলাকায় পা দিতে ভয় পায়। আমরা তৃতীয় পক্ষ বলে নির্ভয়ে ঘুরে বেড়াতে পারি। আমাদের পার্টি-কার্ডই আমাদের পাসপোর্ট।"

মানস আর যূথিকা সুধায়, "স্বপনদার খবর কী? বউদির কী খবর।"

বাবলী উত্তর দেয়, "সেই কথাই তো বলতে এসেছি। ওঁরাই জানাতে বলেছেন। ওঁদের উপর দিয়ে একটা ঝড় বয়ে গেছে। শিকড়সুদ্ধ উপড়ে দিয়েছে। এখন ওঁরা হিন্দুস্থান পারকে সুবিনয় তালুকদারের অতিথি। ইচ্ছে ছিল সাত-আট দিনের মধ্যে অবস্থা শান্ত হলে বালীগঞ্জ পারকে ফিরবেন। কিন্তু মুসলিম লীগ গভর্নমেন্ট থাকতে বিশ্বাস নেই। হয় কোয়ালিশন, নয় গভর্নরস রুল দুটোর একটা হলেই ওঁরা ফিরবেন, নয়তো অন্য কোথাও একটা খালি ফ্ল্যাট ভাড়া করবেন। পরের বাড়িতে চাকর ও কুকুর নিয়ে থাকা যায় না, রান্নার উপরেও এক্তিয়ার নেই। কিছুদিন রাঁচীতে কি দেওঘরে গিয়ে থাকতে পারতেন, কিন্তু বউদির ভয় বেওয়ারিস পেয়ে বাড়িটা বস্তির মুসলমানরাই বেদখল করে নেবে। ওদের জ্বালাতেই আধ ঘণ্টার নোটিসে বাড়ি থেকে পালাতে হল।"

"সে কী কথা! আধ ঘণ্টার নোটিসে!" মানস ও যূথিকা অবাক।

"সংক্ষেপে বলি। উরদুকে বাঙলায় তরজমা করে বলছি। ষোলো তারিখ রাত্রে ওঁরা যথানিয়মে শুতে গেছেন। ঘুমিয়েও পড়েছেন। হঠাৎ এল্‌ফের অবিরাম চাঁৎকার শুনে ওঁদের ঘুম ভেঙে যায়। বেয়ারা ছুটে এসে বলে, ডাকাত পড়েছে। জানালায় মুখ গলিয়ে দেখেন মশাল আর নিশান হাতে বারো তেরো জন লুঙ্গীপরা লোক চেঁচিয়ে বলছে, দরজা খোলো। নইলে দরজা ভাঙব। স্বপনদা দু-তিনজনকে চিনতে পারেন। বস্তিতেই থাকে। মাঝে মাঝে চাঁদা নিতে আসে। আপদে বিপদে আইনের পরামর্শও চায়। ব্যাপার কী, চাঁদ মিঞা? এত রাতে কী মনে করে? স্বপনদা সুধান। সালাম আলায়কুম, সাহেব। উত্তর কলকাতার হিন্দুরা মুসলমানদের মেরে খেদিয়ে দিয়েছে, কেটেও ফেলেছে কয়েক হাজারকে। দক্ষিণ কলকাতায় তাদের জায়গা দিতে হলে হিন্দুদেরও মেরে খেদিয়ে দিতে হয়, দরকার হলে কেটেও ফেলতে হয়। আপনি আমাদের মুরুব্বি, আপনাকে মারতেও পারি নে, কাটতেও পারি নে, খেদিয়ে

দিতেও কি পারি? না, সেরকম বেইমান আমরা নই। কিন্তু মেহেরবানি করে বাড়িটা আমাদের ছেড়ে দিতে হবে। আজকেই সমস্তটা নয়, শুধু নীচের তলাটা। আপনারা তো দোতলাতেই থাকেন, আপনারা যেমন আছেন তেমনি থাকুন। কাল যেখানে পারেন চলে যাবেন। মালপত্তর, চাকরবাকর, কুকুর বেড়াল সব কিছু নিয়ে। আমরাই বয়ে নিয়ে ট্রাকে তুলে দেব। দাদা দেখেন তর্ক করা বৃথা। ধাঁ করে টেলিফোনের ঘরে গিয়ে রিং করেন। কিন্তু লাইন এনগেজড। পুলিশের আশা ছেড়ে দিয়ে বউদির দিকে অসহায় দৃষ্টিতে তাকান। বউদি চেঁচিয়ে বলেন, রামদীন, বন্ধুক নিকালো। জানালায় মুখ গলিয়ে বলেন, গোলী চলেগি। দো আদমীকো জান জায়েগা। ওরা বিশ্রী ভাষায় বউদিকে যাচ্ছেতাই গালাগাল দেয়। শাসিয়ে যায় যে কাল আবার আসবে, সঙ্গে সব রকম অস্ত্রশস্ত্র এবং আরো অনেক-জন। লাটসাহেব ওদের পক্ষে, বড় উজীর ওদের পক্ষে। গোলী চলেগি তো দোনো তরফসে চলেগি। দাদা ততক্ষণে ঠকঠক করে কাঁপছেন। বউদি দাপটের সঙ্গে বলেন, বড়লাট আমাদের পক্ষে, মিলিটারি আমাদের পক্ষে। ট্যাঙ্ক চালিয়ে বস্তি বিলকুল সাফ করে দেবে। পরের দিন সকালে মীর সাহেব পুলিশের গাড়ি নিয়ে উপস্থিত। বলেন, যশোবিকাশ রায়কে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেবার জন্যে বেরিয়েছি। তাঁর মেয়ে টুকটুক আমাকে খবর দিয়েছে যে আপনারাও বিপন্ন। আপনা-দের বেয়ারা রামদীন তার সঙ্গে দেখা করে কালকের ঘটনার বর্ণনা শুনিয়েছে। কী লজ্জার বিষয়! শহীদকে রিং করতেই তিনি পুলিশের গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছেন। দুটি পরিবারের জন্যে জায়গা আছে। আধ ঘণ্টা সময় দিচ্ছি। জান বাঁচাতে চান তো অবিলম্বে তৈরি হোন। ইতিমধ্যে রায় পরিবারকে নিয়ে আসি। ওঁদেরও আধ ঘণ্টা সময় দিয়েছি। কোন্ ঠিকানায় যাবেন মনঃস্থির করুন। আগে থেকে টেলিফোনে খবর দিন। মনে করুন এটা মিলিটারি ইভাকুয়েশন। সাত-আট দিন পরে বাড়ি ফিরবেন। যাবার সময় বন্দোবস্ত করে যান কে চার্জে থাকবে। গাড়িতে চড়ে তিনি উধাও হন।" বাবলী বলে যায়।

"এ যে রীতিমতো নাটক।" মানস কৌতূহলী হয়।

"উঃ! কী দুঃখের! নিজ বাসভূমে পরবাসী।"

যূথিকা ব্যথিত হয়। এটা নোবল রিভেনজ। স্বপনদা বলেন। বউদি শিউরে ওঠেন। ডবল ডাই-ভোরসীর সঙ্গে এক গাড়িতে যেতে হবে? আমার তো ভয় করছে, ওর মতলব ভালো নয়। কিন্তু কী করা যায়! বিপাকে পড়লে বাঘে হরিণে একঘাটে জল খায়। বউদি কী কী সঙ্গে নেবেন চট করে স্থির করে ফেলেন। স্বপনদা কোন্‌টা রেখে কোন্‌টা নেবেন ভেবে পান না। তাড়াতাড়ি যা হাতের কাছে পান তাই নিয়ে গাড়িতে ওঠেন। সব দরজা জানালা ভালো করে বন্ধ করা হয়। বেয়ারা থাকে চার্জে। বাবুর্চিকে ছুটি দেওয়া হয়। ড্রাইভারটিও মুসলমান। তাকে নিলে অকারণে ঝুঁকি নেওয়া হয়। হিন্দুরা হয়তো মেরেই ফেলবে। বউদি নিজেও গাড়ি চালাতে জানেন। কিন্তু তালুকদারের ওখানে গ্যারাজ পাবেন কোথায়? গাড়ি ও বাড়ি পাহারার বন্দোবস্ত করতে মীর সাহেবের সাহায্য চান। তিনি পুলিশের উপরে বরাত দেন। তালুকদারকে ফোন করা হয়। তিনি আশ্রয় দিতে খুশি হয়ে রাজি হন। এল্‌ফকেও স্বাগত জানান। গুন্ডদের হিন্দুস্থান পারকে নামিয়ে দিয়ে রায়েরা চলে যান রিজেনটস পারকে। সেখানে দে পরিবারের অতিথি হবেন। সেখানেও গারাজ পাবেন না বলে নিজের গাড়ি বাড়িতে রেখে গেছেন। পুলিশের গাড়িতে উঠে স্বপনদা বলেন যশোবিকাশ রায়কে, আফটার অল, শহীদ ইজ অ্যারিসটার অ্যান্ড অ্যান অকসোনিয়ান। যশোবিকাশ বলেন, ইয়েস। হী ইজ ওয়ন অভ্ আস অ্যাট হার্ট। বউদি আর টুকটুক দুজনেই খেপে যান। বউদি বলেন, গোরু মেরে জুতো দান! টুকটুক বলেন, অক্‌সফোর্ড শ্। হাসাহাসি পড়ে যায়। সেই থেকে ওঁরা দুজনে দুই বান্ধবী। টুকটুক আর প্রেমে পড়তে চান না, বিয়ে করতে চান না। নাচ গান নিয়ে বাকী জীবনটা কাটাতে চান। রুক্মিণী দেবী অ্যারানডেলের সঙ্গে যোগ দেবার কথা ভাবছেন। আমি তো জানতুম না যে স্বপনদা বাড়ি বদল করেছেন। ওঁর ওখানে গিয়ে রামদীন বেয়ারার মুখে বৃত্তান্ত শুনি। সে একপাল ভোজপুরীকে ডেকে এনে জাঁকিয়ে বসেছে। তাদের সকলের হাতে ইয়া ইয়া লাঠি। তারপর তালুক-দারদের ওখানে গিয়ে দেখা করি। উনি যখন শোনেন আমি তেভাগার তদারক করতে মফঃস্বলে বেরোচ্ছি তখন আমাকে বলেন আপনাদের সঙ্গে দেখা করে সব কথা

শোনাতে। স্বপনদার এখন লিখতে হাত কাঁপে, হাঁটতে পা কাঁপে। ডাক্তাররা বলছেন, ট্রমা। বউদি বিষম ভাবনায় পড়েছেন। আচ্ছা, ওটা কি সারে?" বাবলী সুধায়।

মানস ভয় পায়, কিন্তু অভয় দিয়ে বলে, "সারে বইকি।"

বাবলী আরো বলে, "ওদিকে পুলিশের লোক গিয়ে রামদীনের কাছ থেকে সে রাত্রের ঘটনার বিবরণ শুনে লিখে নিয়ে গেছে। বস্তিতে হয়েছে ধরপাকড়। চাঁদ মিঞা এখন সদলবলে জেল হাজতে। মুসলিম লীগের উকীলরা ওদের জন্যে আদালতে জামিন প্রার্থনা করে বিফল হয়েছেন। গভর্নরের এখন টনক নড়েছে। তিনি ম্যাজিস্ট্রেট আর পুলিশের উপর কড়া হুকুম জারি করেছেন। মুসলিম লীগ গভর্নমেন্টে রয়েছে বলে গভর্নরের ছত্রছায়ায় থেকে আইন ও শৃংখলা ভঙ্গ করবে এটা তিনি সহ্য করবেন না। যে কোনোদিন বরখাস্ত করবেন। নয়তো তাঁর নিজেরই আসন টলমল। অবশ্যার উন্নতি হচ্ছে বললে ভুল হবে না, আবার হচ্ছে বললেও ভুল হবে। হিন্দুরা এখন ঘরপোড়া গোরু। তারা সিঁদুরে মেঘ দেখলে ডরায়। মুসলমানদের মধ্যে যদিও বিস্তর সজ্জন আছেন, তাঁরা বহু হিন্দুকে রক্ষাও করেছেন, আশ্রয়ও দিয়েছেন তবু মুসলমানদের কাউকেই হিন্দুরা অন্তর থেকে বিশ্বাস করে না। নখী-দন্তী-শৃংগীদের মতো মুসলমানদের থেকে ওরা শত সহস্র হস্ত দূরে থাকতে চায়। যারা পাড়া ছেড়ে পালিয়েছে তারা আর পাড়ায় ফিরতে রাজী নয়। এ সমস্যার সমাধান গভর্নরের হাতে নয়। তিনি তাই কোয়ালিশন গভর্নমেন্টের পক্ষপাতী। কিন্তু তার জন্যে জিন্নার স্যাংকশন দরকার। জিন্না সেটা কেন দেবেন যদি বড়লাট ও কংগ্রেস হাই কমান্ড তাঁর মুখ রক্ষা না করেন? বড়লাট কংগ্রেসের সংগে ঝগড়া করতে অনিচ্ছুক। ঝগড়া করতে হলে করতেন ব্রিটিশ স্বার্থে। কিন্তু মুসলিম লীগের স্বার্থে একটিও ইউরোপীয় জীবনকে তিনি বিপন্ন করবেন না। তিনি ভালো করেই জানেন যে কংগ্রেস আরেক দফা আন্দোলন শুরু করলে বামপন্থীরা গান্ধী, নেহরু কারো তোয়াক্কা রাখবে না। ইউরোপীয়দের পিটিয়ে তাড়াবে। মুসলমানদের গায়ে হাত দেবে না। দেশ এখন আগুন হয়ে রয়েছে। বড়লাট মুসলিম লীগের স্বার্থে বড়োজোর এই পর্যন্ত করতে পারেন যে নতুন গভর্নমেন্টে মুসলিম লীগের জন্যে পাঁচটি আসন সংরক্ষিত থাকবে, কিন্তু কংগ্রেসের জন্য সংরক্ষিত আসন সে হিন্দুকে দেবে না মুসলমানকে দেবে সেটা কংগ্রেসের মর্জি। লীগের মর্জি নয়। আশ্চর্যের বিষয় এই সামান্য পয়েন্টটুকু মেনে নিতে তাঁর দু-দু মাস লাগল। শুনেছি কংগ্রেস হাই কমান্ড কংগ্রেস-লীগ কোয়ালিশনের খাতিরে একজন কংগ্রেস-মুসলিমকে বাদ দিতে উদ্যত হয়েছিলেন, মওলানা আজাদ পর্যন্ত অনুমোদন করেছিলেন, কিন্তু গান্ধীজী বাধা দেন। কংগ্রেস-মুসলিমদের স্বার্থত্যাগ কারো চেয়ে কম নয়। ত্যাগের দিন যাঁরা ত্যাগের সাথী ভোগের দিন তাঁরা ভোগের সাথী হবেন এটাই তো ন্যায়নীতি। তিনি বোধহয় অনুমান করতে পারেন নি তাঁর পলিসির পরিণাম কী হবে। হয়েছে মুসলিম লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস। যার ভুক্তভোগী অসংখ্য নিরীহ হিন্দু মুসলমান। শতকরা প'চানব্বই জন গরিব মানুষ, যারা দিন আনে দিন খায়। আমরা এ পলিসি কী করে সমর্থন করি? এটা ন্যায়নীতি হতে পারে, রাজনীতি নয়। যাই হোক, এতে আমাদেরই লাভ হয়েছে। আমরাই এখন দুই সম্প্রদায়ের মাঝখানে একমাত্র সেতুবন্ধ। নির্ভয়ে বিচরণ করি। উভয় পক্ষকেই অভয় দিই। আমাদের উপর লোকের আস্থা বেড়েছে। এই যে আমরা এই মুসলিমপ্রধান জেলায় ঘুরে বেড়াচ্ছি এটা কি সম্ভব হত যদি আমাদের পরিচয় হত আমরা কংগ্রেসের লোক বা হিন্দু গান্ধীর শিষ্য? জুলি কি সেরকম পরিচয় দিয়ে মুসলমানদের মন পেতে পারছে? সৌম্যদার কি আজকের এই পরিস্থিতিতে সেতুবন্ধন করতে পারছেন? সেতুভঙ্গ তো চার বছর আগে ঢের করলেন।"

যূথিকা স্বপনদার জন্যে উদ্বিগ্ন। "ওঁর ব্রেন ঠিক আছে তো?"

"ষোলো আনা ঠিক আছে। শকটা তো ব্রেনে নয়। প্রাণে। ওই যারা রাতের মাঝখানে এসেছিল তাদের হাতে ভাগ্যিস অস্ত্রশস্ত্র ছিল না। থাকলে বউদির দোনলা বন্দুক কতটুকু কাজে লাগত? হিংসা পরাস্ত হত প্রবলতর হিংসার কাছে। বউদির অপমানের সীমা থাকত না। আর দাদার তো প্রাণটাই যেত। কথাটা নির্জলা সত্য। আমিও চিন্তা করে দেখছি মুসলমানরা যে হিংসার মার্গ ধরেছে এই মার্গ যদি হিন্দুরাও ধরত তা হলে

হিন্দুর সর্বনাশ যা হত তার চেয়ে চার গুণ বেশি হত মুসলমানের সর্বনাশ। মেড়া লড়ে খুঁটির জোরে। ওরা লড়ছে ইংরেজদের জোরে। সে খুঁটিও আর আগের মতো জোরদার নয়। তার পরীক্ষা হয়ে গেল এবার কলকাতায়। কলকাতার তিনদিনের দাঙ্গাহাঙ্গামাকে যদি ব্যাটল অভ্ কালকাটা বলেন তা হলে হিন্দুরা জিতেছে, মুসলমানরা হেরেছে। প্রত্যেকবারই এ রকম হবে। এটা একটা ডিসাইসিভ ইভেনট। যেমন ব্যাটল অভ্ প্ল্যাসী। আমার খুব খারাপ লাগছে একথা ভাবতে যে হিন্দুরা মুসলমানদের চেয়েও হিংস্র হয়েছে। ওরা ছিল মাইল্ড হিন্দু। হয়েছে ওয়াইল্ড হিন্দু। বর্বরতার প্রতিযোগিতায় ওরাই পয়লা নম্বর। ওদের হাতে সমগ্র ভারত স'পে দিয়ে যাবে কেন ইংরেজ? মুসলমানদের নিরাপত্তার জন্যে ওদেরও একভাগ দিয়ে যাবে। এটা একরকম নিশ্চিত হয়ে গেল। তবে এটাও নিশ্চিত যে কলকাতা পাকিস্তানের ভাগে পড়বে না।" বাবলীর সিদ্ধান্ত।

মানস গভীরভাবে বিচলিত হয়। "তার তাৎপর্য কি বোঝ, বোন বাবলী? ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের তিন পুরুষের তপস্যা ব্যর্থ হবে। আর তাঁদের মধ্যে যাঁরা গান্ধীপন্থী তাঁদের এক পুরুষের সাধনা মুছে যাবে। সৌম্যদা তার শাহাদাত দিয়ে কী করে এ তরংগ রোধ করবে? আর তার বাপুর কী হবে? তা কি বিয়োগান্ত নাটকের শেষে যা হয়?"

যূথিকা বেদনা বোধ করলেও হাসির ভাণ দিয়ে ঢেকে দেয়। "তোমরা থাকতে আমাদের ভাবনা কী? একটা বিপ্লব-টিপ্লব কিছু ঘটাও। মানুষের মনটা এই মধ্যযুগের মিথ্যা দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত হোক। এরাও বুর্জোয়া, ওরাও বুর্জোয়া। যাঁহা কংগ্রেস তাঁহা মুসলিম লীগ। বুর্জোয়াতে বুর্জোয়াতে এক মুহূর্তেই কোলাকুলি হবে, যেই দেখবে লাল কেল্লার মাথায় লাল ঝান্ডা উড়ছে। প্রতিবিপ্লবের জন্যে ওরা হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে এককাট্টা হবে। আজকের নেতাদের দিন ফুরিয়ে এসেছে। কী বল, ভাই, তোমার নামটা কী?"

"মাধুরী হোম। আমি এই শহরেরই মেয়ে। গাইড হয়ে এসেছি। কমরেড নই। রাজনীতি বুঝিনে। মেয়েদের স্কুলে পড়াই।" বান্ধবী বলে।

"ওঃ! আমার ধারণা ছিল তুমিও ঘরসংসার ফেলে বিপ্লব করে বেড়াচ্ছ। আচ্ছা, এসো একটু খাবার টেবিলে বসা যাক। আচ্ছা, বাবলী, বউদিকে কেমন দেখলে বললে না তো। আর তাঁর এল্ফকে।"

"বউদি হোমসিক। আর এল্ফ পরের বাড়িতে এসে প্রতিক্ষণে অনুভব করছে সে আর স্বাধীন নয়। তার মুখে রা নেই। দেখে মায়া হয়। স্বপনদা তো বলছেন আর ওমুখো হবেন না। ওইসব লোকের মুখ দর্শন করবেন না। শেষে কি স্বামী-স্ত্রীতে ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবে? কলকাতার দাঙ্গায় ওঁদের সোনার সংসার ছারখার হবে? এটাও কি কম ট্রাজিক?" বাবলী জিজ্ঞাসা করে। জিজ্ঞাসার ভিতরেই উত্তর।

চব্বিশ

ভোজনের মাঝখানে মানস বলে, "বোন বাবলী, তোমার কাছে আমার একটি অনুরোধ আছে। তুমি সোজা পথে কলকাতায় ফিরে না গিয়ে বাঁকা পথে ঘুরে যেতে পারবে?"

"কেন পারব না? তবে পার্টির কর্মীদের সংগে পরামর্শ করতে হবে। জানো তো, পার্টি ফার্স্ট। কিন্তু ব্যাপার কী, বলো তো?" বাবলী বিস্মিত।

"তুমি স্বপনদাদের খবরটা জুলিদের একবার শুনিয়ে গেলে ভালো করতে। সেইসংগে জুলির মায়ের খবরটাও।" মানস উত্তর দেয়।

"নিশ্চয়। আমি কালকেই রওনা হয়ে যাব। তার আগে একটা টেলিগ্রাম করে দিয়ো। জুলিটাকে দেখতে এত ইচ্ছে করে। দেখা হলে খুব ঝগড়া করব ওর সংগে। লড়াই-টড়াই ছেড়ে কেমন বর নিয়ে ঘরসংসার করছে?" বাবলী হাসে।

সবাই হাসাহাসি করে। যূথিকা বলে, "তা তোমাকেই বা মানা করছে কে? পার্টিতেও তো সুপাত্রের অভাব নেই। বিয়ের নজীরও তো রয়েছে।"

"আচ্ছা, যূথীদি, তুমি কি এদেশের মেয়ে নও? তুমি কি জানো না যে শ্বশুর-শাশুড়ীর মত না থাকলে বিয়ে সুখের হয় না? জুলির শ্বশুর শাশুড়ী থাকলে বিয়েই হত না। তার বদলে বিপ্লব হত।" বাবলী রসিকতা করে।

"থাক, বোন বাবলী। কে'চো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়বে। ও প্রসংগ থাক। এখন শোনো। তোমার হাতে আমি একখানা চিঠি দিতে চাই। সেটা সৌম্যদার জন্যে।

ওর মাথায় একটা ভূত চেপে রয়েছে। শাহাদাত! ও শহীদ হবে। তুমি কি ওকে বুঝিয়ে বলতে পারবে যে বিয়ের পরে শহীদ হওয়ার স্বাধীনতা ওর নেই? শহীদই যদি হবে তো বিয়ে করতে গেল কেন? অমন বউ বহু ভাগ্যে মেলে। ও যেচারি শবরীর মতো কতকাল প্রতীক্ষা করেছে। ওর কি আর কারো সঙ্গে বিয়ে হত না? পাত্র তো বিলেত থেকে বার বার ধাওয়া করে এসেছিল। ওই, যার সঙ্গে মিলির বিয়ে হল।" মানস বলে।

"ওমা, তাই নাকি? মিলির বর জুলিকে বিয়ে করতে এসেছিল? কার সঙ্গে কার বিয়ে হয় প্রজাপতিই জানেন।" বাবলী যেমন শুনেছে।

"সত্যি। আমিই কি জানতুম যে এই বরটির সঙ্গে আমার বিয়ে হবে? ইনিও সৌম্যদার দোসর। ইনি নীরব দর্শক হবেন না। যুদ্ধের সময় যুদ্ধক্ষেত্রে যাবেন। কলকাতার দাঙ্গার খবর শুনে ছটফট করছিলেন, দাঙ্গাটাও তো একরকম যুদ্ধ। ইনি বলেন উত্তরাধিকারের যুদ্ধ। পদত্যাগের কথা তো হামেশাই বলেন। তা তুমি সৌম্যদাকে বুঝিয়ে বলবে যে দেশ তাঁর কাছে শহীদীয়ানা চায় না, ইংরেজরা এখন যাবার মুখে, তারাই ডেকে নিয়ে কংগ্রেসকে তাদের সিংহাসনে বসিয়ে দিচ্ছে। পরশু জবাহরলালের অভিষেক। কৈকেয়ী বাগড়া দিতে চেষ্টা করেছিলেন, ব্যর্থ হয়েছেন। কলকাতা ছাড়া আর কোথাও বিশেষ কোনো কাণ্ডকারখানা হয়নি। আর কলকাতায় যা হয়েছে তা তো ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ নয়, ইংরেজদের সঙ্গে যারা এতকাল লড়াই করে এসেছে সেই হিন্দুদের উপরেই অযাচিত আক্রমণ। গজনীর মাহ্‌মুদের মতো। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি কিন্তু অত সহজ নয়। ওদের গজনীতেই ফিরে যেতে হবে। ইংরেজরা যাচ্ছে, ওরাও যাক।" যূথিকা উত্তেজিত হয়ে বলে।

মানস মৃদু হেসে বলে, "গজনীতে ফিরে যেতে চাইলেও পাশপোর্ট লাগবে। ভিসা লাগবে। যতজন এসেছিল তাদের সংখ্যা নগণ্য। বাড়তে-বাড়তে যতজন হয়েছে তাদের সংখ্যা আফগানিস্তানের মোট জনসংখ্যাকেও ছাড়িয়ে যায়। তা হলে আফগানরা যাবে কোথায়? একই কথা মোগল বংশধরদেরও বেলায়। তা ছাড়া ন কোটি মুসলমানের সবাই তো আরব, ইরানী, তুর্ক, আফগান, মোগল বংশধর নয়। তারা স্বীকার না করলেও তাদের চেহারা, তাদের ভাষা ধরিয়ে দেয় যে তারা ভারতীয় বংশধর। ধর্মান্তরে বংশান্তর নয়। এখন এদের পা কী স্থানে যাবে? এই প্রশ্নের উত্তর তোমরা কেউ দিতে পার?"

"পাকিস্তানে।" যূথিকা, বাবলী, মাধবরী একসঙ্গে বলে ওঠে।

তখন মানস বলে, "কেউ ওদের যেতে বাধ্য করছে না। ওরাই পা তুলে বসে আছে। ইংরেজ যাচ্ছে, সুতরাং ওরাও যাবে। ইংরেজ যাবে তার হোমে, অতএব ওরাও যাবে ওদের হোমল্যান্ডে। যাওয়াটা দু-দশ বছর পরে হলে চলবে না। একই সঙ্গে, একই সময়ে। বরং একদিন আগে। হিন্দু নেটিভদের আওতায় বা অধীনে একটা দিনও নয়। সেই দুর্ভাগ্য এড়ানোর জন্যে ওরা প্রত্যক্ষ সংগ্রাম বাধিয়ে দেবে। সে সংগ্রাম অস্ত্রশস্ত্র ও মশাল নিয়ে। হিন্দুরা যদি সমান সহিংস হয় তবে যা হবে তা সাধারণ দাঙ্গা নয়, মধ্যযুগের ইউরোপে যাকে বলা হত 'ফিউরি'। অন্ধ আক্রোশে পরস্পরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বন্য পশুর চেয়েও নৃশংস হওয়া। জিন্না সাহেব বছর পাঁচ ছয় আগে এডওয়ার্ড টমসনকে বলেছিলেন, পাকিস্তানের জন্যে লড়াই বাধবে গ্রামে গ্রামে গঞ্জে গঞ্জে শহরে শহরে মহল্লায় মহল্লায়। টমসন চমকে ওঠেন। ওটা কি কখনো সম্ভব? জিন্না সাহেব দেখিয়ে দিলেন যে সম্ভব। আপাতত কলকাতায়। মুসলমানরা যদি জেতে তবে তো পাকিস্তান আদায় হবেই, যদি হারে তা হলেও পাকিস্তানের কেস মজবুত হবে। সম্রাটের দরবারে হিন্দুদের অত্যাচারের দোহাই দিয়ে পাকিস্তান প্রার্থনা করা হবে। সে প্রার্থনা মঞ্জুর হবেও। হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ক যেন নর্মান ও অ্যাংলো-স্যাকসনের সম্পর্ক। তেমনি পুরাতন। তেমনি অবিচ্ছেদ্য। কে যে নর্মান, কে যে অ্যাংলো-স্যাকসন তা কি এখন জোর করে বলবার উপায় আছে? একই রকম পোশাক পরলে, দাড়ি গোঁফ কামালে কেউ কি বুঝতে পারে কে মুসলমান, কে হিন্দু? হিন্দুরাও চোস্ত উর্দু বলে, মুসলমানরাও খাঁটি ভোজপুরী। মেয়েদের বেলা তো কথাই নেই। গ্রামে গ্রামে যখন লড়াই বাধবে তখন দেখবে রাতারাতি সবাই ভোল পালটেছে বা সদলবলে পালিয়েছে। এখন আমার ভাবনা কলকাতার মহামারী যেন পুব বাঙলায় সংক্রামিত না হয়। আমাদের ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশ সাহেব মুসলমান হলেও কমিউনাল নন। তাঁরা শান্তিরক্ষা করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

আমিও তাই। কিন্তু আমরা আর ক'জন! তবে আমাদের বিশ্বাস অধিকাংশ অধিবাসীই শান্তিপ্রিয়। তারা সহযোগিতা করবে।"

এর পর ওদের গল্প করতে বলে মানস চলে যায় ওর লেখার টেবিলে। চিঠি লেখে সৌম্যদাকে এবং স্বপনদাকে। চিঠি দুটো বাবলীর হাতেই পাঠাবে। বাবলীকে অনুরোধ করবে সৌম্য ও জুলির সঙ্গে দেখা করে কলকাতা ফিরতে।

সৌম্যকে লেখে, "স্টেটসম্যান যাকে বলছে 'গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং' আমি তাকে বলব সেনট বার্থোলোমিউজ ডে ম্যাসাকার। প্যারিসে যা ঘটেছিল প্রায় চার শতাব্দী পূর্বে। রাজমাতার প্ররোচনায় ক্যাথলিকরা প্রটেসটানটদের সদলবলে নিপাত কিংবা বিতাড়ন করে। বিতাড়িত প্রটেসটানটরা ইংলন্ডে গিয়ে রানী এলিজাবেথকে জানায়। এলিজাবেথের প্রতিবাদে ক্যাথারিন ডি. মেডিসি উত্তর দেন, তোমার যদি ইচ্ছে হয় তুমিও তোমার প্রটেসটানটদের নিপাত কিংবা বিতাড়ন করতে পার। তাই হয়। এখন আমার আশঙ্কা এদেশেও সেইরকম কিছু না ঘটে। অহিংসবাদীদের অন্য রকম উত্তর খুঁজে বার করতে হবে। যাতে হিন্দুও বাঁচে আর স্বস্থানে বাস করে। মুসলমানও বাঁচে আর স্বস্থানে বাস করে। বাপু বোধহয় এটাকে সাধারণ 'ল আন্ড অর্ডারে'র প্রশ্ন মনে করে ব্রিটিশ শাসকদের উপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত আছেন। কিন্তু তিনি কি জানেন না যে এটা তার চেয়েও সীরিয়াস। এটা একপ্রকার গৃহযুদ্ধ। কলকাতার ঘটনার বিবরণ যা শুনেছি এবং পড়ছি তাতে মনে হয় হিন্দু মুসলমানের ক্রোধ এত প্রচণ্ড যে তারা বন্দুক বেয়োনেট হাতে পেলে তাও ব্যবহার করত। ডাইনামাইট হাতে পেলে তাও।

"একদিকে কংগ্রেসের ব্রট মেজরিটি। অন্যদিকে মুসলিম লীগের ব্রট ফোর্স। এ দ্বন্দ্বের কোনো সাময়িক সমাধান নেই। রাজনৈতিক সমাধানই ভেবে বার করতে হয়। বাপু থাকতে আর কে সে কাজ করতে পারেন! আমরা যারা 'ল আন্ড অর্ডার' বজায় রাখতে নিযুক্ত তাদের দৌড় ততদূর নয়। আর আমরাও তো হিন্দু মুসলমানে বিভক্ত। হিন্দু যদি ঝাঁকে-ঝাঁকে মরে আমিও কি উত্তেজিত না হয়ে পারি? তেমনি, মুসলমান যদি কাতারে-কাতারে মরে কোন্ মুসলিম অফিসার

মাথা ঠাণ্ডা রেখে মন দিয়ে হিন্দুরক্ষা করতে পারবেন? বলা বাহুল্য, ইউরোপীয় অফিসার এখানে একজনও নেই, থাকলেও তিনি হয়তো কলকাতার গোরা পুলিশের মতো নিরপেক্ষ এবং নিষ্ক্রিয় থাকতেন। যতদূর শুনেছি। বাস্তবিক, তাঁরা তো যাবার মুখে। তাঁদের কী স্বার্থ, কেন তাঁরা হিন্দুর দিকে বা মুসলমানের দিকে ঝুঁকতে চাইবেন। ঝুঁকলে সমতা রাখবেন। সেটাই তাঁদের পলিসি। বেশি হিন্দু বা বেশি মুসলমান ধরলে বা মারলে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ উঠবে। ও'রা দুপক্ষেরই গুড উইল চান। কোনো একপক্ষের নয়।"

স্বপনদাকে যা লেখে তা কতকটা একই প্রকার। তার সঙ্গে যোগ করে দেয়, "তুমি ফরাসী মানুষ। তুমি কী না দেখেছ? চারশো বছর আগে সেনট বার্থোলোমিউজ ডে ম্যাসাকার। জনগণ দারুণ কমিউনাল ও মধ্যযুগীয়। তার দু'শো বছর বাদে তাদের উত্তরপুরুষরা আশ্চর্যরকম সেকুলার এবং আধুনিক। রাজমাতার উত্তরনারী রাজরানী মারী আঁতোয়ানেতকেই তারা গিলোটিনে নিপাত করে। রাজতন্ত্রকেও উচ্ছেদ করে। ক্যাথলিক চার্চের সম্পত্তি রাষ্ট্রসাৎ করে। চার্চের উপর থেকে পোপের আধিপত্য রহিত করে। চার্চের হাত থেকে শিক্ষাব্যবস্থা কেড়ে নেয়। আইনকানুন বদলে দেয়। সব মিলিয়ে যা হয় তাকে বলে ফরাসি বিপ্লব। অপেক্ষা করো আর দ্যাখো। এইটুকুতেই তোমার হাত পা কাঁপছে! আরো কত কী দেখতে হবে, তখন তো হৃৎকম্প হবে। যদি না নিজেকে সামলাতে সমর্থ হও, বউদিই তোমাকে সামলাবেন। তিনি শক্তিমতী।

"তোমার কর্তব্য দেশের লোককে বৃহত্তর এবং মহত্তর ভূমিকার জন্যে প্রস্তুত করা। ভলতেয়ারের মতো, রুশোর মতো, দিদেরোর মতো। এনসাইক্লোপীডিস্টদের মতো। হাত গুটিয়ে বসে না থাকলেই হাতের কাঁপুনি থেমে যাবে। পায়ের কাঁপুনিও থামবে সভায় সমিতিতে গেলে। উঠে দাঁড়াস, উঠে দাঁড়াস, ভেঙে পড়িস না রে।"

চিঠিখানা বাবলীর হাতে দেবার আগে মানস সবাইকে পড়ে শোনায়। বাবলী বলে, " যদি কিছু না মনে করে, মানসদা, তোমার থীসিসের বিসমিল্লাতেই গলদ। কংগ্রেস নেতারা তো বড়লাটের আহ্বানে ইনটারিম গভর্নমেনটে যোগ দিতে পা বাড়িয়েছিলেনই, আজাদকে বাদ দিয়ে। কিন্তু গান্ধীজীর ধনুর্ভঙ্গ পণ আজাদ বা অন্য একজন

ন্যাশনালিস্ট মুসলমানকে সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। নয়তো যাওয়া চলবে না। ওদিকে জিন্না সাহেবেরও অনমনীয় জেদ লীগপন্থী ভিন্ন অন্য কোনো মুসলমান গেলে লীগ নেতারা যোগ দেবেন না। বড়লাট একপক্ষকে তুষ্ট করতে গিয়ে আরেক পক্ষকে রুষ্ট করতে চান না। তাই কেয়ারটেকার গভর্নমেনট গঠন করেন। সেটা নিতান্তই ঠিকা বন্দোবস্ত। শেষে মনঃস্থির করেন যে কংগ্রেসের শর্তে রাজী হবেন, একজন ন্যাশনালিস্ট মুসলমানকে কংগ্রেসের জন্যে নির্দিষ্ট আসনের একটা দেবেন। তার মানে গান্ধীর পণই বহাল রইল, জিন্নার জেদ খারিজ হল। জিন্নার রাগটা পড়ল ইংরেজ ও কংগ্রেস উভয়ের উপরেই। রাগের মাথায় তিনি ডাইরেকট অ্যাকশনের প্রস্তাব পাশ করিয়ে নিলেন এবং ঘোষণার দিন ধার্য করলেন। ব্যাস্, অমনি বেধে গেল ভারতের বিভিন্ন স্থানে দাঙ্গা। অন্যান্য স্থানে যে আগুন সঙ্গে-সঙ্গে নিভিয়ে ফেলা হয় কিংবা জ্বলতেই দেওয়া হয় না। ইংরেজ আর কংগ্রেস উভয়েরই পলিসি এক। ব্যতিক্রম একমাত্র কলকাতা। আর সে কী বিস্ফোরক ব্যতিক্রম! এটা বিলেতের লেবার গভর্নমেনট পছন্দ করেন নি, ভারতের বড়লাটও না। বাঙলার গভর্নরও যে করেছেন তাও না। সুহরাবর্দীকে বিশ্বাস করতে গিয়েই এ ব্যাপারটা ঘটেছে। তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার বাংলাদেশের আর কোনোখানেই হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা বাধবে না। মুসলিম লীগের ডাইরেকট অ্যাকশন একটা ফাঁকা আওয়াজ। কংগ্রেস একজন ন্যাশনালিস্ট মুসলমানকে নিয়ে ইনটারিম গভর্নমেনটে যাচ্ছে। তবে ওটাও প্রোভিজনাল গভর্নমেনট নয়। ওটাও ফাঁকি। ওয়েভেলের নায়েব হয়ে নেহরু ইংরেজের জমিদারি চালাবেন। স্বাধীনতা না হাতি! বিপ্লব! বিপ্লব বিনা সাচ্চা আজাদি হতে পারে না। এ আজাদি ঝুটা আজাদি। এই হল যথার্থ থীসিস। আর তোমার ওই ফরাসি বিপ্লবও সেকেলে বিপ্লব। একেলে বিপ্লব হচ্ছে রুশ বিপ্লব। তার জন্যে দেশকে তৈরি করতে হলে রুশো, ভলতেয়ার কোনো কর্মের নয়। মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন, স্টালিন পড়তে হবে, তারই সুরে সুর মিশিয়ে লিখতে হবে, গাইতে হবে, নাচতে হবে, গণনাট্য অভিনয় করতে হবে। অমনি করে হবে গণজাগরণ ও রণ-আয়োজন। অহিংসা! হা হা! হো হো! হি হি! সৌম্যদার যা হাস্যকর উপায়! ওটা একটা মীথ। মানে মিথ্যা।"

মানস চুপ করে থাকে। যূথিকা মুখ খোলে। "তোমরা কবে একেলে বিপ্লব ঘটাবে ততদিন ঘটনার স্রোত অপেক্ষা করবে না। ইনিশিয়াটিভ এতকাল গান্ধীজীর হাতেই ছিল, এখন জিন্না সাহেবের হাতে চলে গেছে। এই নির্মম সত্যকে বাপু কীভাবে গ্রহণ করেন, কীভাবে এর সঙ্গে মোকাবিলা করেন তার উপর নির্ভর করছে ভারতের ভবিষ্যৎ।"

বাবলী বিদায় নিয়ে পরের দিন সৌম্যর কর্মস্থলের অভিমুখে রওনা হয় ও সেইদিনই পৌঁছয়। সৌম্য তখন তার আশ্রমে উপস্থিত ছিল না। জুলি তার কুটিরের মেজের উপর আলপনা আঁকছিল। দিল্লীতে আজ প্রোভিশনাল গভর্নমেনট। কী আনন্দ! কী আনন্দ! কী আনন্দ!

[ক্রমশ

তুলনামূলক সাহিত্য

অমিয় দেব

নিবেদনী

'উন্মাদদিগের, উন্মাদনিমিত্ত, উন্মাদকর্তৃক' বলে যে-সাহিত্যবিভাগ তার জন্মলগ্নে এক প্রখ্যাত সাহিত্যবিশারদ-কর্তৃক তিরস্কৃত হয়েছিল, সেই বিভাগের বয়স আজ আটাশ। আটাশেও যে সে বেঁচে আছে তাতে নাকি সেই সাহিত্যবিশারদ সম্প্রতি ঈষৎ বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। আমার এই নিবন্ধ প্রধানত তাঁর উদ্দেশেই লেখা। এই অর্বাচীন অনুচিন্তন যদি তাঁর প্রজ্ঞাপদে গিয়ে পৌঁছয় তাহলে আমি কৃতার্থ হব।

"আমার উপরে যে আলোচনার ভার দেওয়া হইয়াছে ইংরেজিতে আপনারা তাহাকে কমপ্যারেটিভ লিটরেচার নাম দিয়াছেন। বাংলায় আমি তাহাকে বিশ্বসাহিত্য বলিব।" রবীন্দ্রনাথের মতো গ্যেটেও এক 'বিশ্বসাহিত্যে'র কথা বলেছিলেন, যদিও তাঁর 'ভেল্ট্‌লিটেরাটুর'-এর অর্থ ছিল আলাদা। রবীন্দ্রনাথের মতে সাহিত্যমাত্রেই বিশ্বসাহিত্য, কারণ সাহিত্যের শেষ পর্যন্ত কোনো দেশকাল নেই; আর গ্যেটের উদ্দিষ্ট ছিল এক ভবিষ্যৎ যখন সাহিত্যে-সাহিত্যে শুধু সংযোগই নয়, সংলাপও প্রতিষ্ঠিত হবে। তাঁর 'শকুন্তলা'-স্তোত্রকে বলা যেতে পারে সেই সংলাপের এক পূর্বাভাস, এবং 'প্রতীচী-প্রাচী দিওয়ান'কে এক পূর্ণরূপ। তবে গ্যেটে 'ফের্গ্লাইশেন্ডে লিটেরাটুরগেশিশ্‌টে' বা 'ফের্গ্লাইশেন্ডে লিটেরাটুরভিসেনশাফ্‌ট্‌' অর্থাৎ 'তুলনামূলক সাহিত্যে'র কথা জানতেন না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যখন বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষাপরিষদে তাঁর 'বিশ্বসাহিত্য'-বিষয়ক বক্তৃতা করছেন তখন তো কথাটা প্রচলিত হয়ে গেছেই, এমনকি ইউরোপের দু-একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে তার চর্চাও কিঞ্চিৎ শুরু হয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথকে যাঁরা তুলনামূলক সাহিত্য বিষয়ে বলতে বলেছিলেন তাঁদের দূরদৃষ্টি ছিল : বিষয়টির অভিনবত্বের কথাই কেবল তাঁরা ভাবেন নি, তার উপযোগিতাও সম্ভবত তাঁদের মনে ছিল। অন্ততপক্ষে ঔপনিবেশিক সাহিত্যপঠন থেকে যে তা আলাদা সে-সম্পর্কে জাতীয় শিক্ষার প্রবক্তারা সচেতন ছিলেন, যদিও তাঁরা জানতেন না যে তাঁদেরই শিক্ষাপরিষদের উত্তরাধিকারী যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্যের বিভাগ প্রথম প্রতিষ্ঠিত হবে এবং সেই প্রতিষ্ঠায় অন্যতম উদ্যোক্তা হবেন রবীন্দ্রনাথের উত্তরসাধক এক কবি, বুদ্ধদেব বসু। এই সন্নিপাতে কি ইতিহাস-নামক অমোঘ শক্তির কোনো হাত ছিল? আর গ্যেটে যে তুলনামূলক সাহিত্যের প্রাগিতিহাসের এক প্রধান অধ্যায়, তা বলা বাহুল্য। গ্যেটের 'বিশ্বসাহিত্য'

(১৮২৭) থেকে রবীন্দ্রনাথের 'বিশ্বসাহিত্য' (১৯০৭)—তুলনামূলক সাহিত্যের এই আশি বছরকে বলা যেতে পারে প্রস্তুতিপর্ব : এই পর্বেই এর মূল প্রতিপাদ্যসমূহ ধীরে-ধীরে গড়ে উঠেছে। উপরন্তু গ্যেটের 'বিশ্বসাহিত্য'কে যদি বলা যায় ঐতিহাসিক তুলনার আদর্শ সংস্থান, তাহলে রবীন্দ্রনাথের 'বিশ্বসাহিত্য'কে বলতে হবে নান্দনিক তুলনার পরম প্রেরণা। অর্থাৎ তুলনামূলক সাহিত্য বলতে এখন আমরা যা বুঝি, তার অধিষ্ঠান এই দুই 'বিশ্বসাহিত্যে'র অন্তর্বর্তী প্রদেশে।

সম্প্রতি এক সর্বভারতীয় আলোচনাসভায় এক উদারস্বভাব ইংরেজির অধ্যাপক 'তুলনামূলক' কথাটার মাত্রা বাড়াতে-বাড়াতে পৌঁছে গিয়েছিলেন একই লেখকের বিভিন্ন রচনার তুলনাপর্বে, এমনকি একই লেখকের একই রচনার বিভিন্ন অংশের তুলনায়। বলা বাহুল্য, 'তুলনামূলক সাহিত্য' তা নয়। যে-সরলমতি প্রশ্নের জবাব দিতে-দিতে তুলনামূলক সাহিত্যের ছাত্র-শিক্ষকদের মাঝে-মাঝে ক্লান্ত হতে হয়, তাতেও অন্তত এই মূল কথাটা মেনে নেওয়া হচ্ছে যে, তুলনামূলক সাহিত্য একক সাহিত্যপাঠ নয়, তার আলম্বন একাধিক। কিন্তু এই আধিক্য যে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত বা নৈরাজ্যপ্রসূত ঔদার্যমাত্র নয়, তার যুক্তি-তর্ক দুইই আছে, তার প্রমাণ সচেতন তুলনামূলকতার সার্ধশতাব্দীর ইতিহাস। ১৮২৯-এ আবেল ফ্রঁসোয়া ভিলম্যাঁ-র সরবনে প্রদত্ত বক্তৃতা, 'অন্য সকল সাহিত্য এবং ইউরোপীয় মানসের উপর আঠারোশতকি ফরাসি লেখকদের প্রভাব'—সম্ভবত সচেতন তুলনামূলকতার প্রথম নথিবন্ধ নিদর্শন—আমরা এখন যাকে ইউরোপীয় 'আলোকপ্রাপ্তি' বলে থাকি তারই এক আংশিক আলোচনা। বা সচেতন তুলনামূলকতার দ্বিতীয় নিদর্শন ১৮৪১-এ প্রকাশিত জঁ-জাক অঁপেয়ার প্রণীত 'অন্যান্য সাহিত্যের সঙ্গে তুলনাক্রমে মধ্যযুগীয় ফরাসি সাহিত্যের ইতিহাস'-এর প্রথম খণ্ড, ফরাসি ভাষার উদ্ভব আর উন্নতির ইতিহাস হিসেবে সংগত কারণেই তুলনামূলক। অথবা পাঁচ এবং ছয়ের দশকে বারলিনে মরিৎস হাউপ্ট যখন হোমারের পাশাপাশি 'নিবেলুঙেনলীড' পড়াচ্ছিলেন এবং মিউনিখে মরিৎস কারিয়ের ভারতীয়, পারসিক, গ্রীক আর জরমন লৌকিক কাব্যের কথা বলছিলেন একসঙ্গে, তখন এই সন্নিপাত ছিল এক বিশেষ রূপকল্পের সঠিক নিদিধ্যাসনহেতু। আর সাতের দশকে যখন রুশ তুলনামূলকতার পিতৃস্থানীয় আলেকসান্দর ভেসেলভস্কি সেনট পিটারসবুরগে এই সন্নিপাতের পরিধি আরো বাড়িয়ে দিচ্ছিলেন তখন তাঁর যুক্তি ছিল বিবিধ সাহিত্যের পর্বগত সংগতি।

সুতরাং দুই বা ততোধিক সাহিত্যের যুক্তিভিত্তিক একত্র পঠনপাঠনকেই বলা যায় তুলনামূলক সাহিত্য। নাম নিয়ে একটা প্রশ্ন অবশ্য আছে, কারণ ফরাসি 'লিতেরাত্যুর কঁপারে'তে 'এত্যুদ'-এর কোনো আভাস নেই—'কঁপারে'র যেসব উদাহরণ থেকে কথাটার উদ্ভব হয়েছিল, 'আনাতমি কঁপারে', বা 'ফিজিওলজি কঁপারে', তাদের সঙ্গে এর সাদৃশ্যটা ঈষৎ দুষ্ট, কারণ 'আনাতমি' বা 'ফিজিওলজি' নাম বিজ্ঞানের আর 'লিতেরাত্যুর' নাম বিষয়ের। ফরাসি 'লিতেরাত্যুর কঁপারে'র ম্যাথু আরনল্ডকৃত ইংরেজি অনুবাদ 'কমপ্যারেটিভ লিটরেচর'ও তাই কিঞ্চিৎ অসিদ্ধ—ইতালীয় বা হিসপানি বা পর্তুগীজ অনুবাদও সমান অপটু। কেবল জরমন 'ফের্গ্লাইশেন্ডে লিটেরাটুরভিসেনশাফ্ট্' যথার্থ বা তদনুরূপ ওলন্দাজ কথাটাও। যতদূর জানি নিপ্পনি 'হিকাকু বুঙ্গাকু' 'লিতেরাত্যুর কঁপারে' বা 'কমপ্যারেটিভ লিটরেচর'-এর অনুবাদ। আমাদের 'তুলনামূলক সাহিত্য'ও অনুবাদ, হিন্দি বা পানজাবি বা মারাঠির মতো 'তুলনামূলক'-এর স্থলে 'তুলনাত্মক' বললে কোনো ব্যত্যয় হয় না ; আসলে 'বিচার' বা 'পঠন' কি ওই-জাতীয় কিছু যোগ না করলে জরমনসুলভ যাথার্থ্য অর্জন হবে না। সংস্কৃত আমাদের সহায় বলে উত্তরভারতে সেই সংস্কার এখনো অসম্ভব নয়, যদিও 'তুলনামূলক' বা 'তুলনাত্মক সাহিত্য'কে, 'লিতেরাত্যুর কঁপারে' বা 'কমপ্যারেটিভ লিটরেচর'-এর মতোই, প্রচলনগুণেই মেনে নিতে বোধহয় বাধা নেই। দক্ষিণে শুনেছি তামিলে শ্রীলঙ্কার কৈলাসপতি যে-কথাটার প্রবর্তন করেছেন তাতে বিজ্ঞান বা পদ্ধতির আভাস আছে। মালয়ালম বোধহয় আমাদের মতো শেষপদলোপী, কন্নড় বা তেলুগুর কথা কিছু শুনি নি।

তুলনামূক সাহিত্যের সঙ্গে মাঝে-মাঝে আরেকটা নামও শোনা যায়, 'সাধারণ সাহিত্য', 'লিতেরাত্যুর জেনেরেল' : মারকিনদেশ থেকে প্রকাশিত এক প্রবীণ তুলনামূলক বার্ষিকীর (১৯৫২—) নাম 'ইয়ারবুক অব কমপ্যারেটিভ অ্যানড জেনারেল লিটরেচর' এবং ১৯৬৯-এ প্রতিষ্ঠিত জরমন তুলনামূলক সমিতির নাম 'ডয়টশে গেজেলশাফ্ট্ ফ্যুর আলগেমাইনে উন্ট ফের্গ্লাইশেন্ডে লিটেরাটুরভিসেনশাফ্ট্'। 'তুলনামূলক' ও 'সাধারণ'-এর এই সহাবস্থানের একটা অতীত আছে : এই বার্ষিকীর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ভারনারপল ফ্রীডরিশ, যিনি এই শতকের ফরাসি তুলনামূলকতার অন্যতম প্রবক্তা এবং ফরাসি 'রেভ্যু দ্য লিতেরাত্যুর কঁপারে'-র (১৯২১—) প্রতিষ্ঠাতা ফের্ন বালদঁস্পের্জে'র-এর সঙ্গে একদা-প্রামাণ্য তুলনামূলক সাহিত্যের গ্রন্থপঞ্জীটি প্রস্তুত করেছিলেন। ফরাসি তুলনামূলকতা বরাবরই ঈষৎ বিধিবন্ধ ছিল, 'রাপর দ্য ফে' তথা প্রত্যক্ষ সম্পর্ক যেখানে নেই সেখানে ফরাসিমতে তুলনামূলকতার প্রশ্ন উঠত না। দুয়ের বেশি সাহিত্য যেখানে সম্পৃক্ত কিন্তু প্রত্যক্ষ সম্পর্ক অবর্তমান, অথচ তুলনার সুযোগ যেখানে আছে, সেখানে পল ভান তিঘেম, ফরাসিতে 'লিতেরাত্যুর কঁপারে' বিষয়ক প্রথম পুস্তকের (১৯৩১) রচয়িতা, প্রস্তাব করেন 'সাধারণ সাহিত্য' নামক এই নিকটাত্মীয়ের। 'তুলনামূলক' এবং 'সাধারণে'র সীমানা বিষয়ে যে ফরাসি প্রবক্তারা সকলে একমত হয়েছিলেন তা নয় : ভান তিঘেমের প্রধান শিষ্য মারিয়ুস-ফ্রঁসোয়া গিআরই তাঁর বইতে (১৯৫১) এ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন (১৯৬৭-তে 'ক সে জ' সিরিজে প্রকাশিত ক্লোদ পিশোয়া এবং অঁদ্রে রুসোর বইতে প্রত্যক্ষ-অপ্রত্যক্ষ সংযোগের ভিত্তিতে একটা সতর্ক প্রভেদ অবশ্য মেনে নেওয়া হয়েছে)। কিন্তু মারকিন মহলের আপত্তি গুরুতর : মারকিন তুলনামূলকতার প্রধান তথা প্রবীণতম প্রবক্তা রেনে ওয়েলেকের মতে 'তুলনামূলক' আর 'সাধারণে' কোনো প্রভেদ নেই, 'সাধারণ' আসলে 'তুলনামূলকের'ই নামান্তর।

শুধু 'সাধারণ সাহিত্য' নিয়েই নয়, সাধারণভাবে তুলনামূলকতার সীমা নিয়েও ফরাসি-মারকিনে এক বিতর্ক ক্রমেই দানা বেঁধে উঠেছিল। বিতর্ক আসলে ফরাসি-মারকিনে নয়, বিতর্ক রক্ষণশীল আর উদারপন্থীতে, এবং ফরাসি দেশের মতো মারকিন দেশেও যখন তুলনামূলকতার ব্যাপক প্রসার, হচ্ছিল সেই পাঁচের দশকেই ফরাসি তুলনামূলকতার বাস্তিল সরবনের ভিতসুদ্ধ নড়ে উঠল প্রধানত দুই অপ্রবীণের আবির্ভাবে, রেনে এতিয়ঁবল এবং রবের এসকারপি। রেনে এতিয়ঁবল বললেন, 'কঁপারেজঁ নে পা-রেজঁ', তুলনা যুক্তিমাত্র নয়, তুলনা অযুক্তিও, অর্থাৎ তাতে হৃদয়বত্তা আর কল্পনার অবকাশ আছে। খালি প্রতীচীর এদেশে-ওদেশে, অমুকে-তমুকে, এ-লেখায় ও-লেখায় সম্পর্কনিরূপণই তুলনা নয়, তুলনা প্রতীচী পেরিয়ে প্রাচীতেও, দূরতম প্রাচীতেও, তুলনা কাব্যকলায়, তুলনা ছন্দরীতি এবং অলংকারশাস্ত্রে, তুলনা গঠনব্যাখ্যানে, তুলনা অনুষঙ্গবিচারে। আদর্শ তুলনাবিদকে অনেক কিছু জানতে হবে, শিখতে হবে অনেক ভাষা, এমনকি ফ্রান্সে বসে বাঙলাও, কারণ—গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হবার সময় তুলনামূলক সাহিত্যের সংকটবিষয়ক তাঁর এই সন্দর্ভে ('কঁপারেজঁ নে পা রেজঁ : লা ক্রিজ দ্য লা লিতেরাত্যুর কঁপারে', ১৯৬৩) এতিয়ঁবল যোগ করলেন—তুলনামূলকতার নবতম পত্রিকা 'যাদবপুর জরনল অব কমপ্যারেটিভ লিটরেচর'-এ বাঙলা আলোচনাও থাকে, যথা ১৯৬২-র সংখ্যায় মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিবন্ধ। এতিয়ঁবল চাইলেন জগৎজোড়া প্রসার, সাহিত্যচিন্তার শাখায়-শাখায় বিস্তার ; এসকারপি প্রস্তাব করলেন এক তাত্ত্বিক পুনর্বিচার। ভান তিঘেম-গিআরেরা 'প্রভাব'-'অভিঘাত' প্রসঙ্গে কোনো রচনা কী ভাবে এক দেশ থেকে অন্য দেশে এসে পৌঁছয় বা 'প্রেরিত' হয় এবং কী ভাবে 'গৃহীত' হয়, তার আলোচনা করেছিলেন ; সেই 'প্রেরণ'-'গ্রহণে'র ক্ষেত্রে এসকারপি তুললেন একটা নতুন প্রশ্ন, সাহিত্যের সমাজতত্ত্ব, অর্থাৎ সমাজতত্ত্ব বাদ দিয়ে যে 'প্রেরণ'-'গ্রহণ'বিচার চলে না, সেই কথাই বললেন এসকারপি। আর সেইসঙ্গে এক 'গ্রহণ'-সংক্রান্ত জটিলতার কথাও বললেন যা আগে কেউ বলেন নি, যে 'গ্রহণে' অনেক স্থলেই মূল অভিপ্রায়ের বৈপরীত্য ঘটে, যা ছিল না তাই যোগ হয়, যা ছিল তার হয় বিলোপ—যেন ইত্যাকার গ্রহণ এক 'ত্রাঈজঁ ক্রেয়াত্রিস', সৃষ্টিধর্মী দ্রোহ। উদাহরণের অভাব হয় নি এসকারপির, সবচেয়ে জাজ্বল্যমান উদাহরণ ছিল হাতের কাছে, পো-বোদলেয়ার। মারকিন লেখক এডগার অ্যালান পো ফরাসি বোদলেয়ার আর তাঁর কোনো-কোনো প্রতীকী শিষ্যের চোখে হয়ে উঠলেন মহাকবি, প্রতীকিতার জনক, অথচ মারকিন সাহিত্যের ইতিহাসে পোকে মহাকবি বলা যায় না কোনোমতেই আর প্রতীকিতার পূর্বাভাস পো-র চাইতে হয়তো ইংরেজ কীটস-কোলরিজে বেশি ছিল।

কিন্তু ফরাসি রক্ষণশীলতা নিয়ে প্রথম আপত্তি

বোধহয় তোলেন পল মেরি তাঁর 'তুলনামূলক সাহিত্যের বর্তমান পরিস্থিতি' নামক প্রবন্ধে, এতিয়ম্বল-এসকারপির দু-দশক আগে। আর রক্ষণশীলতা বনাম উদারপন্থার এই বিতর্ক এক সার্বিক রূপ নেয় আন্তর্জাতিক তুলনামূলক সাহিত্যসংস্থার দ্বিতীয় সম্মিলনে, ১৯৫৮-তে মারকিনদেশের চ্যাপেল হিল শহরে। উদারপন্থার গুরু যদি বলতে হয় রেনে ওয়েনেককে, তাহলে উদারপন্থার শ্রেষ্ঠ শিষ্য বলতে হবে হেনরি রিমাককে, যিনি তুলনামূলকতার পরিধিবৃদ্ধির প্রস্তাব করে বললেন, তুলনামূলকতা কেবল সাহিত্যে-সাহিত্যে নয়, তুলনামূলকতা একদিকে সাহিত্য এবং অন্যদিকে শিল্পকলায় বা অন্য ভাবনায়ও। সংগীত, চিত্রকলা, ভাস্কর্যের সঙ্গে সাহিত্যের যোগ কেউ অস্বীকার করবে না, যেমন করবে না দর্শন, ধর্ম, রাজনীতি বা অর্থনীতির সঙ্গেও, এবং গত দুশো বছরের ইউরোপীয় চিন্তায় মাঝে-মাঝে এই সংযোগের, বিশেষত প্রথম সংযোগের কথা উত্থাপিত হয়েছে। আর আঠারো শতকে ভিঙ্কেলমান-লেসিং যে-বিভাজনতত্ত্বের সূচনা করেছিলেন—যার প্রথম সূত্রপাত হয়তো হয়েছিল হোরাসে—সেই তাত্ত্বিক অনুচিন্তনও সঙ্গে-সঙ্গে চলেছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, সাহিত্য এবং তদতিরিক্তের এই সম্মিলিত বিচার কি তুলনামূলক সাহিত্যের আওতায় আসে? ফরাসি মহলে তেমন সমর্থন নেই এর, বালদেন্‌স্পের্জের বা ভান তিঘেম কি জ-মারি কারে-গিআর কেউই এর কথা বলেন নি, এমনকি ফরাসিদের তরুণতুর্কী এতিয়ম্বলও না। কিন্তু আলেমানি তুলনামূলকতার প্রায় গোড়া থেকেই এর আভাস আছে : মাক্স কখ্‌ তাঁর 'ৎসাইট্‌স্রিফ্‌ট ফ্যুর ফের্গ্লাইশেন্ডে লিটেরাটুরগেশিশ্‌টে'তে (১৮৮৭—) ঘোষণা করেছিলেন যে তুলনামূলক সাহিত্য-ইতিহাসের অন্যতম বিচার্য যেমন সাহিত্যের ইতিহাসের সঙ্গে রাজনীতিক ইতিহাসের সম্পর্কপ্রবাহ তেমনি সাহিত্যের সঙ্গে চিত্রকলা-ভাস্কর্য বা দর্শন ইত্যাদির সংযোগ। কখ্‌ এতটাই সোচ্চার ছিলেন যে মারকিন রিমাককে মনে হতে পারে ১৯৬১-তে তাঁরই প্রতিধ্বনি করছেন খানিকটা। তবে কখের উত্তরাধিকার যে আলেমানি মহলে সমান বলবৎ আছে তা তাঁদের সাম্প্রতিক গবেষণাবলি থেকে মনে নাও হতে পারে, এমনকি তাঁদের 'গাইস্টেসগেশিশটে' বা ভাবনাবৃত্তের ইতিহাসচর্চায়ও যেন কিঞ্চিৎ ভাঁটা পড়েছে। শেষ পর্যন্ত, তুলনামূলকতার এই রিমাক-কথিত সম্প্রসারণ বোধকরি মুখ্যত মারকিন—অন্তত চর্চা তাই বলছে—যদিও মারকিনদেশে যে সকলেই এর সমান সমর্থক তা নয়, সম্ভবত তত্ত্বশিরোমণি ওয়েলেকও নন। সাহিত্য-সংগীত, সাহিত্য-চিত্রকলা বা সাহিত্য-চলচ্চিত্র এবং ধর্ম ও সাহিত্য, সাহিত্য-সমাজ ইত্যাদির বিচার কি সাহিত্য শাস্ত্রভুক্ত নাকি সংগীত-চিত্রকলা-ধর্ম ইত্যাদি অন্য শাস্ত্রের অন্তর্গত অথবা 'কম্যুনিকেশন' তথা 'সংযোগ' -নামধেয় এক সার্বিক শাস্ত্রের আয়ত্তাধীন, এই মূল প্রশ্নের কোনো সর্বার্থসাধক সমাধান এখনো হয় নি। এবং যাবৎ না হয় তাবৎ এই দ্বিতীয় তুলনামূলকতা নিয়ে দ্বিধা ঈষৎ থেকেই যাবে।

তবে তুলনামূলকতায় যে-কেন্দ্রোদ্ভূতিপ্রবণতা বা পরিধিমুখিনতা আছে তার পরাকাষ্ঠা সম্ভবত এইই। পক্ষান্তরে ফরাসি 'রাপর দ্য ফে'-র আক্ষরিকতার চাইতে কেন্দ্রগ আর কিছু নয়। কিন্তু এই বৈপরীত্যের বাইরেও তুলনামূলকতা সম্ভব, অন্তত রুশদেশে এক তৃতীয় রীতির একদা সূত্রপাত হয়েছিল। আলেকসান্দর ভেসেলভস্কি (১৮৩৮-১৯০৬) মূলত আলেমানি 'লিটেরাটুরগেশিশ্‌টে'রই অন্তর্গত এবং তাঁর অব্যবহিত পূর্ববর্তী মরিৎস হাউপ্ট বা মরিৎস কারিয়েরের সঙ্গে তাঁর সংযোগও স্পষ্ট, কিন্তু তাঁর 'তুলনামূলক কাব্যতত্ত্ব' গ্রন্থে তিনি যে-তাত্ত্বিক প্রস্তাব রচনা করলেন তা হাউপ্ট-কারিয়েরেরা করেন নি। তাই পরে, তাঁর অনুবর্তীদের হাতে, নাম নিল 'পর্বতত্ত্ব'। ভেসেলভস্কি বললেন, সাহিত্যমাত্রেই 'স্টাডীন' বা পর্ববিভক্ত, কোনো সাহিত্য নেই যার পর্ব থেকে পর্বান্তরে বিবর্তন হয় না—কারণ ইতিহাস সার্বিক, ইতিহাস অমোঘ। এবং পর্বক্রম সব সাহিত্যেই এক। কিন্তু কালের মাত্রা সর্বত্র সমান নয়, এ-সাহিত্যে যা আজ ঘটছে ও-সাহিত্যে হয়তো তা কাল ঘটে গেছে আর তৃতীয় এক সাহিত্যে হয়তো তা কাল ঘটতে যাচ্ছে। তাই তুলনা কালগত হয় না, বর্তমানে-বর্তমানে বা অতীতে-অতীতে মেলাতে গেলে বিড়ম্বনা ঘটতে পারে ; তুলনা পর্বগত। সাহিত্য-ইতিহাসের কাজ নয় সাহিত্যে-সাহিত্যে সংযোগনিরূপণ, সাহিত্য-ইতিহাসের কাজ পর্ব অনুযায়ী সাহিত্যে-সাহিত্যে সন্নিপাতন, তাতে কালগত অবিন্যাস যাই ঘটুক না কেন। প্রাচীন গ্রীকের সঙ্গে তাই মধ্যযুগীয় ইউরোপীয়ের

সহজেই সন্নিপাত হতে পারে, যদিও কাল ভিন্ন আর সংযোগসূত্রও খুব ক্ষীণ, অন্তত হোমারের সঙ্গে 'বেউল্‌ফ্‌' বা 'হিল্ডেব্রান্ডলীড'-'নিবেলুঙ্গেলীডে'র বিন্দুমাত্র না। যদি আমরা গ্রীক নাটক আর মধ্যযুগীয় নাট্য নিই, তাহলেও সমান তুলনা চলে, বিশেষত উদ্ভবের ক্ষেত্রে। প্রকৃতপক্ষে গ্রীক নাটকের উদ্ভব বুঝতে হলে মধ্যযুগীয় নাট্যের আর মধ্যযুগীয় নাট্যের উদ্ভব নির্ণয়ে গ্রীক নাটকের উদাহরণ খুবই কাজে আসে। ভেসেলভস্কি-প্রবর্তিত পর্বচেতনার অন্তরালে আছে এক ইতিহাসচেতনা যা নির্দেশবাদী। ফরাসি তুলনামূলকতার অন্যতম উৎস যদি হয় উনিশ-শতকী প্রত্যক্ষবাদ, তাহলে এই রুশ তুলনামূলকতার মূলে আছে উনিশ-শতকী নির্দেশবাদ।

ভেসেলভস্কির প্রধান অনুবর্তী জিরমুনস্কি, রুশ বিপ্লবের পরে রুশ তুলনামূলকতার প্রধান প্রবক্তা। কিন্তু দুয়ের দশকে প্রতিষ্ঠা পেলেও পরবর্তী আড়াই দশকে পর্বতত্ত্বের কথা আর কিছু শোনা যায় নি। পঞ্চম দশকের দ্বিতীয়ার্ধে এবং ষষ্ঠ দশকে এসে তার কিঞ্চিৎ পুনরুজ্জীবন ঘটেছে বটে, কিন্তু পর্বতত্ত্ব শেষ পর্যন্ত তৃতীয় তুলনামূলকতার রূপ নিতে পারে নি। এখনো পর্বতত্ত্ব বলতে আমরা বুঝি ভেসেলভস্কি জিরমনস্কি, মসকোর 'গোর্কি-বিশ্বসাহিত্যভবন' বা লেনিনগ্রাদের 'পুশকিনভবনে'র বর্তমান গবেষণাবলি নয়। তার অন্যতম কারণ এও হতে পারে যে পূর্ব ইউরোপের ভাষা-সাহিত্যচর্চার যে-দায়িত্ব এসে বর্তেছে তাতে পর্বতত্ত্বের করণীয় তেমন কিছু নেই। অন্তত ১৯৫৭ থেকে ৬১-র মধ্যে মসকোয় লেনিনগ্রাদে পরপর যে-কটি সম্মিলন হয়েছিল তাতে তুলনামূলকতার প্রশ্ন উঠেছিল প্রধানত সেইহেতু এবং সংশিলষ্ট সমাজতাত্ত্বিকতার সূত্রে। উপরন্তু ১৯৬২-তে বুদাপেস্ত তুলনামূলক সাহিত্য-প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে বুদাপেস্তে পূর্ব ইউরোপীয় তুলনামূলক সাহিত্যসম্মিলনের পর থেকে অনেক বেশি তৎপর হয়ে উঠেছে ছোটো দু-একটি দেশ, বিশেষত হাঙ্গেরি আর যুগোস্লাভিয়া। এবং গত দুই দশকে এই দু-দেশ আন্তর্জাতিক তুলনামূলক সাহিত্যসম্মিলনও আহ্বান করেছে, বেলগ্রেদ ১৯৬৭-তে, বুদাপেস্ত ১৯৭৬-এ। আন্তর্জাতিকতার সূত্রপাত হয়েছিল ৬২-তে বুদাপেস্তেই—তাতে আমন্ত্রিত ছিলেন পশ্চিম ইউরোপের কোনো-কোনো প্রতিনিধি। এবং সমাজতান্ত্রিকতার স্তালিন-যুগের আন্তর্জাতিকতাবিরোধী মনোভাবের সম্পূর্ণ অবসান ঘটিয়ে এই সম্মিলনেই ঘোষিত হয়েছিল যে 'মার্কসীয় সাহিত্যবিচার তুলনামূলক পদ্ধতি ছাড়া চলতে পারে না'। আর সম্মিলনের সভাপতি ইস্‌ত্‌ভান সতের তাঁর অন্ত্যভাষণে একথাও বলেছিলেন যে সামাজিক-অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ ব্যতিরেকে যেমন সাহিত্য বোঝা যায় না, তেমন সাহিত্য বুঝতে হলে সাহিত্যের অন্তর্লীন প্রক্রিয়াদিও জানা দরকার। 'সাহিত্য কেবল সামাজিক কারণের উপর নির্ভরশীল নয়, সাহিত্য নির্ভরশীল অন্য অনেক কিছুর সঙ্গে, সাহিত্যিক কারণের উপরেও।' অর্থাৎ যাকে তুলনামূলকতার নান্দনিক ধারা বলা হয়ে থাকে, যার প্রবক্তা রেনে ওয়েলেকের মতো এতিয়ম্বলও (এতিয়ম্বল ৬২-তে বুদাপেস্তে উপস্থিত ছিলেন), তাকে মেনে নিচ্ছে পূর্ব ইউরোপ, অন্তত আংশিকভাবেও মেনে নিচ্ছে। অবশ্য তার মানে এই নয় যে মার্কসীয় তথা সমাজতাত্ত্বিক বিচার আর নান্দনিক বিচারের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব আদৌ আর থাকছে না ; পক্ষান্তরে নিতান্ত নান্দনিক বিচার নিয়ে মাঝে-মাঝেই প্রশ্ন উঠতে যাচ্ছে, যেমন সম্মিলন-উত্তর গবেষণারূপে বুদাপেস্ত আকাদেমি থেকে ৬৪-তে প্রকাশিত সতের ও দ্যুপেক সম্পাদিত 'হাঙ্গেরীয় সাহিত্য : ইউরোপীয় সাহিত্য' নামক সংকলনের কোনো-কোনো প্রবন্ধে।

একান্তভাবে পূর্ব ইউরোপের পারস্পরিক সাহিত্য-বিচারও এক বিশেষ অর্থে তুলনামূলক, কেননা পূর্ব ইউরোপের ভাষা আর সাহিত্যসমূহ পরস্পরসম্পৃক্ত, অন্তত পশ্চিম ইউরোপের ভাষা আর সাহিত্যসমূহ অপেক্ষা অধিক পরস্পরসম্পৃক্ত। এবং এই তুলনামূলকতার কথা বুদাপেস্ত-সম্মিলনে বারবার উঠেছে, যথা পূর্ব ইউরোপের সাহিত্যসমূহের তুলনামূলক ইতিহাস-বিচার বা "পূর্ব ইউরোপে তুলনামূলক সাহিত্যের সম্ভাবনা" কিংবা "পূর্ব ইউরোপে তুলনামূলক সাহিত্য ও তুলনামূলক ছন্দতত্ত্ব", এমনকি "তুলনামূলক স্লাভ সাহিত্যের এক পথিকৃৎ : তেরেস য়াকব" ইত্যাদি প্রতিবেদনে। বলা বাহুল্য, এর সূত্রপাত হয়েছিল প্রথম মস্কো-সম্মিলনে, তবে বিক্ষিপ্তভাবে কেউ-কেউ পাঁচের দশকে মারকিনদেশেও এর কথা বলেছেন—যেমন প্রখ্যাত ভাষাতাত্ত্বিক রোমান য়াকবসন 'হার্ভার্ড স্লাভিক স্টাডিজ'

গ্রন্থমালার উদ্বোধন করেছিলেন তাঁর "তুলনামূলক স্লাভ সাহিত্যের মর্মস্থল" নামক প্রবন্ধ দ্বারা। তার আগেই বসটন থেকে প্রকাশিত হয়েছে 'তুলনামূলক স্লাভ সাহিত্যের রূপরেখা' গ্রন্থটি। মসকো-সম্মিলনের অব্যবহিত পরে অবশ্য 'ইয়ারবুকে' "স্লাভচর্চা ও তুলনামূলক সাহিত্য" নামে এক সংক্ষিপ্ত কথোপকথন প্রকাশিত হয়েছিল এবং ওয়াশিংটন থেকে দ্য রাদিয়ুস নামক তুলনামূলক স্লাভ সাহিত্যের এক অখ্যাত পূর্বসূরীর উপর একটি পুস্তকও বেরিয়েছিল। এই সমুদয় রচনা-আলোচনা থেকে একটি কথাই ফুটে বেরোয়, তা হল, স্লাভ সাহিত্যবিচার স্বতই তুলনামূলক। কথাটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য, কারণ তুলনামূলকতা কোথাও-কোথাও দ্বিতীয় মাত্রার হলেও কোনো-কোনো ক্ষেত্রে আবার একান্ত প্রাথমিক।

মাত্রাভেদ আসলে একাধিক সাহিত্যের সংযুক্তপঠনের তুলনামূলকতায় নয়—সে-পঠনের পদ্ধতি যাই হোক না কেন, ফরাসি বা মার্কিন বা রুশ—মাত্রাভেদ একক সাহিত্যের তুলনামূলক পঠনে। একক সাহিত্যপাঠেও যে তুলনামূলকতার প্রয়শই প্রয়োজন হয় তা নিয়ে আজ আর বোধহয় কোনো বিতর্ক নেই। ইংরেজি সাহিত্য পড়তে গেলে তো বারবার অন্য সাহিত্যের কথা তুলতে হয়, নরমানবিজয়ের পর মধ্যযুগীয় ফরাসি, ষোড়শ শতকে লাতিন-গ্রীক, সতেরো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে পুনরায় ফরাসি এবং উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে এখন পর্যন্ত ঘুরে-ঘুরে ফরাসি বা জরমন, এমনকি স্ক্যানডিনেভীয়। আর ফরাসির মতো অপেক্ষাকৃত আত্মম্ভরী সাহিত্যের বেলাও পরনির্ভরতার প্রশ্ন মাঝে-মাঝে ওঠে : ভলতেয়ারকে কি আঠারো-শতকী ইংরেজি প্রসঙ্গ না তুলেই সম্যক উপলব্ধি করা যায়, নাকি দিদেরোকে যিনি 'দ্য লনডন মারচেনট' নামক এক অশ্রুসজল 'বুর্জোয়া নাটক' দ্বারা স্পষ্ট হয়েছিলেন, আর উনিশ শতকের দ্বিতীয় আর তৃতীয় দশকের সমাদর কি পুরোপুরি সম্ভব মাদাম দ্য স্তায়েল কথিত সুসমাচার বিষয়ে অবহিত না হয়ে? এবং আঠারো-শতকী আলেমানি সাহিত্য-বিচার কি আদৌ সম্ভব, কী ভাবে শতকের প্রথম পাদে গট্‌শেডের ফরাসিকরণ নীতির সঙ্গে বোডমার-ব্রাইটিঙ্গার প্রস্তাবিত ইংরেজিকরণের দ্বন্দ্ব চলছিল তা না দেখে এবং কী ভাবে মহাকবি ক্লোপস্টোক কর্তৃক প্রমাণ হয়েছিল যে জরমনের পক্ষে ইংরেজি কাব্যের অনুসরণই শ্রেয় ও তরুণ গোটের চতুষ্পার্শ্বস্থ 'ঝড়-ঝঞ্ঝা'র লেখকেরা শেক্সপিয়রকে তাঁদের যুদ্ধনিনাদে পরিণত করেছিলেন তার হিসেব না করে? উদাহরণ আরো বাড়ানো যায়, কিন্তু রোমক সাহিত্য থেকে শুরু করে—প্রথম রোমক লেখাই ছিল অনুবাদ—প্রতীচ্য কোনো সাহিত্যের কথা ভাবা যায় না যা কখনো না কখনো অন্য কোনো সাহিত্যের সংস্পর্শে আসে নি। সুতরাং বিশুদ্ধ একক সাহিত্যপাঠ সম্ভব কেবল রোম-পূর্ব গ্রীকের, এমনকি অ্যাংলো-স্যাকসন বা প্রাচীন জরমন বা প্রাচীন গৈলিক ইত্যাদিরও পুরোপুরি সম্ভব নয়।

কিন্তু একক সাহিত্যের পঠনভুক্ত তুলনামূলকতা সর্বত্র এক নয়, কোথাও কম কোথাও বেশি। বেশি পূর্ব ইউরোপের সাহিত্যে-সাহিত্যে, কম পশ্চিম ইউরোপে। বেশি বহুভাষিক দেশে-দেশে। বহুভাষিকতা এবং তুলনামূলকতার সম্পর্ক সবচেয়ে ভালো বুঝতে পারার কথা আমাদের, কারণ আমাদের মতো বহুভাষিক দেশ আর নেই। সুইৎসারল্যানড বা বেলজিয়ম-ক্যানাডাকে ঠিক বহুভাষিক দেশ বলা চলে না, কারণ সুইৎসারল্যানডের তিন আর বেলজিয়ম-ক্যানাডার দুই ভাষার পারস্পরিক সংযোগ প্রায় নেইই। প্রকৃতপক্ষে সুইৎসারল্যানডের ফরাসির যোগ ফ্রান্সের ফরাসির সঙ্গে, সুইৎসারল্যানডের জরমন বা ইতালীয়ের সঙ্গে নয়, এবং জরমন-ইতালীয় বিষয়েও ঠিক একই কথা বলা যায়। বেলজিয়মের ফরাসির স্বাদ স্বতন্ত্র, কিন্তু তাতে কি ফ্লেমিশের কোনো ছাপ আছে? ক্যানাডা দূরবর্তী দেশ, সেখানকার ফরাসির পক্ষে ফ্রান্সের ফরাসির সঙ্গে সংযোগ রাখা শক্ত, তবু তাতে ক্যানাডার ইংরেজির প্রভাব একেবারেই প্রবল নয়। ক্যানাডার ইংরেজিকেও যুক্তরাজ্যের বা যুক্তরাষ্ট্রের ইংরেজির প্রেক্ষিতে ভাবা হয়, কুইবেকবাসীদের ফরাসির তুলামূল্যে দেখা হয় না। রুশদের বহুভাষিক, কিন্তু এক বৃহৎ আর অনেকগুলো ক্ষুদ্র ভাষার সহাবস্থানে তার বহুভাষিকতার চেহারা অন্যরকম। আমরাই একমাত্র যারা অনেক বৃহৎ এবং অনেক পরপরসন্নিকট ভাষার অধিকারী। স্বভাবতই আমাদের একক সাহিত্যপাঠে এই বহুত্বের ছায়া পড়ে, কিন্তু কেবল লম্বভাবেই পড়ে না, মাঝে-মাঝে তির্যগ্‌ভাবেও পড়ে, প্রায় দৃশ্যাতীত রকমের তির্যগ্‌ভাবে। ফলে পরিমাপ হয়ে ওঠে কখনো-কখনো দূরহ, যদিও স্বজ্ঞায় আমাদের আদৌ ঘাটতি হয় না কিংবা বোধের ঘরে পড়ে না ঢ্যারা। অর্থাৎ আমাদের কোনো মুহূর্তে নেই যখন আমরা নিতান্তই একক, বাঙলা খালি বাঙলা, মারাঠি মারাঠি, তামিল তামিল ; বাঙলা আমাদের সর্বক্ষণই বাংলা+, মারাঠি মারাঠি+, তামিল তামিল+। স্পষ্টত পরিমাপ্য বা অপরিমাপ্য যাই হোক না কেন, এই যোগচিহ্ন ব্যতিরেকে কোনো একক সাহিত্য-পাঠ আমাদের সম্ভব নয়। আমাদের বহুভাষিকতাকে কেউ-কেউ ইউরোপীয় ভাষাবৈচিত্র্যের সঙ্গে তুলনা করে থাকেন, বলেন, আমাদের পারস্পরিকতা ইউরোপীয় পরস্পরবংসলতারই অনুরূপ। কিন্তু তা নয়, ইংরেজি সাহিত্যে ফরাসি-জরমন ইত্যাদির ছায়া মাঝে-মাঝেই পড়ছে বটে এবং সেই ছায়াব্যতিরেকী ইংরেজী সাহিত্য-পাঠ শেষ পর্যন্ত অসিদ্ধও, তবু ইংরেজি সাহিত্যকে নিরন্তর ফরাসি-জরমন ইত্যাদি অধ্যুষিত বলা যাবে না, ইংরেজির অনেক মুহূর্তে কেবল ইংরেজিরই। তা ছাড়া যে-ছায়া এসে বাইরে থেকে পড়ছে তা সম্পূর্ণ দৃশ্যমান, তার জন্যে কোনো তৃতীয় নয়ন কখনো মেলতে হয় না। অর্থাৎ ইউরোপীয় সাহিত্যসমূহের পরস্পরবংসলতা তুলনামূলকতার যে-স্তরে পরিমাপ্য আমাদের পারস্পরিকতার পরিমাপ শুধু সেই স্তরে হয়ে ওঠে না, তার জন্যে অন্য এক স্তরেও অবতরণ করতে হয়।

বলা বাহুল্য, তুলনামূলক ভারতীয় সাহিত্য তুলনামূলক স্লাভ সাহিত্যের চেয়েও অধিক অপরিহার্য, কেননা স্লাভ সাহিত্যসমূহ কয়েকটি পরস্পরসন্নিহিত দেশে অধিষ্ঠিত হলেও বিচ্ছিন্ন, আর ভারতবর্ষ একদেশ। সাহিত্যের মূল অবলম্বন যে ভাষা তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু সাহিত্যের অন্য এক অবলম্বনও আছে, অভিজ্ঞতা। এবং অভিজ্ঞতারাজির ঐক্য যদি দেশগত ঐক্যের অন্যতম শর্ত হয়, তাহলে বহুভাষিক দেশেও সাহিত্যগত ঐক্যতানের সম্ভাবনা বিদ্যমান। অবশ্য ঐকতান যেহেতু ঐক্য নয় তাই ভারতীয় সাহিত্য বহু—একবচনের ব্যবহার কিঞ্চিৎ আলঙ্কারিক। 'অনেক ভাষায় লেখা হলেও ভারতীয় সাহিত্য এক'—সাহিত্য অকাদেমির এই সদুক্তিও আসলে এক সদিচ্ছাজাত অলংকার। কিন্তু এই বহুকে বোঁধে রেখেছে এক একবচন, এক পদ্ধতি, তুলনামূলক ভারতীয় সাহিত্য, তদ্ধারাই আমরা পৌঁছতে পারি ভারতীয় সাহিত্য নামক একবচনে না হোক, তার প্রতি-ভাসে। সুতরাং কর্তব্য এই নয় যে আমরা আগে থেকে কিছু সর্বভারতীয় ধ্রুব নির্ধারণ করে নিয়ে বিবিধ ভারতীয় সাহিত্যে তার প্রতিফলন দেখব ; কর্তব্য এই যে বিবিধ ভারতীয় সাহিত্যের বিভিন্ন সমাপতন থেকে আমরা কতিপয় সামান্য সূত্রে উপনীত হব। কর্তব্য এই নয় যে কোনো এক সাহিত্যকে অগ্রণী ভেবে নিয়ে অন্য সকল সাহিত্যে তার সমান্তর খুঁজব ; কর্তব্য এই যে দুই বা তিন সাহিত্যের সন্নিপাত ঘটিয়ে-ঘটিয়ে আমরা ইতিহাস নির্ধারণ করব। 'প্রয়োগবাদ' আন্দোলন যদি চল্লিশের দশকে হিন্দি কবিতায় হয়ে থাকে 'প্রগতি'র প্রতিক্রিয়া হিসেবে আর পরে পানজাবিতে, তার মানে এই নয় যে সব উত্তরভারতীয় কবিতাতেই প্রয়োগবাদ খুঁজতে হবে—এমনও হতে পারে যে বাঙলা কবিতায় এক সর্বৈব প্রয়োগ প্রগতির আগেই শুরু হয়ে গিয়েছিল এবং দুয়ে কোনো বৈরিতাও ছিল না। কিংবা 'দলিত' মারাঠিতে আছে বলে সর্বত্র 'দলিতে'র প্রত্যাশা সংগত হবে না অথবা গান্ধিবাদ একাধিক সাহিত্যে পাওয়া যাচ্ছে বলে সব সাহিত্যেই পেতে হবে, এই অনুচিন্তন অবৈজ্ঞানিক। সুতরাং কেবল কোনো এক সাহিত্যের প্রেক্ষিতে, কিংবা সর্বভারতীয় সাধারণ্যের সূত্রে, কিছু আলোচনাচক্রে বসে ভারতীয় সাহিত্যে পৌঁছনো যাবে না, ভারতীয় সাহিত্যে পৌঁছতে হবে তুলনামূলকতার সর্বার্থক প্রয়োগে। এবং বহুভাষিতার ক্ষেত্রে তুলনামূলকতার এই প্রয়োগ যে তুলনামূলকতার পরাকাষ্ঠা তাতে সন্দেহ নেই।

তুলনামূলক ভারতীয় সাহিত্য তুলনামূলকতার পরাকাষ্ঠা অন্য এক কারণেও। ফরাসি তুলনামূলকতা নিয়ে যে-আপত্তিই থাক না কেন, তুলনামূলকতার প্রধান প্রয়োগস্থল আজও প্রভাব-অভিঘাত। আর ভারতীয় সাহিত্যসমূহে পারস্পরিক প্রভাব-অভিঘাত যাই ঘটে থাকুক না কেন, আধুনিকের উপর আধুনিকের বা আধুনিকের উপর প্রাচীনের, সে-সব ছাপিয়ে গেছে এক বিপুল পাশ্চাত্য প্রভাবে-অভিঘাতে। সেই বিপুলতার কোনো নজির অন্তত প্রতীচীতে নেই। প্রতীচ্য তুলনামূলক মহলে প্রভাবের যে-সব উদাহরণ নিয়ে প্রভাবতত্ত্বের বিচার-বিবেচনা হয়, যেমন পুশকিন বা লেরমনতভের উপর বায়রনের কি কারলাইলের উপর গ্যেটের, এই বিপুলতার পার্শ্বে তা নিতান্তই মৃদু, নিতান্ত লেখকে-লেখকে যোগাযোগ। সেই যোগাযোগ কী ভাবে ঘটল, কোন্

বস্তু বা ব্যক্তির মধ্যস্থতায় এবং তাতে প্রভাবগ্রহীতার রচনায় কী পরিবর্তন ঘটল—তার পরিমাপই সেক্ষেত্রে উদ্দেশ্য। আর এক্ষেত্রে এক পুরো সাহিত্য অন্য এক বা একাধিক সাহিত্য দ্বারা স্পৃষ্ট হচ্ছে : একান্ত ব্যক্তি-ভিত্তিক পরিমাপে কি বেশিদূর এগোনো যায় এখানে? মধুসূদনের মতো লেখক না হয় তাঁর হোমার, তাঁর ভারজিল-ওভিদ, দান্তে-তাস্সো, মিল্টন-বায়রনের কথা আকারে-প্রকারে বলে গেলেন, এবং বঙ্কিমচন্দ্র-স্কট নিয়ে গবেষণা হল আর তাঁর কঁৎ-মিল-বেন্থাম না হয় স্বতঃ-প্রকাশ্য, আর ধরা যাক রবীন্দ্রনাথ খুঁড়ে-খুঁড়ে আমরা কতটা শেলি কতটা কীটস আবিষ্কার করলাম—অতঃপর? যদি মধুসূদন-বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথেই সীমাবদ্ধ থাকত উনিশশতকী বাঙলার পাশ্চাত্য প্রভাব-অভিঘাত, তাহলে প্রশ্ন ছিল না, তাহলে বলা যেত ব্যক্তিভিত্তিক পরিমাপই যথেষ্ট। কিন্তু উনিশ শতকের প্রায় সকলেই যে দেখা যাচ্ছে কিয়ৎ পরিমাণে হলেও সেই প্রভাব-অভিঘাত গ্রহণ করছেন—ব্যক্তিভিত্তিক পরিমাপ জুড়ে-জুড়ে আমরা পৌঁছব কোথায়? তা ছাড়া আরেকটা প্রশ্ন খুব জরুরি হয়ে উঠছে এক্ষেত্রে : কেন প্রভাব, কেন অভিঘাত? ব্যক্তির ক্ষেত্রে এতাদৃশ প্রশ্নের উত্তর থাকে ব্যক্তিমানসে ; হয়তো তার অন্তরালে লোকমানস বিদ্যমান, কিন্তু মুখ্যত নয়। পুশকিন লেরমনতভ কেন বায়রনে আকৃষ্ট হবেন তাতে পুশকিন-লেরমনতভের অন্তরালে নিশ্চয়ই উনিশ শতকের প্রথমার্ধের রুশমানসও আছে, কিন্তু আগে পুশকিন আগে লেরমনতভ। এক্ষেত্রে হয়তো আগে মধুসূদন আগে বঙ্কিমচন্দ্র নন, আগে লোকমানস। 'মেঘনাদবধ কাব্য' লিখতে গিয়ে মধুসূদন বারবার হোমারের কথা ভাবছেন, বলছেন তাঁর লেখা হবে হোমারের মতো, বাল্মীকির মতো নয়। তুলনামূলক বিচারে এমন হয়তো দেখানো যাবে যে বাল্মীকি-হোমারে তেমন বৈসাদৃশ্য নেই, বৈসাদৃশ্য তাঁদের সঙ্গে মধু-সূদনের। কিন্তু কেন মধুসূদনের মনে হবে তিনি লিখবেন হোমারের মতো? হীনম্মন্যতা? এই প্রশ্নের উত্তর কেবল মধুসূদন-নামক ব্যক্তির ইতিহাস ঘাঁটলে পাওয়া যাবে না, এর জন্যে যেতে হবে সামাজিক ইতি-হাসের দরজায়, দেখতে হবে ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তনে লোকমানসে কী-কী পরিবর্তন ঘটেছিল—মধুসূদনের নিজের 'অ্যাংলো-স্যাকসন ও হিন্দু' বিষয়ক প্রবন্ধটিকে হয়তো সেই ইতিহাসের এক দলিল হিসেবে দেখা যেতে পারে—কেমনভাবে যাকে মাঝে-মাঝে হীনম্মন্যতা মনে হয় তার জন্ম হয়েছিল এবং তার কোনো প্রতিক্রিয়া আদৌ উৎপন্ন হয়েছিল কিনা, ইত্যাদি ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথের উপর পাশ্চাত্ত্য প্রভাব যে তদুক্ত কতিপয় কবি-লেখকেই সীমাবদ্ধ ছিল না একথা বলে একবার বুদ্ধদেব বসু কিছু লোকের বিরাগভাজন হয়েছিলেন, কিন্তু সীমাবদ্ধ সত্যিই কি থাকতে পারে, বিশেষত তাঁর পূর্বসূরীরা যেক্ষেত্রে এতটা স্পৃষ্ট হয়েছিলেন? রবীন্দ্রনাথ যদি বিহারীলাল থেকে কিছু নিয়ে থাকেন, তাহলে কি তিনি সেই সূত্রেও কিঞ্চিৎ পাশ্চাত্ত্য প্রভাব গ্রহণ করছেন না? ঔপনিবেশিকতার কথা বাদ দিয়ে কি রবীন্দ্রবীক্ষা আদৌ সম্ভব? কি বঙ্কিমমানস বিচার? সুরাজ্য আর স্ব-রাজ্যের যে-বিতর্কে তিনি অংশীদার ছিলেন তার সঙ্গে তাঁর উপন্যাসের কোনো যোগ ছিল না? নাকি তাঁর প্রাচীনপন্থায় ছিল না কোনো খাদ, তাঁর আপন পাশ্চাত্ত্যী-করণের কোনো প্রতিক্রিয়া? সাহিত্যিক প্রভাব-অভিঘাতের এই সামাজিক-রাজনৈতিক বিস্তার খুব সচরাচর মেলে না।

এমনকি রোমক সাহিত্যই যেখানে গ্রীক সাহিত্যের অনুকরণে গড়ে উঠেছিল সেখানেও অতদূর বিস্তার ছিল না। সত্য, লিভিয়ুস আন্দ্রোনিকুস, যাঁর 'অদিসি'-অনুবাদে বলতে গেলে লিখিত রোমক সাহিত্যের সূচনা, তিনি নিজে ছিলেন গ্রীক। সত্য, যে-নাট্যসাহিত্য হয়ে উঠল রোমক উৎকর্ষের প্রথম নিদর্শন তাও 'ফাবুলা পল্লিয়াতা' অর্থাৎ গ্রীক পোশাকে ন্যস্ত আখ্যানমঞ্জরী, গ্রীক মিনান্দার-ফিলেমন-দিফিলুসের অনুব্যবসায়। এও সত্য যে খ্রিষ্টোত্তর প্রথম শতকে তাঁর প্রথম ব্যঙ্গকাব্যে এই গ্রীক-নির্ভরতার তদালব্ধ আতিশয্যকে কষাঘাত করেছিলেন জুভেনাল। তা সত্ত্বেও রোমক-গ্রীক সম্পর্কের এ জটিলতা ঔপনিবেশিক জটিলতার সমতুল নয়—হাজার হলেও রোম ততদিনে হয়ে উঠছে গ্রীসের শাসক। ইঙ্গ-মারকিন সম্পর্কও জটিল, স্টীফন স্পেনডার তো তাতে যুগপৎ প্রেম আর ঘৃণা দেখেছেন এবং আমরা যদি সেই স্বল্পখ্যাত নাট্যকার রয়েল টাইলারের 'কন্ট্রাস্ট' থেকে শুরু করি তাহলে মানব এই একদিকে নির্ভরতা আর অন্যদিকে বিদ্রোহের নজির খুব বেশি নেই। তত্রাচ প্রধানত বিপ্লবোত্তর বলে ঔপনিবেশিকতার গ্লানি এবং তজ্জনিত জটিলতা তেমন নেই মারকিন সাহিত্যে।

বিদেশী প্রভাব-অভিঘাতের ভারতীয় জটিলতার একমাত্র তুলনা আছে তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য সাহিত্যে যেখানে অনুসরণ-অনুকরণ তো বটেই, ভাষা, এমনকি লিপিও কোথাও-কোথাও এসেছে শাসক দেশ থেকে। কিন্তু তার মানে তো এই নয় যে কথা ছিল না, কাহিনী ছিল না, ঐতিহ্যের ঘরেও ছিল ঢ্যারা। ছিল, কিন্তু তাকে ঘিরে ঈষৎ হীনম্মন্যতাও হয়তো জন্মেছিল শাসকপ্রভু-আনীত নব্যশিক্ষার সংস্পর্শে। যেখানে-যেখানে ঐতিহ্যে-আধু-নিকতায় সংযোগ ঘটেছে, সংঘাত সত্ত্বেও, হীনম্মন্যতা সত্ত্বেও সেখানে-সেখানে ঘটেছে ইতিহাসের ঋদ্ধি। উনিশ শতকের বা বিশ শতকের প্রথম পাদের ভারতীয় সাহিত্যের মতো ঐতিহাসিক অর্থে সমৃদ্ধ সাহিত্য ইউরোপে নেই। নান্দনিক ঋদ্ধির কথা বলছি না—তলস্তয় কি বালজাক কি ডিকেনস-তুল্য কারো উদয় ঘটেছে কিনা, ক-জন কাফকা ক-জন জয়েস ক-জন প্রুস্ত, সে-প্রশ্ন এটা নয়—বলছি ভাবনার বহুমাত্রিকতার কথা, বলছি প্রকরণের বৈচিত্র্য আর বিস্তারের কথা। এ যেন কালিদাসের পার্শ্বে মহাভারত, 'ফিনিগান্স ওয়েক'-এর প্রতিতুলনায় 'জেমসীয়' বাইবেল। কোনো উইলিয়ম গোলডিঙ কোনো চিনুয়া আচিবির সমকক্ষ নন, কোনো গুন্টার গ্রাস কোনো গাব্রিয়েল মারকেজের। এই বহু-মাত্রিকতা, এই বৈচিত্র্য আর বিস্তার তৃতীয় বিশ্বের সম্পদ। তৃতীয় বিশ্বের সমাজ এবং সংস্কৃতির নিদি-ধ্যাসন তাই বিশেষ অভিনিবেশসাপেক্ষ, তৃতীয় বিশ্বের সাহিত্যবিচার তাই একক পদ্ধতির অনায়ত্ত। সাহিত্যের যদি কোনো জীবনী থাকে, তবে তৃতীয় বিশ্বে লব্ধ অন্য বিশ্বের প্রভাব-অভিঘাত সেই জীবনীর শুধু অন্তর্গত নয় এক অনিবার্য অধ্যায়ও, তাকে বাদ দিয়ে পঠনপাঠন অসম্ভব।

তুলনামূলক সাহিত্যের ভবিষ্যৎ এই তৃতীয় বিশ্বের হাতে। আর ভারতবর্ষ কেবল তৃতীয়বিশ্বভুক্ত নয়, ভারত-বর্ষ বহুভাষিকও এবং বহুভাষিতার একমাত্র সাহিত্যিক ব্যাকরণ তুলনামূলকতা। সুতরাং তুলনামূলক ভারতীয় সাহিত্যের ভবিষ্যৎ প্রশস্ত। কিন্তু তুলনামূলকতার আরো একটা দিক আছে ভারতবর্ষে, তুলনামূলক পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য, কারণ ভারতবর্ষে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যপঠনমাত্রেই অংশত তুলনামূলক। সাহিত্য কোনো নিরালম্ব শূন্যে বসে পাঠ করা যায় না, পাঠকের সংস্কার-ও ইতিহাস-জনিত একটা প্রতিক্রিয়া তাতে থাকবেই, তাকে 'সাড়া' বা 'গ্রহণ' যাই বলি না কেন। সেই 'সাড়া' সেই 'গ্রহণ' পঠন-রীতিরই অঙ্গ। ভারতবর্ষে ইংরেজিপঠনের ইতিহাসে ঔপনিবেশিকতার প্রাবল্যে সেই 'সাড়া'-'গ্রহণে'র চেহারা সর্বত্র স্পষ্ট নয়, কোথাও-কোথাও রীতিমত লুক্কায়িত। ফলে আমরা আমাদের চতুষ্পার্শ্ব বিস্মৃত হয়ে ইংরেজির ক্লাশকে করে তুলছি অকসফোর্ড-কেমব্রিজ, লক্ষ করি নি যে ইংরেজি পড়ে ভারতীয় লেখকদের ইংরেজি লেখনী প্রখর হয়ে উঠছে না, স্ব-স্ব ভাষায় তাঁদের পারদর্শিতাই বাড়ছে। আর যাঁরা অবস্থাবৈগুণ্যে ইংরেজিতেই লিখতে শিখছেন, অন্তত মনে-প্রাণে তাঁরা ভারতীয়। কিন্তু ইংরেজিচর্চার ঈদৃশ মলমাস সদাসর্বদা আসে নি, কিংবা এলেও তার প্রকাশ ঘটেছে অঙ্গুলিমেয় কিছু অনু-কারকের ক্ষেত্রে—ইতিহাসে সত্য উলটোটাই। রবীন্দ্রোত্তর বাঙালি কবিদের শ্রেষ্ঠ পাঁচজনই ছিলেন ইংরেজির ছাত্র এবং তাঁদের চারজন কেউ সারাজীবন কেউ কিয়দ্দিন ইংরেজির অধ্যাপনাও করেছেন। বস্তুত, ইংরেজি কাদের-কাদের মাথায় চড়ে নি সেই লম্বা হিসেবের চাইতে অনেক সহজ হবে ইংরেজি কাদের-কাদের মাথায় চড়েছিল সেই হিসেবে। এবং দীর্ঘ ঔপনিবেশিক ইতিহাসে ভারতীয় বুদ্ধিজীবীরা ইংরেজি কেবল ইংরেজির প্রয়োজনে ব্যবহার করেন নি, ইংরেজির মাধ্যমে বাকি জগৎকেও জেনে-ছিলেন—অর্থাৎ ইংরেজিকে ব্যবহার করেছিলেন খানিকটা মাধ্যমরূপেও। এখনো তা-ই, যদিও ইউরোপীয় অন্য ভাষার চর্চা অনেক বেড়েছে। যা সেদিন পর্যন্ত ছিল 'কেন্দ্রীয় ইংরেজি ভাষা-প্রতিষ্ঠান' তা এখন হয়েছে 'কেন্দ্রীয় ইংরেজি ও বিদেশী ভাষা-প্রতিষ্ঠান'।

কিন্তু 'সাড়া'-'গ্রহণে'র প্রশ্ন বাদ দিলেও, পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের যে স্বনির্ভর পঠনরীতি তাও তো মূলত একক নয়, তুলনামূলক। প্রতীচীতে যদি পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য-সমূহের পাঠ উত্তরোত্তর তুলনামূলক হয়ে ওঠে তাহলে এই দূর ভারতবর্ষে বসে আমরা বিশুদ্ধ থাকি কোন যুক্তিতে? মিল্টনের 'থিঙস্ আনঅ্যাটেমপটেড ইয়েট ইন প্রোজ অর রাইম'-এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আমরা কি কেবল বলবো যে পঙক্তিটি ইতালীয় মহাকবি আরিওস্তোর 'অর্লান্দো ফুরিওজো' কাব্যের প্রথম স্বর্গস্থিত দ্বিতীয় স্তবকের 'cosa nonditta in Prosa ni in rima' পঙক্তিটির অনুবাদ, নাকি সেইসঙ্গে

একথাও বলব যে এই সচেতন, সসম্বন্ধ আহরণ মহাকাব্যসংগত এবং যোগ করব ভার্জিল-দান্তে-আরিওস্তো-তাস্‌সোর উদাহরণ? এবং ধরা যাক কালিদাস-মধুসূদনের উদাহরণও, বিশেষত কালিদাসের 'অথবা কৃত বাগ্‌দ্বারে বংশেঽস্মিন পূর্বসূরিভিঃ/মণৌ বজ্র-সমুৎকীর্ণ সূত্রস্যেবাস্তি মে গতিঃ' পঙ্‌ক্তিদ্বয়? আর মহাকাব্যের পরিধি পেরিয়ে যদি এই রীতির সাধারণ্য নিয়ে প্রশ্ন তুলি তাহলে তো বৈভব ঘটবে উদাহরণের, এলিয়টের সূত্র ধরে বিষ্ণু দের নামও করতে হবে। উপরন্তু, দূরে ভারতবর্ষে বসে পড়ছি বলে কি আমরা পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যসমূহের যোগাযোগের প্রশ্ন এড়িয়ে যাব? ইত্যাকার তুলনামূলকতা ছাড়াও অনুবাদ যেখানে-যেখানে আমাদের মাধ্যম হয়ে উঠেছে সেখানে তুলনামূলকতার আওতায় চলে আসছি আমরা; সংগত কারণেই আসছি কারণ অনুবাদ ব্যাপারটাই তুলনামূলক। আর অনুবাদ নিয়ে সংশয় প্রকাশ করবার অবকাশ আমাদের নেই, কারণ বিদেশী ভাষা আমরা যতই আয়ত্ত করি না কেন, চেতন বা অচেতন অনুবাদ ছাড়া তার পুরোদস্তুর উপভোগ আমাদের আয়াসসাধ্য নয়। আমরা তো জরমানি বা স্পেনে বাস করছি না, বাস করছি বঙ্গদেশে, বাস করছি ভারতবর্ষে, তাহলে কী করে আলেমানি বা হিস্পানি ভাষার ঘটমান-বর্তমান অনুষঙ্গ সব ধরে উঠব আমরা? পক্ষান্তরে, আমাদের নিজস্ব ভাষার যে-পরিমণ্ডল আমাদের চৈতন্যে প্রোথিত হয়ে আছে, তার উৎপাটন কি আদৌ সম্ভব? যে-সংকরতার গর্ব বা প্লানিবোধ আমরা করে থাকি তা আসলে চৈতন্যের উপরিস্তরের। এই যে উইলিয়ম গোলডিঙ নোবেল পুরস্কার পেলেন, তাঁর 'লর্ড অব দা ফ্লাইজ' কি আমরা কোনো ইংরেজ পাঠকের মতো করে হৃদয়ংগম করতে পারি তার পাবলিক স্কুলের সর্বৈব অনুষংগসহ, নাকি কোনো চিরায়ত মিনারে তুলে রাখি তাকে এবং ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে নিজেদের চেতনভূমে টেনে নামাই? আত্মীকরণ না করে কি শেষ পর্যন্ত আমরা কোনো বিদেশী বইতে 'সাড়া' দিতে পারি বা 'গ্রহণ' করতে পারি তাকে?

অতএব তুলনামূলক পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য তুলনামূলক ভারতীয় সাহিত্যের সগোত্র। ভারতবর্ষে ভারতীয় সাহিত্য পড়তে হলে যেমন তুলনামূলক ভারতীয় সাহিত্য ব্যতীত পথ নেই, তেমনি ভারতবর্ষে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য পড়তে হলে তুলনামূলক পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যই প্রকৃষ্ট উপায়। একথা বুঝতে-বুঝতে যাঁদের বয়স পঞ্চাশে পৌঁছে গেল তাঁদের জানাই, সবিনয়ে সসম্ভ্রমে জানাই, ইতিহাস আর বিজ্ঞানকে শেষ পর্যন্ত ঠেকিয়ে রাখা যায় না। ভারতবর্ষে তুলনামূলক সাহিত্য আর একটিমাত্র 'উন্মাদদিগের, উন্মাদনিমিত্ত, উন্মাদকর্তৃক' প্রতিষ্ঠিত বিভাগে সীমাবদ্ধ নেই, উত্তরে দক্ষিণে পশ্চিমে পুবে—হ্যাঁ পুবেও—তার প্রভাব ধীরে-ধীরে ছড়াচ্ছে। গোটের 'বিশ্বসাহিত্যে'র উদারনৈতিক প্রত্যয় যেমন ক্রমেই আমরা অর্জন করে চলেছি তেমনি দিনদিন উপলব্ধি করে উঠছি রবীন্দ্রনাথের 'বিশ্বসাহিত্যে'র নান্দনিক সত্যও। ঐ এব্রাহাম লিংকনীয় সুবাস শিরোধার্য হয়ে থাক তুলনামূলক সাহিত্যের। উন্মাদনা বিনা কোথায় কবে অর্জিত হয়েছে ইতিহাস, করতলগত হয়েছে বিজ্ঞান! জয় রবীন্দ্রনাথ, জয় গোটে!

আমাদের সবার আপন

ঢোলগোবিন্দ-র আত্মদর্শন

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

১

চল্ সরযে, কামাখ্যা যাই

রাত্তিরে খাওয়াদাওয়ার পর ঢোলগোবিন্দরা শুয়ে পড়ে। মা-কাকিমা খাবে সবার শেষে। আঁচানোর পরই তো আর ওদের শুতে গেলে চলে না। ঘর-সংসারের শেষ কাজ কিছু বাকি থেকে যায়। কিছুটা ঝাঁটপাট, দু-চারটে এঁটো বাসন ধুয়ে রাখা, তারপর দরজা জানলা দেওয়া। সব সেরেসুরে আঁচলের চাবি খুলে পান মুখে দিয়ে একটু দম ফেলে নেওয়া। ব্যাস, মা-র দিনের ছুটি।

খিড়কিতে হুড়কো দেওয়ার শব্দে ঢোলগোবিন্দর কাঁচা ঘুম আচমকা ভেঙে গিয়েছিল। বাইরে মা-র গলা।

অবাক হয়ে উঠে পড়ে বাইরের জানলার দিকে ঢোলগোবিন্দ ছুটে গিয়েছিল। আশ্চর্য তো! এত রাত্রে কোথায় যাচ্ছে মা? মা-র সামনে লণ্ঠন নিয়ে আগে-আগে চলেছে একটা লোক। লোকটার কেমন যেন একটা সেপাই-সেপাই খটরমটর ভাব। মা-র সাদা শাড়ির লালপাড়ে নাচতে-নাচতে চলেছে লণ্ঠনের আলো। মাকে সবাই কালো বলে কেন? কী সুন্দর দেখতে রে, মাকে!

এত রাত্রে পাটভাঙা শাড়ি পরে মা কোথায় যায়? ঢোলগোবিন্দর ঠোঁট ফুলে ওঠে।

মা যে কাকভোরে ফিরে আসে, ঘুম ভেঙে গিয়ে ঢোলগোবিন্দর সেটাও দেখা হয়ে যায়। বড়োরা কী করে না করে সব কথা জিগ্যেস করতে নেই। তা ছাড়া মা-র এই না বলে যাওয়াটা তার কাছে একটা অভিমানেরও ব্যাপার বটে।

আরও একটা কথা আছে।

তখন ছিল গরমের ছুটি। দুপুরে মা-র কাছে শুয়েছিল। দাদা মাকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে কেবলি 'আমার মা, আমার মা' বলছিল। ভাবটা যেন ওর একার মা। দাদা ওকে খ্যাপাবার জন্যে বলেছিল, 'ওকে তো তুমি বানের জলে কুড়িয়ে পেয়েছিলে, তাই না মা?' দাদা মা-র ঠোঁট দুটো শক্ত করে ধরে থাকায় মা 'হ্যাঁ' 'না' কিছুই বলতে পারে নি।

ঢোলগোবিন্দ ছিটকে চলে গিয়েছিল বাইরে। কড়া রোদের মধ্যে বসে প্রথমে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে, তারপর ডুকরে-ডুকরে কেঁদেছিল। তাহলে সত্যিই কি মা র পেট থেকে সে হয় নি? বানের জলে ভেসে এসেছিল?

মা-র শরীরের সঙ্গে নিজেকে ওতপ্রোতভাবে সে যে এতদিন মিশিয়ে দিয়ে এসেছিল, সে সবই কি তাহলে ভুল?

ঢোলগোবিন্দ নিজের পেটের নয় বলেই কি মা তার মরা ছোটো ছেলেটার জন্যে আজও থেকে-থেকে দীর্ঘশ্বাস ফেলে? আর সমানে শিবোদাস শিবোদাস করে?

মা বলে, কী পাগলা রে তুই? দাদা মিথ্যে করে বলল আর তাই তুই বিশ্বাস করলি?

রোজ রাত্তিরে মা-র চলে যাওয়া আর ভোরবেলায় ফিরে আসার রহস্য ভেদ হল নতুন দারোগাবাবুর বাড়িতে এক রীতিমত খাট দিয়ে।

নতুন দারোগা বলতে যতীনকাকাবাবু। দুধেআলতার মতো গায়ের রঙ। গায়ে খাঁকির উর্দি আর হাতে বেটন থাকলে গোলগাল সাহেব বলে মনে হত। অবশ্য মুখ না খুললে।

মুখ খুললেই খুলনার বাঙাল বেরিয়ে পড়ত। তাই নিয়ে আমাদের সব কী হাসাহাসি। খাতি নাতি বেলা গেল হুতি পারলাম না।

যতীনকাকাবাবুর চোখদুটো ছিল ডুমো-ডুমো। একটু লালচে। হাসিটা ছিল এত মিশ্টি যে, দারোগা বলে মনেই হত না।

তাঁর এক ছেলে আর এক মেয়ে। ছেলে অনিলদা আমার দাদার চেয়ে সামান্য বড়ো। মেয়ে খুকি আমার চেয়ে সামান্য ছোটো।

বদলি হয়ে আসার পরই কাকিমার হয়েছিল টাই-ফয়েড। সে সময়ে নারসিঙ ছাড়া টাইফয়েডের কোনো চিকিৎসা ছিল না। রাতভর মাথায় বরফ আর হাতপাখার বাতাস। জল আর জলপটি।

একটা মাস যমে-মানুষে টানাটানি। ডাক্তারের মেয়ে বলেই হোক বা স্বভাবজাত কারণেই হোক, রোগীর শুশ্রূষা আর সন্তানপ্রসবের ব্যাপারে মা-র হাতযশের কথা মুখে-মুখে কিভাবে যেন রাষ্ট্র হয়ে গিয়েছিল।

বাবাই বোধহয় কালো বউয়ের এই গুণের কথা বন্ধু-মহলে ঢাক পিটিয়ে বলে থাকবে। নইলে নতুন দারোগাই বা তা জানবে কী করে?

রোগিণীর শিয়রে রাত জাগার ভাবটা মা-র ওপর পড়েছিল শুধু মেয়ে বলে নয়, এ রোগে রাত্তিরটাই সবচেয়ে ভয়ের হয় বলে।

দিনের বেলা পালা করে ডিউটি দিত শহরের পরহিতব্রতী ছোকরার দল। ওদের বেশির ভাগই ছিল শহরের দামালো ছেলে। ওদেরই ছিল যে-কোনো বিপদে মাথা পেতে দেওয়ার হিম্মত। কারো ছাগল চুরি গেলে লোকে ধরেই নিত—ওই আটকুড়োর ব্যাটারাই বৃষ্টির মধ্যে কোনো খালি বাড়িতে ঢুকে কচি পাঁঠার মাংস রেঁধে ফিস্টি করে খেয়েছে। লোকে বলবে কী, মড়া পোড়াতে গেলে ওই ডাকরাদেরই তো ডাকতে হয়। কলেরা রুগীর সেবা করতে আর কোন্ ভালোমানুষের ব্যাটা আছে যে খবর পেলেই ছুটে আসবে! কোথাও বন্যা হলে গলায় হারমোনিয়াম ঝুলিয়ে 'ভিক্ষা দাও গো, নগরবাসী' বলে চাল কাপড় তোলা, শহরে মায়ের দয়া কি ওলাউঠা হলে হৈ হৈ করে নগরসংকীর্তন বার করা—ওরা ছাড়া এসব করবার আর আছে কে?

কী সব ছেলে! বইয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ নেই, পাবলিক লাইব্রেরির পাণ্ডা। শান্তিনিকেতনের ওপর বুড়োরা চটা বলে রাস্তা দিয়ে যেতে-যেতে অনবরত ভুল সুরে রবিঠাকুরের গান গায়। সাইডে সাঁথি কাটে। বড়ো-বড়ো চুল রাখে। ঢোল্লা পানজাবি পরে।

মাস্টারের ছেলে একজন। কী ছেলে, বাবা! একসের গজা বাজি রেখে পরনের কাপড় খুলে বগলদাবা করে দিনেদুপুরে একগাদা লোকের সুমুখে চৌমাথা পেরোয়।

তবে এটাও লক্ষ কোরো, ঢোলগোবিন্দ! ওদের বাবারা কেউই সরকারি চাকুরে নয়। উকিল-মোক্তারের ছেলে সব। বাবাদের সুবাদে হাকিম-হুকুমতকে কেয়ার করে ওদের চলতে হয় না। ওদের বাপদের কথায়-কথায় চাকরি চলে যাওয়ার ভয় নেই।

এরপর এক অবাক কাণ্ড!

দিদির বিয়ের পর মা-র যে কী পাখা গজিয়েছে মা-ই জানে।

টানা একটা মাস মা তো রাতভর হাওয়া। আমাদের যে একটু বলে বুঝিয়ে যাবে তাও নয়। আমরা নাকি বড়ো হয়ে গিয়েছি। দাদা সম্বন্ধে বলে তো বুঝি। দাদা যা ঢ্যাঙা হয়েছে। লম্বা-লম্বা ঠ্যাঙের জন্যে রাস্তায় ছেলেরা দাদাকে ফড়িং বলে ডাকে। কিন্তু আমি?

না-ছোটো না-বড়ো ঢোলগোবিন্দর রাগ হয়। নিশ্চয় সে বানের জলে ভেসে এসেছিল। মা অবশ্য বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে ঢাকার চেষ্টা করে। কিন্তু নিজের মা কখনও তার ছেলেকে রোজ রাত্তিরে একা ফেলে যায়?

তাও শুধু রাতটুকু হলে কথা ছিল।

এবার তো একনাগাড়ে সাতটা দিন আর সাতটা রাত্তির। 'চল্ সরযে, কামাখ্যা যাই' বলে একেবারে হাওয়া।

ঢোলগোবিন্দ ঘুমোচ্ছিল বলে জানতেও পারে নি।

মা-র ফিরে আসাটাই শুধু সে স্বচক্ষে দেখেছিল।

প্রকাণ্ড একটা বাস বাড়ির সামনে এসে থেমে পড়ে হর্ন বাজিয়েছিল।

বাসের জানলায় যাদের মুখ দেখা গেল, তাদের একজনকেও ঢোলগোবিন্দ কস্মিনকালেও দেখে নি।

দু-একজন বাস থেকে নেমে মা-র পোটলাপুটলিগুলো বাড়িতে পেঁাছে দিয়ে গেল। যাবার সময় তারা আমার আর দাদার মাথায় চুলগুলো একটু এলোমেলো করে দিয়ে বলে গেল, 'পরে আসব।'

মা আমাদের জন্যে কী এনেছে দেখার জন্যে তখন আমরা ভেতরে-ভেতরে মরে যাচ্ছি। অন্য কোনো দিকে নজর দেবার মতন মনের অবস্থা ছিল না।

মা-কে দেখে আমরা অবাক।

বরাবরই মা-র ছিল একটু মোটার ধাত। মাত্র এক হপ্তার বাসযাত্রাতেই মা তার শরীরমনের ভার এতটা কমিয়ে দিয়ে এমন ঝরঝরে হয়ে ফিরবে আমরা কেউ ভাবতেই পারি নি। মা-কে এমন হাসিখুশি আগে কখনও দেখা যায় নি।

পরপুরুষের সঙ্গে মা-র হুট করে চলে যাওয়াটা ঠাকুরদা গোড়ায় ভালো চোখে দেখেন নি। কিন্তু বউয়ের যাওয়ার ব্যাপারে খোদ স্বামীই যদি বাধা না দেয়, ছেলের কানে মাঝেমধ্যে লাগানি-ভাঙানি ছাড়া গলগ্রহ বুড়ো শ্বশুর আর কীই বা করতে পারে। হয়কে নয় করবার এক্তিয়ার তো তার নেই। অবিশ্যি বড়ো বউমা না থাকায় কচি মেজো বউমার ওপর কর্তৃত্ব করবার একটু বেশি সুযোগ পাওয়া যাবে, তাতেও সন্দেহ নেই। তা ছাড়া সংসারের ঝক্কি-ঝামেলা থেকে বড়ো বউমাও দুটো দিন ছুটি পেয়ে বাঁচবে। সেইসঙ্গে তীর্থদর্শনের পুন্যি। সেটাও কম কথা নয়।

মা-র চাবির থলো কাকিমার আঁচলে উঠে কাকিমার চলা-বলার ঢঙ কি কিছু পালটে গিয়েছিল? গিন্নির মুকুটও যে কাঁটার সেটা কাকিমার বুঝতে দেরি হয় নি। পুরনো বলে মা তবু সামলে-সুমলে চলতে পারতেন। কিন্তু নতুন বউকে দেখে সংসারের নেই-নেই দাও-দাও যেন চতুর্গুণ বেড়ে গিয়েছিল। একদিন যেতে না যেতেই শ্বশুর শুরু করে দিলেন, 'আহা, এই মাছ বড়ো বউমার হাতে পড়লে! সে মাছের হত আলাদা তার। যোগমায়া, তোমাদের দেশ কোথায় ছিল?'

দাদার আর ঢোলগোবিন্দর এসব ভালো লাগত না। ওইটুকু বউ সংসারটা যে মাথায় তুলে নিয়েছে, এই না কত। তা ছাড়া, কাকিমা থাকায় মাছের বড়ো টুকরোগুলো এখন ওদেরই পাতে পড়ছে।

মা না থাকায় বাবারও পাশাখেলার সময়টা রাতের দিকে একটু বেড়ে-বেড়ে যাচ্ছিল। তারপরও রাত জেগে আবার আইনের বই পড়া।

ফলে, মা ফিরে আসতে বাড়ির সবাই হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। দম চলে গিয়ে ঘড়িটা যেন অচল হয়ে গিয়েছিল। মা এলেন যেন ঘড়িতে দম দেওয়ার চাবি।

এতদিন ছিল বাবার চাকরির গণ্ডি দিয়ে বাঁধা আমাদের জগৎ। সেখানে এমনকি ছোটোদের মধ্যেও আমরা ঠিক সমানে-সমান হতে পারতাম না। হোমরা-চোমরাদের ছেলেরা খেলায় হেরে গিয়ে ঠোঁট ফোলালে ভয়ে কেমন যেন সিঁটিয়ে যেত ঢোলগোবিন্দ। আবার চাপরাশিদের ছেলে হলে কোথায় যেন একটা রেষারেষির ভাব এসে যায়। অকারণে লাগিয়ে দিতে ইচ্ছে করে।

ঢোলগোবিন্দর বাবা যেটা পারেন নি, সেটা ওর মা সম্ভব করলেন। শহরের বন্ধ দরজা একটানে যেন খুলে গেল।

উকিলপাড়া মোক্তারপাড়া। অচেনা সব বাড়ির দেউড়িগুলো হাট হয়ে খুলে যায়।

সারা শহর এখন ঢোলগোবিন্দদের মুঠোয়। সরকারি মহলের হাত পেঁাছয় না সেখানে। কথায় কথায় 'স্যার' নেই, কুর্নিশ নেই।

গণ্ডি কি তাই বলে ঘোচে? একটু বড়ো হয়, এই যা।

নইলে ডাকঘর ছাড়িয়ে দক্ষিণে গলিঘুঁজির মধ্যে

যে বাজার এলাকা, তার পুরোটাই তো ঢোলগোবিন্দর নাগালের বাইরে। ওরই কাছেপিঠে বাবার চাপরাশি খলিলচাচার বাড়ি। সেই সুবাদে দু-চারদিন পর-পর খলিলচাচা মাকে বাজার করে দিয়ে যায়।

সিঙি মাগুর বেলেটাংরার পেট থেকে ঘুনির বড়শি কত যে বার হত বলার নয়। আমাদের কী মজা। একটু সুতো পেলেই কঞ্চির মাথায় বেঁধে দিব্যি ছিপ হয়ে যেত। তারপর ভাঙা নারকোলের মালায় কেঁচো জুটিয়ে সামনের পুকুরে বসে টপাটপ ফেলো আর ধরো।

বাজার থেকে যেসব মাছ আসত, তার মধ্যে একটা ছিল টেপা মাছ। পেটে ফুঁ দিলেই বেলুনের মতন ফুলে উঠত।

ল্যাটামাছ এনে মাকে একদিন খলিলচাচা শিখিয়ে দিয়ে গিয়েছিল কেমন করে সাঁটিবেগুন রাঁধতে হয়।

দিদির বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর উঠোনে তরিতরকারির চাষে আমরা সবাই নেমে পড়েছিলাম।

মা যে আমাদের ওশকাতেন, তার একটা বড়ো কারণ ছিল বৈষয়িক। সংসারে তাতে কম সাশ্রয় হত না। লাউ কুমড়ো লঙ্কা আর নটে। বড়ো একটা কিনতে হত না। মরশুমে হত পেঁয়াজকলি বরবটি শিম শশা বেগুন। কী নয়। টমেটো বা কপি, শালগম বা মুলো হত কি?

ঢোলগোবিন্দর মনে পড়ে না। সাঁতা বলতে কি, মনে পড়ে না তো অনেক কিছুই।

আবগারি কোয়ার্টারগুলোর পেছনে ফটবল খেলার যে মাঠ, তার উত্তরপশ্চিমে হালফ্যাশানের একটা দোতলা বাড়ি উঠেছিল না? ওবাড়ির লোকদের ছিল বড্ড বেশি দেমাক। শহরের বাকি লোকদের নাকি ওরা মানুষ বলেই মনে করত না। খেলতে-খেলতে বাড়িতে ছেলেরা বল ফেললে চব্বর বেধে যেত।

হালে ঢোলগোবিন্দ শুনেছে, ওই বাড়িরই এক ছেলে ইনজিনিয়ারের মোটা মাইনের চাকরির মাথায় ঝাড়ু মেরে আদিবাসী শ্রমিকদের ভাগ্যকে নিজের করে নিয়েছে। বিষয়বৈভব বংশগৌরব পদমর্যাদা—কোনো কিছুই তাকে পেছনে টেনে রাখতে পারে নি।

বেশ হয়েছে! ভালো হয়েছে!

ঢোলগোবিন্দ যেন মনে-মনে ছোট্টটি হয়ে গিয়ে বল-পড়ে-যাওয়া সেই নাকউঁচু বাড়িটার কাছে গিয়ে আঙুল মটকাতে থাকে।

বাজারে বড়ো-বড়ো চিংড়ি উঠলেই যতীনকাকাবাবুর বাড়িতে আমাদের নেমন্তন্ন।

না, মশাই। ওসব ছাড়ানো-ছাড়ানো পাঁশুটে চিংড়ি নয়। আঁশসুদ্ধ ভাজা কালচে লাল। লোহার কড়াইতে ঝোল হবে কালো। তবে না হবে কাকিমার চিংড়ি।

সবেরে-সবেরে যাওয়া চাই। সকালে থানায় যাওয়ার আগে যতীনকাকাবাবু আমাদের সঙ্গে বসে চা খেয়ে নেবেন।

কাকাবাবু চলে যেতে মা-তে কাকিমা-তে রান্নাঘরে বসে খুন্তি নাড়তে-নাড়তে পুরো রাজ্যের গল্প।

আনিলদাকে দিয়ে দাদা তার অঙ্ক কষিয়ে নিচ্ছে। দেখে মনে হয় না দাদার মাথায় কিছু ঢুকছে। দাদা অঙ্কে একেবারে ডাব।

খুকি এই সাতসকালে হারমোনিয়াম নিয়ে বসে প্যাঁ-পো প্যাঁ-পো করে পচা ভাদ্রে 'শারদ প্রাতে আমার রাত পোহাল' গাইছে। ওর সঙ্গেই বা আমার কী। ও তো, মেয়ে।

তা ছাড়া সেজোকাকা উকিলপাড়ায় টহল দিয়ে এখুনি এসে পড়বে। আর তারপর শুরু হয়ে যাবে খুকিকে গান শেখানো। শেখানো না ছাই। একবার হারমোনিয়াম টেনে নিলে সেজোকাকার হাত থেকে তার আর ছাড়ান নেই। একটা গান শেষ করতে না করতে আরেকটা। বাড়া ভাত জুড়িয়ে যাবে তবু উঠবে না।

সেজোকাকা আসার আগেই ঢোলগোবিন্দ খিড়কি দিয়ে কিছুক্ষণের জন্যে কেটে পড়ে।

পাশেই যমুনা নদী। থানার এ ঘাটে চ্যাঁ ভ্যাঁ নেই। কম লোক আসে।

নদীটা চওড়া বটেক।

তবে এ যে কেষ্টঠাকুরের যমুনা নয়, ঢোলগোবিন্দ তা বিলক্ষণ জানে। যমুনা নামের নদী এদেশে আকছার। অত কথা কী, নওগাঁই কি এদেশে শুধু একটা? এ তো শুধু একটা মহকুমা। আসামে তো গোটা একটা জেলারই নাম নওগাঁ। ঢোলগোবিন্দ ভূগোল পড়ে এসব জেনেছে।

নদীর মাঝখান দিয়ে ছপছপ করে নৌকো যায়। কোনোটা জেলেনৌকো, কোনোটা কিস্তি। সরকারি বোট গেলে পাড়ে ঢেউয়ের শোরগোল ওঠে। একটা হাতে রোদ আড়াল করে ঢোলগোবিন্দ জল দেখছিল। বর্ষার ভরভরন্ত নদী। এত জল কোথা থেকে আসে? কোথায় যায়?

উঁকি দিয়ে দেখবে ভেবে হাতটা অজান্তেই নামিয়ে নিয়েছিল।

কী মজা, গাছতলায় বসে রতনকাকা। জলে ফেলা রয়েছে দু-দুটো ছিপ। দেখতে হয়। ঢোলগোবিন্দ পা টিপে-টিপে এগিয়ে গেল।

রতনকাকা। মানে, যতীনকাকাবাবুর ছোটো ভাই। ছুটিতে এসেছে বেড়াতে।

ঢোলগোবিন্দ খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে ছিপ দুটো দেখল। হাতলের কাছে দুম্বো-দুম্বো চাকা। তাতে মুগো সুতো জড়ানো। বাপ রে!

এবার ঢেউয়ের মধ্যে ফাতনাটা নজর করার চেষ্টা করল। একটা হাত কপালের কাছে ঠেকাল। দূরে কাছে, গোড়ায় এক নজরে, তারপর ধরে-ধরে ফাতনাটা ঠাহর করার চেষ্টা করল। শুয়ে না দাঁড়িয়ে? চোখদুটোকে চরকির মতো ঘুরিয়েও যখন ফাতনাটা পাত্তা করতে পারল না, তখন ওর মুখ দিয়ে আপনিই বেরিয়ে এল, 'দুটো ফাতনাই ডুবিয়েছে। টানুন, টানুন।'

রতনকাকা চমকে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখেন ঢোলগোবিন্দ। তারপর হো হো করে হাসতে লাগলেন। 'ফাতনা কোথায় রে, বোকা!'

রতনকাকা বুঝিয়ে দিল নদীতে মাছ ধরতে গেলে ফাতনায় কোনো কাজ হয় না। টান-করে-রাখা সুতোর সরানড়া দেখে মাছ খেল কিনা বুঝতে হয়।

মা ঠিকই বলেন। ঘরের বাইরে পা দিলে কত অজানা জিনিস যে জানা হয়ে যায়। এই যেমন নদীতে ছিপ দিয়ে মাছ ধরার ব্যাপারটা। মার কথা মনে করে ঢোলগোবিন্দ তাই একা-একা প্রায়ই মনে-মনে বিড়বিড় করে—চল্ সরযে, কামাখ্যা যাই।

কথাটা প্রথম সে শুনেছিল অক্ষয়দের বাড়ি।

সেদিনের সন্ধেটার কথা মনে পড়লে আজও ওর গায়ে কাঁটা দেয়। সন্ধের পর এক প্রহরও গড়ায় নি। ছুটতে-ছুটতে এসে একজন খবর দিয়ে গেল কুট্টিদিকে সাপে কেটেছে।

শোনামাত্র আমি আর দাদা একটা লণ্ঠন টেনে নিয়ে দে ছুট। বর্ষায় ওদের বাড়িতে বেশ খানিকটা ঘুরপথে যেতে হত।

সাপ মানেই তো সাক্ষাৎ যম।

আমাদের বুকের মধ্যে তখন ধড়াস-ধড়াস করছে। হেই মা কালী, আমাদের হয়ে মা পাঁচ সিকের পুজো দেবে। কুট্টিদিকে আমাদের বাঁচিয়ে দাও।

দিদির বন্ধু কুট্টিদি। দিদির বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর দিদির জায়গা নিয়েছিল কুট্টিদি। আমাদের কী যে ভালোবাসত।

ছুটতে-ছুটতে চোখে জল এসে যাচ্ছিল। হাতার খুঁটে মুছে নিতে হচ্ছিল। দাদারও তাই।

অক্ষয় আমার সমবয়সী বটে, কিন্তু পড়ত দু ক্লাস ওপরে। ওর ছোটো ভাই অমর ওর সঙ্গেই পড়ত। দুজনেই ছিল আমার বন্ধু। পড়াশুনোয় ভালো অমর আর খেলাধুলোয় চৌকস অক্ষয়। খেলার পর জল খেতে যাওয়া। জলের সঙ্গে একটু বাতাসা কিংবা গুড়ে। কুট্টিদির হাসিটা ছিল আরও মিষ্টি।

দাওয়ার ধারে বসে পা দুলিয়ে-দুলিয়ে কী সুন্দর ছড়া বলত কুট্টিদি—

লেখা জানে না পড়া জানে না
খুদো এক হাকিম।
ঢয়া নাই বাটখারা নাই
আজিমদ্দিন এক দোকানদার।
ঢাল নাই তরোয়াল নাই
শরপা এক যোদ্ধা,
দোয়াত নাই কলম নাই
ভরল্লা এক লেখক।

(লিখতে লিখতে ঢোলগোবিন্দ বিষম খায়। অনেক-দূরে থেকে কুট্টিদির গলায় কেউ কি বলে উঠল : গোবিন্দ, তুই কি এলায় ভরল্লা হচিস্?)

ভেতরে ঢুকে দেখি উঠোনে টাল-লাগা ভিড়।

এক ওঝা এসেছে। শুরু হয়ে গেছে তার বিষঝাড়ার মন্ত্র।

বিষ বিষ ওরে বিষ গোখুরো খোরে।
তোরে রাখিনু আমি কাপড়ে ঢাকিয়ে।
গরড় গরড় তোমার পাহাড়ে যে বাস।
উপরে থাকিয়া তুই নিচে একবার চাস।
ওরে বিষ তোরে বাঁধিলাম মনসার বরে
দমাস থাক তুই আঁচল ভিতরে।

কার আজ্ঞে?
বিষহরি মায়ের আজ্ঞে।
কার আজ্ঞে?
বিষহরি রাইয়ের আজ্ঞে।

কুট্টিদি বেঁচে গিয়েছিল। সে কি ওঝার গুণে?

ছাই!

ঢোলগোবিন্দ এখন জানে মানুষকে মারতে পারে এমন বিষ ধরে খুবই কম সাপ। তেমন সাপ কুট্টিদিকে কামড়ায় নি।

কিন্তু সে যাই হোক। সাপে কামড়ানোর পর কুট্টিদি নিজের মধ্যে কেমন যেন গুটিয়ে গিয়েছিল।

ঢোলগোবিন্দ খুব মনে করার চেষ্টা করল ছেলেবেলার সেই ওঝার কথা।

সরষের কথা কি ছিল তার মন্ত্রে?

থাকতেই পারে না। ওটা তো ছিল সাপের বিষ কাটানোর ব্যাপার। তার সঙ্গে সরষের কী সম্পর্ক? কামাখ্যাই বা আসে কোথা থেকে?

পাঠকের কাছে ঘাট চাও, ঢোলগোবিন্দ। বলো, তোমার স্মৃতিশক্তি মাঝে-মাঝেই তোমাকে ছেড়ে চলে যায়।

স্মৃতি তোমার দুষ্টু স্ত্রী। তাকে বশে রাখার জন্যে এই সেদিন একজন তোমাকে সরষেপড়ার মন্ত্র শিখিয়ে গেছে, সেটাও তুমি বেমালুম ভুলে বসে আছ। বলো তো কী?

চল্ সরষে কামাখ্যা যাই,
আছে সেথায় সাঁওতাল বুড়ি।
তার খোলাতে সরষে ভাজি।
সরষে করে চড়বড়।
স্মৃতির মন করে ধড়ফড়।
কার আজ্ঞে?
কামাখ্যা মায়ের আজ্ঞে।
আর হাঁড়ির ঝি চণ্ডীর আজ্ঞে।

তাই বলে রতনকাকা আমাকে বোকা বলবে?

ব্যাস, ঢোলগোবিন্দ আর সেখানে দাঁড়ায়? হোক না ঢেউ-গড়গড় নদী, আর সেই নদীর পেটে মোচড় দিক গে মাছ।

পাশেই থানা।

থানায় ঢুকবে কি, বারান্দায় ওঠার সিঁড়ি পর্যন্ত এসে ঢোলগোবিন্দ নিচে দাঁড়িয়ে পড়ে।

এ কী মূর্তি যতীনকাকাবাবুর! খাঁকির হাফপ্যান্ট হাফশার্ট পরা ভীষণ রাগী এক দারোগাবাবু দাঁত কিড়মিড় করে নাক দিয়ে অদ্ভুত সব শব্দ বার করে একটা নিরীহ লোককে সমানে কিল চড় ঘুষি মেরে চলেছে। লোকটা পা ধরতে যাচ্ছিল, যতীনকাকাবাবু এবার তাকে সজোরে এক লাথি মারলেন।

ঢোলগোবিন্দ স্ট্যাচু হয়ে দাঁড়িয়ে। যে যতীনকাকাবাবু তাকে অত ভালোবাসতেন, কোলে বসিয়ে বুকে পিঠে হাত বুলিয়ে দেন—তাঁর মধ্যে কী করে এত হিংস্রতা লুকিয়ে থাকে!

দারোগার বেশে যতীনকাকাবাবুকে তার দেখা এই প্রথম আর এই শেষ।

ঢোলগোবিন্দর দিকে হঠাৎ চোখ পড়ে যাওয়ায় যতীন মজুমদার মশাই লোকটাকে ছেড়ে দিয়ে হাজতে পুরে দিতে বলেন।

যতীনকাকাবাবুর ডাক শুনে নিশিপাওয়ার মতো আস্তে-আস্তে ঘরের ভেতরে গিয়ে বসে ঢোলগোবিন্দ এদিক-ওদিক জুল-জুল করে তাকায়। পাশেই বড়ো-বড়ো লোহার শিক-দেওয়া হাজতঘর।

টেবিলের ওপর শোয়ানো মোটা-মোটা রুল আর লিকলিকে বেত। দেয়ালের গায়ে ক্যালেনডারের ওপর পেরেকে ঝোলানো লোহার হাতকড়া। তাকগুলোতে ভরতি ফাইলের স্তূপ।

যতীনকাকাবাবু একটু চুপ করে থেকে নিজেকে সামলে নিয়ে তারপর চাপা গলায় বললেন, 'এখানে কে তোকে আসতে বলেছিল? আর যেন কোনোদিন এর ত্রিসীমানায় তোমাকে না দেখি।' যতীনকাকাবাবুর চোখ-মুখ তখনও লাল।

উঠে পড়ে যখন চলে আসছি, পেছন থেকে ডাকলেন—'শোন্'। তাকিয়ে দেখলাম ঠোঁটের কোণে এবার একটু হাসি। পকেট থেকে মনিব্যাগটা বার করতে-করতে বললেন, 'যাবার সময় মোড়ের দোকানটা থেকে একহাঁড়ি মিষ্টি নিয়ে যাবি। কাকিমাকে বলবি আমার যেতে একটু দেরি হবে।' তারপর পেছনে না ডাকার ভাণ করে বললেন, 'সঙ্গে একজন সেপাই দিচ্ছি, যাবার পথে অমনি জেলখানাটাও একবার ঢুঁক করে দেখে যাস।'

লাফাতে-লাফাতে চলে গেলাম জেলখানার ফটকে।

ঢোলগোবিন্দর মনে-মনে তখন 'কেল্লা মার দিয়া' ভাব। দাদা যে দাদা, ফড়িঙের মতো ঠ্যাং ফেলে সারা শহর যে চষে বেড়ায়, সেও আজ ঢোলগোবিন্দকে হিংসে না করে পারবে না। এক জায়গায় একসঙ্গে এত চোর ডাকাত খুনী দেখতে পাওয়া কম ভাগ্যের কথা!

ফটকের বাইরে গরাদ ধরে ঢোলগোবিন্দ দাঁড়িয়ে থাকে।

ভেতরে খরখর করে বেড়াচ্ছে ডোরাকাটা ফতুয়া আর ইজের পরা কয়েদীর দল। কুয়ো থেকে জল তুলছে কেউ, একদল ঘানি ঘুরিয়ে তেল বার করছে। পায়ে লোহার বেড়ি বাঁধা অবস্থায় একজন ঘুরছে।

ঢোলগোবিন্দ এই ভেবে অবাক হয়ে গেল যে, মাত্র হাত কয়েক তফাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে। অথচ চোর ডাকাত খুনীদের দেখে তার একটুও ভয় করছে না। দেখে মনেই হচ্ছে না যে, কোনো অন্যায় করে ওরা তার ফল ভোগ করছে।

ভারি সুন্দর মুখচোখ একজন কয়েদীর। নিজের মনে একটার পর একটা শানকি মেজে-মেজে সে পরিষ্কার করছিল। কাজ হয়ে যেতে হঠাৎ তার নজরে পড়ে ফটকের ওপাশে ঢোলগোবিন্দ দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে তাকে দেখছে। লোকটা সঙ্গে-সঙ্গে দাঁত বার করে হেসে শরীরের এমন একটা জায়গায় হাত চালিয়ে দিল যে, তা দেখে লজ্জায় কান লাল করে ঢোলগোবিন্দ পালাতে পথ পেল না।

মা-র পায়ের নিচে এখন সরষে।

বাস ভাড়া করে পাড়ার গিন্নিরা চলেছে শহর ছেড়ে শ্মশানকালীর মন্দিরে। মহাদেবপুরের রাস্তায়।

রাস্তার দুপাশে টানা চলে গেছে রেনট্রী গাছ। তারপর এক জায়গায় পাকা রাস্তা ছেড়ে বাস চলল বাঁধ-রাস্তায়। সেখান থেকে নেমে যেখানে পৌঁছুনো গেল, সেখানে বিশাল-বিশাল গাছ আর লতাপাতায় ঢাকা জঙ্গল। সেখানেই ছোট্ট মন্দির। তার সামনে মাটিতে ত্রিশূল পুঁতে বাঘছালের ওপর বসে আছে রক্তাম্বরপরা জটাধারী এক ঘোরদর্শন তান্ত্রিকবাবা। আশপাশে গাঁজার ধোঁয়ায় ব'সে তার কিছু লক্ষ্মীছাড়া সাঙ্গোপাঙ্গ। থেকে থেকে হুঙ্কার উঠছে : 'ব্যোম কালী' ; 'মা তারা ব্রহ্মময়ী'।

জঙ্গলের শুঁড়িপথে সামনেই হি-হি করছে ছোটোমতন একটা শ্মশান। তার পাশ দিয়ে ওটা নদী, না খাল?

দাদার হাত ধরে চুপটি করে এক জায়গায় বসে ছিল ঢোলগোবিন্দ। ভয়ে তার গা ছমছম করছিল। মা কি আর জায়গা পেল না বেড়াতে যাবার?

ঢোলগোবিন্দ তাকিয়ে দেখছে এখানে ওখানে একরাশ মড়ার খুলি ছড়িয়ে রয়েছে। কয়েকটা খোদার-খাসী কুকুর দাঁত খিঁচিয়ে লোকের পায়ে-পায়ে ঘুরছে।

ঠিক একটা ব্লটিং পেপারের মতো চারদিকের সেই ভয়গুলোকে ঢোলগোবিন্দ নিজের মধ্যে যেন শুষে নিয়েছিল।

স্মৃতিকথার চক্করে পড়তে ঢোলগোবিন্দ কোনোদিনই রাজি ছিল না। কেননা নিজের দৌড় সে বিলক্ষণই জানত। যার স্মৃতিশক্তি বলতে নেই, সে কোন্ মুখে স্মৃতিকথা লিখতে বসে?

আমি ঢোলগোবিন্দকে বলি সাধ করে হোক আর ঠেলায় পড়েই হোক, নাচতে যখন নেমেছ তখন আর ঘোমটা রেখে কী হবে? ডালে-ডালে পাতায়-পাতায় ভুল, তা তো একটু হবেই।

যারা বাঘা-বাঘা লোক, তাঁদের হয় না?

এই যেমন মা-র ন্যাওটা ছেলেছোকরাদের সঙ্গে দলবেঁধে ট্রেনে করে পাহাড়পুর দেখতে যাওয়া। আসলে ছুতোনাতায় বাড়ির বার হওয়া। ঠাকুরদা কি সাধ করে বলতেন—বড়ো বউমার কোল খালি বলেই বাড়িতে মন বসে না।

পুরাতত্ত্বটত্ত্ব কিছু নয়। মা তার কীই বা জানে। আমাদেরও ক-অক্ষর গোমাংস।

ঠেঙিয়ে-ঠেঙিয়ে তবু উঠেছিলাম ধ্বংসস্তূপের তিনতলায়।

তখনই একটা ঘটনা ঘটেছিল। পায়ের তলায় একটা জীর্ণ পুরনো ইঁট খসে গিয়েছিল। তাড়াতাড়ি একটা অশথের চারাগাছ মুঠো দিয়ে ধরে ফেলেছিলাম। তারপর কী কষ্টে যে উঠে পড়ে তক্ষুনি নিচে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসেছিলাম, সে আর বলার নয়। আমার সেই পা ফসকে যাওয়ার ব্যাপারটা কেউ জানতে পারে নি। উঁচু তিনতলা থেকে সটান নিচে পড়ে গেলে আমার মাথাটা কি ইঁট-পাথরে লেগে থেঁতলে যেত?

ভয় পাবে বলেই মাকে সেকথা আমি কোনোদিন বলি নি।

বানের জলে ভেসে আসা মা-র কোলের ছেলেটি সেদিন যদি অক্কা পেত, তাহলে কী হত?

বলা যায় না। মা-র কোল আলো করে হয়তো আর কেউ আসত। না, শিবোদাস নয়। ওকে আমি আসতে দিতাম না। ওকে হিংসে করেই সেদিন আমি প্রাণ পণ করে বেঁচে গিয়েছিলাম।

[ক্রমশ

বেনোজল

সমরকুমার লাহিড়ী

এমন কেন হয়! ছোটো বড়ো, সাধারণ অসাধারণ—অনেক কিছুই তো ঘটে যায়, কে তা মনে রাখে! কিন্তু তা নয়, মনের একটা ঠাঁই আছে—যেখানে এরা গোত্রপর্যায়নির্বিশেষে গাদাগাদি হয়ে জমা হয়। হয়তো একটা বিশেষ মুহূর্তে সেই ঘটনাটারই তলব পড়ে—সে সামান্যই হোক আর অসামান্যই হোক, তার ঠিকুজি-কোষ্ঠী একেবারে বিলকুল মিলে যায় মহাকালের ওই বিশেষ ভগ্নাংশটির সঙ্গে।

মনে পড়ছে বর্ষারাতের সেই প্রহরগুলি। হুগলি জেলার সেই অখ্যাত গাঁয়ে, আরও অখ্যাত অতিনগণ্য চাষির দাওয়ায় বসে-থাকা সেই প্রহরগুলি। আজ থেকে পঁচিশ-তিরিশ বছর আগে। মনে পড়ে যায় থেকে-থেকে, মোচড়ও খানিকটা দিয়ে যায় ব্যথাভরা। দু-ফোঁটা চোখের জলে আজও...

সারা রাস্তা জলকাদার সঙ্গে লড়াই করে—বারকয়েক উত্থানপতনের পর—সন্ধে নাগাদ খাঁপুকুর থেকে ফিরে স্নান সেরে বসে আছি দোতলার বারান্দায়। নীচে সিংহী-মশায়ের গলা পাচ্ছি—ডাকতার সিনহার গলা। আমাদের দলেরই একজন ডাক্তার—অ্যাগ্রেসিভ বলে মনে হচ্ছে। বোধ হয়, বোড়ে টিপে কিস্তি মাত করার জয়ধ্বনি। বেচারা কালীবাবু, নেহাত নিরীহ গোছের লোক। কথ্য অকথ্য কতকগুলি কথার ধ্বনি তুলে কী যে বললেন, সিংহমশায়ের গর্জনে তা বেমালুম ডুবে গেল।

নীচের বারান্দায় লণ্ঠনের আলো সামনের গোঁয়ো মেটে রাস্তাটার ওপর কিছুটা পড়েছে। বাকিটুকু পড়ে আছে রাস্তার ওধারে চালাবাড়ির মাটির দেওয়ালের ওপর। তার ওপরে, বারান্দায় নানা ভাবভঙ্গিতে বসে-থাকা দাবাড়ুদের মূর্তিগুলোর চিত্রবিচিত্র রূপায়ণে এক কিম্ভূতকিমাকার ছায়াছবির সৃষ্টি হয়েছে।

সামনের দিকে অনেকটা পর্যন্ত তাকাবার চেষ্টা করলাম—কিচ্ছু দেখা যায় না এক ঘনকালো অন্ধকার ছাড়া। একঘেয়ে টিপটিপ বৃষ্টির ঝরন দমকা বাতাসে গায়ে এসে লাগছে। হাওয়ার ঝাপটে বাঁশগাছগুলো আর্তনাদ করে মাঝে-মাঝে আপত্তি জানাচ্ছে। কী একটা জীব—বোধ হয় বদখেয়ালি কোনো পাখি—হঠাৎ এক-এক সময় গম্ভীর কর্কশ এক-একটা আওয়াজ ছেড়ে, ঝোড়ো বাতাস আর বর্ষার আমেজে ভরা গাঁয়ের আবহাওয়াটাকে

বেশ একটু ভারিক্কি করে তোলার চেষ্টা করছে। বিপত্তি বাধাচ্ছে যত ওই হতচ্ছাড়া ব্যাঙগুলো, তানপুরাতে ঘ্যাঁওড়-ঘ্যাঁওড় সেধে চলেছে একনাগাড়ে। তারি মধ্যে ছন্দপতন করে চলেছে দূর-গাঁ-ফেরত ঘরমুখো কোনো গ্রামীণ ছপাত-ছপাত শব্দ তুলে, রাস্তার জল-কাদা এদিক-ওদিক বেশ খানিকটা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে।

হয়তো কালীবাবু, কখনো বা পিওন রমেশ ক্বচিৎ এই পথচলা, অন্য-গাঁ-ফেরত দু-একজনের সঙ্গে দাবার চাল বন্ধ করে কথার চাল শুরু করে দিচ্ছেন—"শ্রীচরণ, তোমার ছেলেটা আজ ঝড়ে গাছচাপা পড়ার জো হয়েছিল। আমি কোনো গতিকে টানতে-টানতে তোমার বাড়ি দিয়ে এসেছি।" কিংবা রমেশ পিওন মুরুব্বি চালে যেন ধমকে উঠল—"আরে, তোদের যত চিঠি আসে তার ঠিকানাপত্তর কিশশু থাকে না। আমাকে নাকানিচোবানি খেতে হয় তার দিশে ঠিক করতে। তা, ওদিকে জলটা কেমন হল? খু-উ-ব? খালটা ভরে গেছে?"

এই নিয়ে আমি বসে আছি। খাঁপুকুরের পরান কৈবর্তের ছেলেটার মুখ আবছা ভেসে উঠছে চোখের সামনে। দৃষ্টিহারা, সৃষ্টিছাড়া। বিধাতার পরিহাস, না খামখেয়াল। কী সুন্দর ছেলেটি, ছোট্ট দু-তিন বছরের, চাষার ঘরে, সম্পত্তি যার সর্বসাকল্যে খানদুয়েক ঠেকা-দেওয়া চালাঘর, আর আয় বলতে পরের জমিতে বেগার খেটে যা পাওয়া যায়। মনের একটা দিক বললে, কেন, এতে সৃষ্টিকর্তার অনিয়মটা কী পেলে? আর-একটা দিক সঙ্গে-সঙ্গে ঝাঁঝালো উত্তর দিলে, অনিয়ম কেন হতে যাবে! নিয়মের খানিকটা গরমিল শুধু।

—ডাক্তারবাবু, চা খাবেন? হাঁক পাড়লেন কালীবাবু নীচের থেকে।

—পাঠিয়ে দিন। সঙ্গে-সঙ্গে উত্তর পাঠালাম। বর্ষার এই ভর সন্ধেবেলা কে আর অমৃতে অরুচি দেখায়।

হাঁদু চা নিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল।

—ডাক্তারবাবু, মুড়ি আনব?

—না রে, থাক।

—জানেন ডাক্তারবাবু, অনাথ আজ খিচুড়ি রাঁধছে। জানেন, কী বলছে? বলছে অ্যায়সা রাঁধব যে সরকারি ডাক্তারদের মুখ একেবারে বদলে দেব।

কালী ডাক্তার—মানে কালীবাবু—যাঁর নতুন-তৈরি বাড়ি দখল করে বসে আছি আমরা, তাঁরই ন-দশ বছরের ছেলে হাঁদু। তিনি এই অঞ্চলের ভারি ডাক্তার। প্রথম জীবনে বৈদ্যবাটীতে এক নামকরা ডাক্তারের কাছে কাজ করেছেন। আমাদের কাছে অ্যানটি-বায়োটিকস আর সালফা ড্রাগস সম্বন্ধে শিক্ষা নিতেন—ঠিক ছাত্রের মতন।

ডাক্তারবাবুরা এখনো পাশের সাবেকি বাড়িটা ছেড়ে নতুন বাড়িতে উঠে আসেন নি। আর এই ছেলেটি—হাঁদু! মুড়ি খাইয়ে-খাইয়ে পেট আমার ভরিয়ে দিলে। সকালে স্নান সেরে ওপরের বারান্দা থেকে একটা হাঁক পাড়ি—"হাঁদু, মুড়ি নিয়ে আয়।" একথালা মুড়ি চলে আসে। কোথা থেকে অনাথ এসে হাজির হয়। হাতে একছড়া বেশ বড়ো-বড়ো হৃষ্টপুষ্ট নধরকান্তি রম্ভা—মানে, কলা। বলে, "এই নিন, রাখুন দিকি। পয়সা দেবেন পরে।" তারপর মুড়ির থালার দিকে একটেরে একটু তাকিয়ে বলে ওঠে, "এই খাওয়া হচ্ছে? শুধু মুড়ি! আপনাদের নিয়ে আর পারা যাবে না। খালি চেরা-ফোড়াই করতে জানেন আপনারা। দাঁড়ান দেখি, সিনাবাবুর ঘরে ডিম আছে কিনা। যেটা না দেখব—"

তা বেশ আছি আমরা বহাল তবিয়তে—হাঁদুর দেখাশোনায় আর অনাথের দাপটে। বিশেষ মেজাজের লোক অনাথ। বলে, "মুখ্যুসুখ্যু হতে পারি, কিন্তু কিছুটা মগজ রাখি।" একথা স্বীকার না করলেও, রান্নার হাতটা যে তার চমৎকার তা মানতেই হয়। আর এটা-সেটা দিয়ে যায়, পয়সার কেয়ার করে না, জানে খোয়া যাবে না কখনো। মানুষটা আসলে দিলখোলা।

হ্যাঁ, কী বলছিলাম? খিচুড়ির কথা হচ্ছিল। হাঁদুকে বললাম, "তোর আজ নেমন্তন্ন এখানে।" "আমি তো আজ খাবই এখানে" বলে হাঁদু নীচে নেমে গেল।

আমি আবার বসে-বসে আমার ভাবনার ছিন্নসূত্রগুলো জোড়া দিতে শুরু করে দিলাম। আবার সেই খাঁপুকুরের ছেলেটার মুখ সামনে এসে দাঁড়াল। আনন্দের উচ্ছল তরঙ্গ যেন। আছড়ে-আছড়ে ভেঙে-ভেঙে খানখান হয়ে পড়ছে। ওইটুকু ছেলের মধ্যে এতখানি আনন্দ লুকোনো ছিল!

ভাবছি, ওই সুন্দর ছেলেটি, ও কি এই খাঁপুকুরের ছোট্ট গণ্ডির ভেতরেই বাঁধা থাকবে? না, আস্তে-আস্তে বড়ো হয়ে উঠবে। মার আঁচল ধরে চিড়েমুড়ি কি ভাতটা নিয়ে যাবে রোদ্দুরের ভেতর ভর দুপুরবেলায়। বৃষ্টির দিনে মাথায় থাকবে একটা টোকা। তারপর বড়ো হলে—

যা হয় এদের গতানুগতিক জীবনধারায়—মাঠে হাল চষবে। টকটকে রাঙা হাত থেকে যেন রক্ত ফেটে পড়তে থাকবে। না—এ ছেলে শহরের মুখ দেখবে, পালিশকরা শিক্ষা পাবে আর-সকলের সঙ্গে একাসনে। উন্নত ললাট আর স্ফীত বক্ষে, সভ্যতার পতাকা উড়িয়ে সমাজসচেতন জীবনে খানিকটা আলোড়ন তুলবে।

কিন্তু আমার কেন এত মাথাব্যথা! কে একটা চাষা-কৈবর্তের ছেলে—এ উদ্ভট চিন্তা আমায় পেয়ে বসল কেন, এই বাদলার রাতে!

ক্যানেস্তারা টিনের কানে-তালা-দেওয়া আওয়াজে বুঝলাম, রোজকার নিয়মমাফিক অনাথ খেতে যাওয়ার সময় ঘোষণা করছে। এ ও করে চলবে অন্তত একখানা পিঁড়িতে একজন গিয়ে না বসা পর্যন্ত।

সিঁড়ির মাথায় ডাক্তারবাবুর সঙ্গে দেখা। বললেন, "আপনার রতনের জ্বরটা বেঁকে দাঁড়িয়েছে। লোক পাঠিয়েছে। কড়ি কান্নাকাটি করছে। আপনার যাবার কথা বলেছে।"

কোথা থেকে গাঁক-গাঁক করে চেঁচিয়ে উঠল অনাথ—"খামোকা শউরে লোককে রেতবিরেতে জলকাদায় টানা কেন?"

ডাক্তারবাবু এখানকার মাথাওয়ালা। সদালাপী। নরম মেজাজের মানুষ। প্রথমটা থতমত খেয়ে গেলেন। শেষে বললেন, "না, আমিও বলি—আপনি গিয়ে আর কী করবেন। এই সন্ধেতে জলকাদা ঘেঁটে এলেন—"

কড়ির পুরো নাম ফুটকড়ি। কুড়িয়ে-পাওয়া মেয়ে। ঠিক কুড়িয়ে-পাওয়া নয়—ফেলে-যাওয়া রাস্তার ধারে। মানুষের তৈরি 'মহাদুর্ভিক্ষে'র সময়। শিয়ালদার এক লঙ্গরখানার পাশে একে পায় রতন।

সে অনেক কথা।

প্রথম আলাপের দিন। রতন বেনচিতে হাঁটু মুড়ে বসে বিড়িতে টান দিচ্ছে আর গালভরতি ধোঁয়া ছাড়ছে সামনের দিকে। আমি হাঁ করে দেখছি। বয়সটা তার আন্দাজ করার চেষ্টা করছি। লম্বা একটানে বুকভরতি ধোঁয়া নিয়ে, সামনের দিকে ছাড়তে-ছাড়তে আমার দিকে ঘোলাটে চোখে তাকিয়ে প্রশ্ন করলে, "কী বাবু? কী দেখছেন? বুঝতে পেরেছি। আমার বয়েস এই তিন-কুড়িটাক হবে। তার ওপরেও যেতে পারে। তা বাবু, আপনি আসছেন—"

আমি অবাক হয়ে গেলাম। ডাক্তারবাবু পরিচয় করিয়ে দিলেন। রতন একটা বিড়ি বার করে বললে, "আপনারা কলকাতার ভারি ডাক্তার। আপনারা কি আর গেঁয়ো চাষাদের মতো বিড়ি খাবেন?" সেদিন তার হাত থেকে বিড়িটা নিয়েছিলাম, আর একটা টান দিয়ে তার সঙ্গে আলাপে জমে গিয়েছিলাম।

—কী ভাবচেন দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে? যেতেই যদি হয়, চলুন আমিও যাই সঙ্গে।

কী জানি কেন, জলকাদায় আবার রাস্তায় নামবার ইচ্ছে পেয়ে বসল।

খালি পায়েই বেরোচ্ছিলাম। একলাই। সকলে মিলে এক-জোড়া রবারের জুতো কোনোমতে ঠেলেঠুলে গুঁতো মেরে পায়ে ফিট করিয়ে দিলে।

চলেছি। নদীর ধার দিয়ে। সাঁকোটা পেরিয়ে এলাম। মাঝে-মাঝে কটকটে ব্যাঙ খালের ধার থেকে ডাক ছাড়ছে। বাঁশঝাড়গুলো ভূতের মতো অন্ধকার করে রাস্তা জুড়ে বসে আছে। তাদের তলা দিয়ে যাবার সময় টুপটাপ জলের ফোঁটা পড়ছে ছাতার ওপরে। বাতাসের ঝোঁকে তড়বড় করে একসঙ্গে অনেকগুলো যখন পড়ছে, মনে হচ্ছে ছাতা বুঝি ফুটো হয়ে গেল।

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ায় ভেতরে-ভেতরে একটু আড়ষ্ট হয়ে উঠলাম। সেদিন এদিক দিয়ে ফেরবার পথে ডাক্তার সিনহা দেখিয়েছিলেন—"ওই দেখুন, ওই দেখুন!" তাজ্জব বনে গিয়েছিলাম। সরু, সবুজ কঞ্চিগুলোতে জড়িয়ে আছে লিকলিকে সবুজ রঙের সাপ—একটা ডগা থেকে আর-একটা ডগায় লাফিয়ে পড়ছিল। শোনা ছিল—দেখা এই প্রথম। ওখানটায় রাস্তার দুধারের বাঁশঝাড় রাস্তাটাকে একেবারে গিলে ফেলেছে মিশকালো অন্ধকারে। ওই অন্ধকার ফুটো করে অন্য পারে রাস্তাটা বেরুতে পেরেছে কিনা সন্দেহ হতে লাগল। বাতাসের তাড়ায় বাঁশের সরু ডালগুলো যদি নুয়ে পড়ে আর সেই সঙ্গে সরু লিকলিকে সবুজ রঙের জীবগুলি বাঁশের ডগা ছেড়ে ছাতার মাথায় যদি পড়ে—ছাতার ডাঁটি বেয়ে এসে হাতে যদি জড়িয়ে ধরে! একটা কেমন যেন শির-

শিরে ভাব এঁকেবেঁকে শরীরের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত বয়ে গেল।

—আরে, আরে, দেখবেন! চেঁচিয়ে উঠলেন ডাক্তারবাবু। সঙ্গের লোকটি পেছন থেকে ধরে ফেলবার চেষ্টা করলে। ধরা আমি দিয়েছি আর কী—সটান জলকাদার শয়নে শায়িত হলাম। কোথায় থাকল ছাতা, টর্চ। ফাটো-ফাটো জুতোজোড়া ছিটকে বেরিয়ে গেল।

ছাতা টর্চ পাওয়া গেল, পাদুকাযুগল কিন্তু দেখা দিলেন না। ডাক্তারবাবু বলতে লাগলেন, "আপনি যা ভাবেন! অন্যমনস্ক হলে কি আর এ পথে চলা যায়।" ভাবনার আর দোষ কী? উটের পিঠের মতো এই জায়গাটা—মাঝখানে উঁচু আর দুদিকে ঢাল নেমে গেছে। ফীলড্ ডাক্তার, অথচ গামবুট পরে মাঠেঘাটে চরে বেড়াতে পারি না। ভারি গামবুট পরলেই নিজের পায়ে-পায়ে জড়িয়ে, ঘাটেও নহে, পারেও নহে, পপাত একেবারে আল থেকে জলভরা ধানখেতে—বলতে গেলে অনন্ত শয্যায়। সকলে তুলে আলের ওপর খাড়া করে দিত। দু-একটা এইরকম পড়াওঠার পর, দুই খেতের মাঝখানের বাকি আল-রাস্তাটুকু ফীলড্ ওয়ারকাররা কাঁধে করে আমাকে পার করে দিত।

একটা পাটের খেত পেরিয়ে রতনের ঘরে দাওয়ায় যখন পেঁছিলাম, রাত তখন গড়িয়ে প্রায় একটার কাছাকাছি। বৃষ্টিটা আবার চেপে নামল।

জ্বর যে বেঁকে দাঁড়িয়েছে, সেটা ঠিকই। বুকে সর্দি বসেছে—নিউমোনিক কনসলিডেশন।

ডাক্তারবাবু বললেন, "পেনিসিলিন কয়েক লাখ দিয়েছি। জ্বরের যা গতিক, ক্লোরোমাইসিটিন দিতে পারলে—। কিন্তু বুঝছেন তো এদের হালচাল, টাকা পাবে কোথায়? আর তা ছাড়া, সেরে আসছিল বেশ। গ্লুকোজ ইনট্রাভেনাস দিচ্ছিলাম—খুব আস্তে-আস্তে। মুখে দেওয়া যাচ্ছে না—কিছুই খাচ্ছে না। কেসটা কেমন ঠেকছে আপনার কাছে?"

কী যে বলি ভেবে পাচ্ছিলাম না। মুখচোখের চেহারা ভালো নয়। টকসিমিয়ার ছাপ পুরোপুরি। ঝিমিয়ে পড়ে আছে। মাঝে-মাঝে কাঁথার এপাশে ওপাশে দুর্বল হাতে কী যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে—কোনো-কিছু খুঁটে তোলার মতো। আঙুলগুলো কাঁপছে।

ভরসা দিতে পারলাম না। ভোর পর্যন্ত অপেক্ষায় থাকবার একটা ইঙ্গিত আভাসে জানিয়ে রাখলুম। তবু যদি—বলা তো যায় না। একটা বিড়ি ধরিয়ে ডাক্তারবাবুকে একটা কোরামিন পুশ করে দিতে বললাম। বাঁধাধরা নিয়ম। রোগীর বিশেষ কিছু হোক আর না হোক।

ডাক্তারবাবু ইনজেকশন দিতে ক্যামবিসের ব্যাগ নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। কড়ি ঘরের বাইরে এসে বললে, "গোকুল-কাকা, রাতটা তুমি থাকবে?" গোকুল ততক্ষণে দাওয়ার কোনায় তামাক সাজতে বসে গেছে। সে 'হ' বলে একটা সম্মতিসূচক আওয়াজ বার করল।

ডাক্তারবাবু ততক্ষণে ইনজেকশন দিয়ে পাশে এসে বসেছেন। কড়িকে তিনি বললেন রতনের কপালে একটু জলপটি দিতে।

অন্ধকারে কড়ির চেহারাটা ঠাহর করতে পারছিলাম। কুড়িয়ে-পাওয়া, চাষার ঘরের চোদ্দ-পনেরো বছরের মেয়ে কেমন আর হবে। রতনের মুখে গল্প শোনা—একটা আন্দাজ করে নিলাম। তবে তো বিয়ে দেবার বয়স হয়েছে। রতন বেশ রঙ জমিয়ে বলেছিল বটে, "ডাক্তারবাবু, পাশের গাঁয়ের অমত্তোর ছেলে—বেশ মানাবে ওর সঙ্গে। বুঝছেন না, বুড়ো বয়েসে দূরে যেতে কষ্ট হবে। তাই—" পাষাণেও তাহলে রস থাকে, শিকড় গাড়ে সেখানে দু-একটা কচি কিশলয়ও।

—বুঝলেন ডাক্তারবাবু, রতন বলে যেত, কী যে মুশকিলে পড়লাম সেদিন। মেয়েটাকে ফেলে মা-টা বোধ হয় পালিয়েছে কোথাও। কুড়িয়ে-বাড়িয়ে যদি কিছু পায় নিজের পেটের জন্যে। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে কাঁদছিল বাচ্চা। জিগ্যেস করে কিছুই হদিস পেলাম না—দু-তিন বছরের মেয়ে কী-ই বা বলতে পারে, বলুন। কী করি! গোটা দুদিন জল খেয়ে কাটিয়েছি। চাষাভুষো লোক—বেনো জলের মতো আর-সকলের সঙ্গে শহরে এসে পড়েছি। খাবার পাওয়া যাবে। তা—সে কলকাত্তা শহর—দিশে ঠিক করতে পারি কি সেখানে! প্রথমটা ভাবলাম, থাকগে পড়ে, কাঁদুক যত খুশি। শালা, বলে আমায় দেখে কে! বুঝলেন নি—রেতের বেলায় চুপিচুপি গলির ভেতরে ঢুকতাম। কারো দোরের কাছে দাঁড়িয়ে থাকতাম। যদি একটু ফেন দেয়।

হ্যাঁ, রতনের কথায় ভুলে-যাওয়া পেছনের দিনগুলো মনে পড়ে যেত। এক ঝটকায় কয়েক বছর পিছিয়ে যেতাম। সেই সকালবেলা মেসের বাজার করতে যাওয়া, আর ফুটপাতের ওপর যেন থরে-থরে সাজানো এক-দুই-তিন-চার—এইরকম বস্তায় পোরা, মুখগুলো বাঁধা, জন্তু-জানোয়ারের মতন মানুষেরই ছানাপোনা। জানালার কাছেই শুরু হত ঘ্যানর-ঘ্যানর : একটু ফ্যান দে বাবু। তোর পুন্যি হবে। সহ্য করতে পারতাম না, দারোয়ানকে দিয়ে ভাগিয়ে দিতাম।

হ্যাঁ, তারপর রতন বলে যেত, "তারপর বুঝলেন কিনা, ডাক্তারবাবু, ভেবেচিন্তে ঠাহর করে মুচিপাড়ার থানায় গেলাম। ঝক্কিটা যদি ঘাড় থেকে নামিয়ে ফেলতে পারি। তা, মেয়েটা কিছুতেই কি কোঁচার খুঁট ছাড়ে। থানায় আর দেওয়া হল নি বাবু।"

একটু বোধ হয় ঝিমিয়ে পড়েছিলাম। সাড়া দিলাম ডাক্তারবাবুর ডাকে, ঘরের ভেতর থেকে। রতন যেন কেমন-কেমন করছে। ঘরে ঢুকে দেখি, রতন একদৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকিয়ে আছে। ঠিক সামনের দিকে, কি কোন্ দিকে—বলা যায় না। তবে তাকিয়ে আছে এক-দৃষ্টিতে—লক্ষ্যহীনভাবে। বিড়বিড় করে কী যেন বলবার চেষ্টা করছে। কান বাড়িয়ে বোঝবার চেষ্টা করলাম। গোটা দুই কি তিন শব্দ—"নিশ্চিন্দি—নেই—আমার।" শেষের শব্দটা ঠিক ধরতে পারলাম না—'আমার' না 'আর'।

কেরোসিনের ডিবরির আলোয় খানিকটা দেখতে পেলাম কড়িকে। শান্ত মুখে ভাবের পরিবর্তন নেই। আশ্চর্য হয়ে গেলাম। ঘরে এই যে টানাপোড়েন চলছে, ওর ভেতরটায় কি একটুও নাড়া দিচ্ছে না! কে জানে, এ বোধ হয় মহাকালের কাছে ঘা খেয়ে-খেয়ে ব্যথা চেপে রাখার শিক্ষা। নাকি, প্রাণটাই হয়ে গেছে আঘাতে-আঘাতে অনড়, নিশ্চল, ভাববোধহীন।

কিন্তু এ কী! এ যে হুবহু মিলে যাচ্ছে! সেই খাঁপুকুরের ছেলেটার মুখ আর এই মুখ—যেন ভাইবোন। রঙেরই যা তফাত—একজন কালো, আর একজনের কাঁচা সোনার রঙ। দূর, এ কি অনাসৃষ্টি সব ভাবনা। এক ঢঙের মুখ রাস্তাঘাটে অনেক মেলে। কিন্তু এ যে দুটো মুখের মিল একেবারে অবিকল।

ডাক্তারবাবু হাঁ করে একবার আমার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখছেন, একবার রুগীর মুখের দিকে। পালসটা টিপে দেখলাম। এক ঘণ্টা পর-পর কোরামিন, কার্টাজল দিতে বললাম—যা ডাক্তারবাবুর বদান্যতায় দিতে পারা যায়।

কড়ি ঠায় বসে-বসে জলপটি দিয়ে যাচ্ছে। নির্বিকার এক নৈর্ব্যক্তিক নির্বেদ সারা মুখে ওর ছড়িয়ে রয়েছে যেন।

ঝোড়ো বাতাসে দাওয়ার সবটুকু প্রায় ভিজিয়ে গেছে। কোনোরকমে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসলাম। রতনের মতো মনে-মনে বলতে লাগলাম—ঝড়বৃষ্টির জ্বালায় নিশ্চিন্দি নেই আর।

মনে পড়ে গেল আমার এক খুড়োর কথা। সম্পত্তি পেয়েছিলেন কয়েক লাখ টাকার, বাপের একমাত্র ওয়ারিশ হিসেবে। এহেন খুড়ো আমায় একটু শিক্ষেটিক্ষে দেওয়ার জন্যে গল্প ফেঁদেছিলেন, এক দরজির।

—বুঝলি কমল, সগ্গের দোরে গিয়েও ফিরে আসে মানষে। তা নইলে যমদূতকে বলতে গেল কেন দরজিটা যে, টেঁকবার ছুঁচসুতোটা ফেলে এসেছি, ওটা না নিয়ে সগ্গে যাচ্ছি না।

তাৎপর্যটা কী? তাঁর বলবার ধরনে আর ভাষার দৌড়ে সেদিন হয়তো বুঝতে পারি নি। আজ মনে হচ্ছে, খুড়োমশায়ের দরজির স্বর্গের দ্বার থেকে ফিরে আসা আর রতনের বিড়বিড় করে বলা নিশ্চিন্দি নেই আমার—এ দুটোর তাৎপর্য একই।

তাই তো রতন বলত, "বাবু, বেমক্কা আটকা পড়ে গেছি। একটুকুন বেলা থেকে ও আমার পাছ নিয়েছে। সেই যে কোঁচার খুঁট আঁকড়ে ধরেছে, আর ছাড়তে চাইছে না—আমার প্রাণ গেলেও না। সা-বাবুদের খামার থেকে ফেরার পথে ও সঙ্গে থাকত, বাবু। কী করব? ঘরেতে কেউ নেই—দেখবে কে? সঙ্গে করেই নিয়ে যেতাম, সেখানেই আমার সঙ্গে দুপুরে খেত। সা-বাবুদের দয়ার শরীর। তা গিয়ে কী বলছিলুম? পাট-খেতের মাঝ দিয়ে চলতে-চলতে মাঝে-মাঝে পেছন ফিরে দেখতাম—কড়ি নেই! হাঁ করে ইদিক-উদিক করছি, হঠাৎ খেতের ভেতর থেকে সাড়া দিয়ে বেরিয়ে আসে। আর কী আবদেরে মেয়ে বাবু গো! বলে, আমায় পানটুপরি এনে দাও। তখন ভালো করে কথা বলতে পারে না, মুখের আড় ভাঙে নি—কৌড়ি না বলে টুপরি বলত। পেরথম-পেরথম বুঝতে পারতাম না। শেষে একদিন নদীটার

দিকে হাত দেখিয়ে দেয়। কোথায় বাড়ি ছিল কে জানে —পানকৌড়ি দেখেছে আর মনে করে রেখেছে। তার পর থেকে, বুঝলেন কিনা বাবুমশাই, হাঁসই পানটুপরি হয়ে দাঁড়াল। একজোড়া গেল, আর-একজোড়া এল।" বলে অকারণে হা-হা করে খানিকটা হেসে বলত, "বেটির আমার খেয়ালের আর অন্ত নেই, বাবুমশায়।"

কখন দেওয়াল ঘেঁসে সটান শুয়ে পড়েছিলাম। ঘুম ভাঙল ডাক্তারবাবুর ডাকে। পুবের দিকটা একটু-একটু করে ফিকে হতে শুরু করেছে।

ঘরে গিয়ে দেখি, ডাক্তারবাবু ঝুঁকে পড়ে নাড়ী টিপছেন। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "বোধ হয়—"

পুত্তলিকার মতো নিবাত-নিষ্কম্প বসে-থাকা ওই মেয়েটাকে কী করে মুখের ওপর বলা যায়—নাটকের যবনিকাপাত হয়েছে বহুক্ষণ আগে।

খানিকটা ঝোড়ো বাতাস আর বৃষ্টির জলের ঝাপটা ভেজানো নড়বড়ে কবাট খুলে বেমালুম ঘরে ঢুকে পড়ল।

আলো-আঁধারের বিষণ্ণ ছায়ায় ঘরের ওই দুটি মুখ ঠিক যেন পাথরে খোদাই করা। একটি সত্যি-সত্যিই পাষাণ হয়ে গেছে। আর-একটির শরীরের ভিতর প্রাণশক্তির ক্রিয়াপ্রক্রিয়া ঠিকই বয়ে চলেছে, মুখে কিন্তু তার নেই কোনো ছাপ।

ডাক্তারবাবুকে বললাম, "ওকে বলুন, জলপটি দেবার আর দরকার নেই। তারপর বাইরে ডেকে নিয়ে যান।" খেই ধরিয়ে দিয়ে বাইরে এসে দাঁড়ালাম।

ফিরে তাকালাম। শ্রাবণের ধারা এই বুঝি নামল। অঝোরে আগল ভেঙে গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে অশ্রুধারা। কিন্তু তখনো কোনো শব্দ নেই মুখে কড়ির—খুঁটিতে ঠেস দিয়ে বসে আছে। বর্ষণ ক্ষান্ত হয়েছে একদিকে, আর-একদিকে শুরু হয়েছে অবিশ্রান্ত। প্রথম দিকে আছে মিল, শেষের দিকে অমিল।

সেদিন সকালে ঘুম ভেঙে নিজেকে একলা দেখে, লঙ্গরখানার পাশে পথে দাঁড়িয়ে কাঁদছিল কড়ি। আজও কাঁদছে। ফিরে পাবার প্রত্যাশা ছিল সেদিন, ফিরেও পেয়েছিল একটা অবলম্বন। আজ অবলম্বন হারিয়ে, আবার সেই বেনো জলের ডাক শুনতে পাচ্ছে কড়ি—ন-দশ বছর আগের ভুলে-যাওয়া মহাদুর্ভিক্ষ, ফসকে-যাওয়া মুখের গ্রাসের দিকে আবার যেন অলক্ষ্যে হাত বাড়াচ্ছে।

উঠোনে রতনের শরীর শোয়ানো রয়েছে। গোকুল তার তদারকিতে ব্যস্ত। পানটুপরি দুটো কোথায় ছিল, কে জানে। উঠোনের কোনায় কড়ির হাতের তৈরি-করা বাসা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে—থপথপ করে ঘুরে বেড়াচ্ছে উঠোনময়। একবার রতনের কাছে গেল, প্যাঁক-প্যাঁক করে দু-একটা শব্দ করল, কোনো উত্তর পেল না। রতনের পায়ে গিয়ে গোটা কয়েক ঠোক্কর মারল। ঘুরেফিরে কড়ির কাছে গিয়ে খুব খানিকটা কলরব শুরু করে দিলে—রোজকার সকালের প্রাপ্যটুকু আজ তারা পাচ্ছে না কেন!

আকাশের গা বেয়ে পাটখেতের প্রান্তে আগুনের গোলকটা আরও খানিকটা ওপরে উঠেছে, আরও খানিকটা রক্তবর্ণ।

ডাক্তারবাবু ডাক দিলেন, "চলুন এবার। আপনার অসুখ না করে।"

—হ্যাঁ, যাই।

কড়ির গালের ওপরে চোখের জলের বড়ো-বড়ো দুটো ফোঁটা। সকালবেলার রোদ্দুর এসে পড়েছে। মুক্তোর মতো ঝলমল করছে বড়ো-বড়ো ফোঁটা দুটো। যেন, সম্বলহীন অসহায় নির্মম ভবিষ্যতের প্রতীক।

আস্তে-আস্তে খুঁটি ধরে নামলাম। পরিচ্ছন্ন সকাল।

পথে পা বাড়ালাম।

গ্রন্থসমালোচনা

ভারতীয় 'নেশন', গণতন্ত্র আর সংহতির সমস্যা

India : The Siege Within, Challenges to a Nation's Unity. M. J. Akbar. Penguin Books, 1985. £ 2.95

'নেশন' এবং 'ন্যাশন্যালিজম' পশ্চিম থেকে আমদানি করা ধারণা। উনিশ শতকে নগরবাসী ইংরেজিশিক্ষিত কিছু হিন্দু এই ধারণাযুগলের প্রতি আকৃষ্ট হন। কিন্তু নেশন ব্যাপারটি বোঝাবার জন্য যেসব তৎসম শব্দ তাঁরা ব্যবহার করেন সাধারণ প্রয়োগে নেশন-ধারণার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক খুব দুর্বল। বাঙলার কথাই ধরা যাক। ভারত-বিভাগের আগে আমরা অনেকেই পুজোর ছুটিতে 'দেশ'-এ যেতাম। সে 'দেশ' ছিল যেমন প্রত্যক্ষ তেমনই স্মৃতি- ও -স্বপ্নবিজড়িত। জন্মের সূত্রে, কয়েক প্রজন্ম ধরে পূর্বপুরুষদের বসবাসের সূত্রে, সেখানকার অন্য অধিবাসীদের সঙ্গে আত্মীয়তা এবং বিবিধ সম্পর্কের সূত্রে সেই 'দেশ'-এর টান ছিল প্রবল। অপর পক্ষে, নব্য রাজনীতির অনুষঙ্গে যাকে 'দেশ' বলা হল, তার রূপ যেমন অপ্রত্যক্ষ, তার তাৎপর্য তেমনই অস্পষ্ট। আসমুদ্রহিমাচল ভারতবর্ষের সঙ্গে সাধারণ মানুষের কথা দূরে থাক, শিক্ষিতজনের বড়ো একটা পরিচয় ছিল না। যেটুকু অল্পস্বল্প পরিচয় ছিল তার ধরনটা ঐক্যের পরিপন্থী। স্বাদেশিকতার প্রবক্তাদের মধ্যেও অনেকের কাছে পূর্ববঙ্গীয়রা ছিলেন 'বাঙাল', বিহারীরা 'খোট্টা', মুসলমানেরা 'নেড়ে'। 'দেশ' বলতে কলকেতিয়া দেশপ্রেমীরা যে আসলে উত্তর কলকাতা, বড়ো জোর পশ্চিমবঙ্গ বোঝেন, ভারত-নামক স্বদেশ নিয়ে তাঁদের বাগাড়ম্বরে সেই সংকীর্ণ সত্য ঢাকা পড়ত না।

নেশন অর্থে যে শব্দটিকে উনিশ শতক থেকে বাঙলায় চালু করার চেষ্টা শুরু হয় সেটিরও পরম্পরাগত এবং ব্যাপকপ্রয়োগসমর্থিত তাৎপর্য একেবারেই ভিন্ন। হিন্দুরা বহুকাল ধরে 'জাতি' শব্দের দ্বারা বর্ণবিভাগের অন্তর্গত সামাজিক উপবিভাগকেই বুঝিয়েছেন। 'জাতি'-র সংক্ষেপিত রূপ 'জাত'। 'জাত মারা', 'জাতে ওঠা', 'জাতভাই', 'জাতব্যাবসা'—এসব নিত্যপরিচিত প্রয়োগের পাশে 'ভারতীয় জাতি' নিতান্তই আড়ষ্ট, উপর থেকে চাপানো। এই উপমহাদেশের সাহিত্যে ভারতীয় জাতির কথা উনিশ শতকের আগে অনুল্লেখিত, কারণ ঐ ধারণাটি ইংরেজ শাসন এবং ইংরেজি শিক্ষার অন্যতম ফল।

নেশন ব্যাপারটি যে হিন্দু সমাজচিন্তা এবং ঐতিহ্যের অংশ নয়, বঙ্কিমের রচনায় সে কথা খুব স্পষ্টভাবেই বিঘোষিত। তিনি জানতেন, এই আদর্শটি ইয়োরোপ থেকে এসেছে এবং এটিকে প্রভাবশালী করতে হলে একদিকে যেমন সর্বভারতীয় সামূহিক সত্তার প্রতি আনুগত্যকে পরম্পরাশ্রয়ী জাতিপঙ্‌ক্তির প্রতি আনুগত্যের উপরে স্থান দিতে হবে, অন্য দিকে তেমনই অন্য কোনো সামূহিক সত্তার প্রতি প্রবল বিদ্বেষ ছাড়া এই আনুগত্যকে পুষ্ট করা, এমনকি টিঁকিয়ে রাখাও কঠিন হবে। ন্যাশন্যালিজম-এর প্রয়োজনীয়তা এবং তার অন্তর্নিহিত বিপদ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র অবহিত ছিলেন। অপর পক্ষে, রবীন্দ্রনাথ প্রবলভাবেই ন্যাশন্যালিজম-এর বিরোধী। 'ভূগোল-প্রতিমার পাণ্ডাদের' প্রতি তাঁর প্রগাঢ় বিতৃষ্ণা ; তাঁর বিচারে সামষ্টিক স্বার্থপরতা-র অপর নাম ন্যাশন্যালিজম ; এরি নেশায় ব্যক্তির বিবেক আচ্ছন্ন হয়, সর্বমানবীয় ঐক্যবোধ ব্যাহত হয়ে রাষ্ট্রের সঙ্গে রাষ্ট্রের যুদ্ধপ্রবণতা বাড়ে, জাতীয় ঐক্যের অজুহাতে শক্তির কেন্দ্রায়ন ঘটে।

বঙ্কিমের সতর্কবাণী এবং রবীন্দ্রনাথের বিরোধিতা সত্ত্বেও বিশ শতকের সূচনা থেকে হিন্দু শিক্ষিত মনে পশ্চিমী অর্থে স্বদেশপ্রেম এবং স্বাজাতিকতার আদর্শ প্রভাব বিস্তার করে। বিদেশী বিজেতারা ভারত উপমহাদেশকে উনিশ শতকে একটি সুপরিকল্পিত আর শক্তিশালী শাসনব্যবস্থার অধীনে আনেন ; পোস্ট, টেলিগ্রাফ, রেলওয়ে, এবং প্রযুক্তির নানাবিধ প্রয়োগের সাহায্যে তাঁরা এই রাষ্ট্রব্যবস্থাকে অনেকখানি নির্ভরযোগ্য করে তোলেন ; ইংরেজিশিক্ষার প্রসারের ভিতর দিয়ে ভারতবর্ষে একটি বিবর্ধমান গোষ্ঠী গড়ে ওঠে যার সদস্যরা পশ্চিমী আদলে ভারতবর্ষকে একটি দেশ এবং ভারতীয়দের একটি জাতি হিসেবে দেখতে আগ্রহী। এঁদেরই ভিতরে কিছু ব্যক্তি সমবেত হয়ে ১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথম পঁয়ত্রিশ বছর কংগ্রেসের সদস্য-সংখ্যা ছিল নিতান্ত সীমাবদ্ধ ; কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের পর দেশব্যাপী বিক্ষোভ এবং গান্ধীর নেতৃত্বে সত্যাগ্রহ আন্দোলন কংগ্রেসের জনসমর্থন অনেকখানি বাড়িয়ে দেয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে ১৯৩৭-এর প্রাদেশিক নির্বাচনে কংগ্রেস প্রমাণ দেয় যে ব্রিটিশশাসিত ভারতের সর্বত্র না হলেও বেশিরভাগ অঞ্চলে কংগ্রেসের প্রভাব-প্রতিপত্তি ব্যাপক এবং সুপ্রতিষ্ঠিত। ভারতবর্ষ যদি একটি দেশ এবং ভারতীয়রা যদি একটি জাতি হয়, তবে

সেই দেশজাতির ঐক্যের প্রধান রাজনৈতিক প্রকাশ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস।

কিন্তু দশ বছরের ভিতরেই দেখা গেল "যদি" যদিই, তার উপরে নির্ভর করা চলে না। উনিশ শতকের শেষ দিক থেকেই কোনো কোনো মুসলমান নেতা ঘোষণা করে আসছিলেন যে পশ্চিমী অর্থে ভারতবর্ষ একটি জাতি বা নেশন নয়, এখানে অনেকগুলি নেশন ইংরেজ-শাসনাধীনে একত্রিত হয়েছে, তাদের জাতিগত স্বাতন্ত্র্যের ধারক তাদের বিশেষ-বিশেষ ধর্মবিশ্বাস, ভাষা, সংস্কৃতি। স্যার সৈয়দ আহমদ এই চিন্তার অন্যতম প্রধান প্রবক্তা, এবং তাঁকে মোটেই পশ্চাদ্‌মুখী ভাবুক বলা চলে না। তবে এই শতাব্দীর ত্রিশের দশকের আগে এই চিন্তা এদেশের মুসলমান শিক্ষিতদের মধ্যেও খুব প্রভাব ফেলে নি। অপরপক্ষে যেমন বিশের দশকে একই সঙ্গে কংগ্রেসের জনসমর্থন বাড়ে এবং কংগ্রেসের নেতার পদে গান্ধী অধিষ্ঠিত হন, তেমনই চল্লিশের দশকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে মুসলীম লীগ মুসলমান সমাজে ব্যাপক প্রতিষ্ঠা পায় এবং জিন্নাহ্‌ কাইদ্‌-ই-আজম হিসেবে স্বীকৃতি অর্জন করেন। শিক্ষিত মুসলমানদের একটা অংশ কংগ্রেসের সমর্থক হলেও ১৯৪৬-এর নির্বাচনে দেখা গেল এই উপমহাদেশের মুসলমান সমাজের প্রধান অংশ লীগ এবং জিন্নাহ্‌র নেতৃত্বে বিশ্বাসী। ভারত উপমহাদেশ থেকে বিদেশী শাসকরা বিদায় নিল ; কিন্তু স্বাধীনতার সঙ্গে এল দেশবিভাগ। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করে জিন্নাহ্‌ দেখালেন ভারতবর্ষ একজাতি, একদেশ নয়। আবার পরে যখন পাকিস্তান দু-টুকরো হয়ে গেল তখন সন্দেহ রইল না পাকিস্তানও একজাতি, একদেশ নয় ; স্রেফ ধর্মের ভিত্তিতে এযুগে রাষ্ট্রীয় ঐক্য বজায় রাখা কঠিন, হয়তো-বা অসম্ভব।

বর্তমানে যাঁরা ভারতের জাতীয় সংহতির কথা বলেন তাঁরা আর সমগ্রভাবে এই উপমহাদেশের জাতিগত ঐক্যের উল্লেখ করেন না। দেশবিভাগের পর যে অংশ ইনডিয়া তথা ভারত নামে পরিচিত, সেটিকেই তাঁরা একটি নেশন-রূপে বিবেচনা করেন। নেশন এবং রাষ্ট্র যে সমার্থক নয়, একই আমেল বা সমামেল রাষ্ট্রব্যবস্থায় যে অনেকগুলি নেশন বা জাতি পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে, একই নেশন বা জাতি যে অবস্থাচক্রে দুটি সার্বভৌম রাষ্ট্রে বিভক্ত হতে পারে, রাষ্ট্রিক সার্বভৌমত্ব অর্জন করবার আগেও যে একটি জাতির অস্তিত্ব সম্ভবপর—এসব অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক কিন্তু কিছুটা তত্ত্বাভিমুখী বিচার এদেশের জাতিপ্রেমীদের বিশেষ আকৃষ্ট করেনা। তাঁদের প্রধান চিন্তা ইনডিয়া তথা ভারতের রাষ্ট্রিক সংহতি কিভাবে দৃঢ় করা যায়। এ বিষয়ে বিশেষ করে সরকারি উদ্বেগ সম্প্রতিকালে প্রবলতর হয়েছে, কারণ কাশ্মীরে, আসামে, নাগাল্যানডে এবং গত কয়েক বছর ধরে পানজাবে কেন্দ্রবিরোধী মনোভাব মোটেই প্রচ্ছন্ন নেই। যাঁরা ভারত তথা ইনডিয়ার 'জাতিগত ঐক্যে' বিশ্বাসী, এবং একই সঙ্গে মনে করেন যে ঐ ঐক্যকে দৃঢ়তর করবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের শক্তিবৃদ্ধি জরুরি, তাঁদের দৃষ্টিতে কেন্দ্রবিরোধিতার অর্থ তথাকথিত বিচ্ছিন্নতাবাদে'র সমর্থন, এবং সে সমর্থন দেশদ্রোহের সমার্থক।

ইনডিয়া তথা ভারতের জাতীয় সংহতি কিভাবে সম্প্রতিকালে ভিতর থেকে আক্রান্ত, সাংবাদিক এম. জে. আকবর তাঁর বইটিতে তার কিছুটা বিশদ বিবরণ আর ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয় নেই, কিন্তু তাঁর বইটির লেখকপরিচিতি থেকে জানা গেল যে তাঁর মাতামহ ছিলেন কাশ্মীরি মুসলমান ; অমৃতসরে শালের ব্যবসা করতে আসেন ; ১৯৪৭-এর দেশবিভাগের পর সর্বস্বান্ত হয়ে পাকিস্তানে আশ্রয় নেন। তাঁর পিতামহ ছিলেন বিহারের গরিব হিন্দু ; তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন, বিহারের গ্রাম থেকে কলকাতায় চলে আসেন, কংগ্রেস-সমর্থক হিসেবে দেশবিভাগের পর ভারতেই থেকে যান। আকবর কলকাতাতেই পড়াশুনো করেছেন ; এবং বর্তমানে আনন্দবাজার প্রতিষ্ঠানের ইংরেজি দৈনিক 'দি টেলিগ্রাফ'-এর সম্পাদক হিসেবে তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ ভারতীয় জাতিত্বের সমস্যা তাঁর কাছে স্রেফ কেতাবি ব্যাপার নয়, এটি তাঁর আত্মপরিচয়ে ওতপ্রোত।

আকবর ভারত-উপমহাদেশের জাতীয় ঐক্যে, লোকায়ত গণতন্ত্রের আদর্শে এবং ইনডিয়া তথা ভারত-রাষ্ট্রে লোকায়ত গণতন্ত্রের সক্রিয় অস্তিত্বে আস্থাশীল। তাঁর বিবরণ তিন পর্বে বিভক্ত। প্রথম পর্বে (পৃ ১৭-৯৯) তিনি মুখ্যত কিভাবে পাকিস্তানের উদ্ভব হল তার বিবরণ দিয়েছেন। তাঁর মতে, ভাষা-ধর্ম পোশাক খাবারদাবারের পার্থক্য সত্ত্বেও আগাগোড়াই ভারতবর্ষে একটি ভৌগোলিক এবং সাংস্কৃতিক একতাবোধ ছিল। কিন্তু এই সুপ্রাচীন ঐক্যবোধের প্রমাণ এবং নির্ণায়ক যে ঠিক কী, তাঁর বইটিতে তার কোনো নির্দেশ মেলে না। তাঁর যুক্তি অনুসারে, এদেশে যারা ধর্মের ভিত্তিতে রাষ্ট্র গড়ার তত্ত্বে বিশ্বাসী তারাই এই ঐক্যকে ভিতর থেকে ধ্বংস করতে উদ্যোগী হয়। উলেমাদের দ্বারা পরিচালিত মুসলিম সম্প্রদায় ক্রমে নিজেদের স্বতন্ত্র সামূহিক অস্তিত্বকে প্রাধান্য দিতে শুরু করে। স্বার্থসিদ্ধির জন্য মুসলমান জমিদার-শ্রেণী উলেমাদের পৃষ্ঠপোষক হয়। ইংরেজ শাসকদের সহায়তায় জিন্নাহ্‌ ভারতীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের মুখ্য প্রতিনিধি ও নেতা হিসেবে স্বীকৃতি পান ; এবং কংগ্রেস-শাসন সম্পর্কে মুসলমানদের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করে মোল্লা-জমিদারদের সমর্থনে তিনি শেষ পর্যন্ত দেশবিভাগে এবং পাকিস্তান-প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হন। পাকিস্তান সৃষ্টির মূলে যথার্থ জাতীয়তাবাদী প্রেরণা ছিল না ; সেখানে তাই রাষ্ট্র নির্ভর করছে সামরিক স্বৈরতন্ত্র এবং মোল্লাশক্তির উপরে। পাকিস্তানের এক অংশ ভেঙে স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়েছে ; অন্য অঞ্চলগুলিতেও গণ-বিক্ষোভের শেষ নেই।

একমাত্র মোল্লাশক্তিই ভারতবর্ষে বিচ্ছিন্নতার প্রচারক নয়। উত্তর ভারতের, বিশেষ করে হিন্দি-ভাষীদের, প্রাধান্যের বিরুদ্ধে দক্ষিণ ভারতেও প্রবল আন্দোলন গড়ে ওঠে। আকবর তাঁর বইয়ের প্রথম পর্বের শেষ অংশে দ্রাবিড় মুন্নেত্র কাঝগম-এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন। ডি. এম. কে. প্রথম দিকে স্বতন্ত্র দ্রাবিড়নাডু দাবি করেছিল ; পরে চীন-ভারত-আক্রমণের প্রতিক্রিয়ায় এই দাবি তারা ত্যাগ করে ; এবং যখন নির্বাচনের ভিত্তিতে ডি.-এম. কে. তামিলনাডুতে সরকার গড়তে সক্ষম হয় তখন ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হবার কথা চাপা পড়ে যায়। আবার ভাষার ভিত্তিতে রাষ্ট্রের পুনর্গঠনের যে দাবি তেলুগুরা তুলেছিল সেটি প্রথমে সংকট সৃষ্টি করলেও পরে অন্ধ্রপ্রদেশ গঠনের ফলে সে সংকটের নিরসন হয়। আকবরের যুক্তি অনুসারে বিচ্ছিন্নতাবাদের শক্তি স্বাধীন ভারতে সক্রিয় হওয়া সত্ত্বেও সেটির মোকাবিলা করবার সামর্থ্য ভারতীয় গণতন্ত্রে বিদ্যমান।

বইটির দ্বিতীয় পর্বের (পৃ ১০৩-২০৯) বিষয় পানজাব সংকট এবং খালিস্তান দাবি। দিল্লীর সঙ্গে শিখদের বিরোধ নতুন ব্যাপার নয়। মোগল রাজশক্তির সঙ্গে সংঘর্ষের অভিজ্ঞতা ভক্তিমার্গী শিখধর্মকে সুসংগঠিত তথা অস্ত্রধারী খালসার আদর্শের দিকে ঠেলে দেয়। খালসার কাজ ভিতরের আর বাইরের আক্রমণ থেকে শিখধর্ম এবং শিখসমাজের পবিত্রতা এবং স্বাতন্ত্র্যকে রক্ষা করা, তার জন্য স্বতন্ত্র শিখরাষ্ট্র নির্মাণ করা যেখানে 'রাজ করেগা খালসা'। মোগল সাম্রাজ্যের পতনের পর আফগানদের যুদ্ধে হারিয়ে এবং বহুবিভক্ত শিখসম্প্রদায়কে একত্রিত করে রণজিৎ সিংহ তাঁর বিস্তৃত শিখ-রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু সে রাজ্য তাঁর মৃত্যুর পরেই দ্রুত ধ্বংস হয়ে যায়। ইসলামের শক্তির সঙ্গে লড়াই করে শিখরা নিজেদের সামূহিক স্বাতন্ত্র্য অর্জন করেছিল ; কিন্তু ইংরেজ আমলে শিখধর্ম ভিতর থেকেই জীর্ণ হতে শুরু করে। নতুন শাসকদের সহযোগী হওয়ার ফলে শিখদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হয় ; তারা সংখ্যায় বাড়ে ; কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে তাদের ধর্মীয় বিশিষ্ট লক্ষণগুলিও ক্ষীণ হতে থাকে। হিন্দুদের প্রভাবে তাদের ভিতরে জাতিভেদপ্রথা প্রকট হয়। গুরুদ্বারগুলি নানাবিধ অপচারের কেন্দ্র হয়ে ওঠে। এই অধঃপতন রোধ করবার জন্য শিখদের ভিতরে সংস্কার-আন্দোলন শুরু হয় ; অন্যদিকে, জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের পর স্বদেশী মনোভাব আর ইংরেজ-বিদ্বেষ পানজাবে ছড়িয়ে পড়ে। দুশ্চরিত্র মহান্তদের কবজা থেকে গুরুদ্বারগুলিকে উদ্ধার করার জন্য এবং শিখদের নতুন করে সংগঠিত করবার উদ্দেশ্যে অকালি দল প্রতিষ্ঠিত হয়। আকবর মনে করেন, এই উদ্যোগের প্রধান ফল পানজাবে শিখ এবং হিন্দুদের ভিতরে বিভেদবৃদ্ধি (পৃ ১৪১)। হিন্দু নেতারা মনে করতেন, শিখধর্ম হিন্দুধর্মের একটি শাখামাত্র ; তাঁরা শিখদের স্বতন্ত্র সামূহিক অস্তিত্ব স্বীকার করতেন না। অপর পক্ষে, অকালি নেতাদের দাবি তাঁরা কোনোক্রমেই হিন্দু নন ; তাঁদের ধর্ম আর সমাজসংগঠন সম্পূর্ণভাবে ভিন্ন ; অকালিরাই শুধু শিখসম্প্রদায়কে পরিচালনার যথার্থ অধিকারী।

উনিশ শতকের শেষ দিকে শিখদের যে পতন দেখা দিয়েছিল অকালি নেতাদের চেষ্টায় বিশ শতকের গোড়ায় তা বন্ধ হয়। ১৮৯১-এর আদমশুমারে পানজাবে হিন্দুরা ছিল মোট জনসংখ্যার শতকরা ৪৪.০৮ ভাগ ; শিখরা ৮.০৯%। ১৯৪১-এ এই অবস্থা বদলে দাঁড়ায় হিন্দু ২৯.৭৯% আর শিখ ১৪.৬২% কিন্তু শিখদের সাম্প্রদায়িক স্বাতন্ত্র্যবোধ যত বাড়ে ততই তারা তাদের সামূহিক অস্তিত্বের সমস্যা নিয়ে আলোড়িত হতে থাকে। অখণ্ড ভারতবর্ষে তারা জনসমষ্টির শতকরা একভাগের মতো ; এমনকি অখণ্ড পানজাবেও শতকরা চোদ্দভাগের অর্থ অনতিক্রম্যভাবে ঊনজন হয়ে থাকা। দেশবিভাগের ফলে শিখদের অর্ধেক পড়ে যায় পাকিস্তানে, অর্ধেক ভারতে। সাম্প্রদায়িক হত্যাকাণ্ডে অসংখ্য শিখ মারা যায় ; প্রায় বিশ লক্ষ উদ্বাস্তু শিখ ঘরবাড়ি, খেত-খামার, ব্যাবসাচাকরি ছেড়ে পাকিস্তান থেকে ভারতবর্ষে চলে আসে। কিন্তু তাদের সামূহিক অস্তিত্বের সমস্যা-সমাধানের কোনো সুরাহা হয় না।

বিভক্ত পানজাবেও তারা ঊনজন—১৯৫১-র আদমশুমারে হিন্দুরা যেখানে ৬২.৩% শিখরা সেখানে ৩৫%। অকালি নেতারা পানজাবি সুবা দাবি করেন যেখানে শিখরাই হবে সংখ্যাগুরু। ভারতের অন্তর্ভূত খণ্ডিত পানজাব ১৯৬৬ সালে ত্রিধাবিভক্ত হয়। হিন্দু অধিজনদের নিয়ে গঠিত হয় হরিয়ানা ; আরেক অংশ বার করে হয় হিমাচল প্রদেশ। এই দুই নতুন রাজ্যকে বাদ দিয়ে বিশ হাজার বর্গমাইল নিয়ে যে পানজাব সেখানে শিখরা শতকরা ৫৬ ভাগ। এবারে তারা সংখ্যাগুরু বটে, কিন্তু অকালিরা চান শিখরাজ্যে অকালিদের একচেটিয়া ক্ষমতার প্রতিষ্ঠা। শতকরা ৫৬ ভাগের ভিত্তিতে একচেটিয়া ক্ষমতার নিশ্চয়তা মেলে না। সব শিখ অকালি-সমর্থক নয়। তা

ছাড়া, ষাটের এবং সত্তরের দশকে পানজাবের লক্ষণীয় আর্থিক উন্নতির ফলে অকালিদের নতুন সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ এবং বিহারের দরিদ্র অঞ্চল থেকে দলেদলে চাষিমজুর পানজাবে আসতে শুরু করে কাজের আশায় ; আশির দশকে পানজাবে খেতমজুরদের মধ্যে শতকরা ৩৭.৭ ভাগ হয়ে দাঁড়িয়েছে বহিরাগত। অন্যদিকে আর্থিক অবস্থার উন্নতির ফলে শিখ তরুণদের ভিতরে ধর্মীয় বিশ্বাস আর আনুগত্য শিথিল হয়েছে। এই অবস্থায় অকালিরা ধর্মের শুদ্ধতা এবং আনুগত্যের উপরে বিশেষ জোর দিতে চায় ; তাদের ভিতরে যারা উগ্রপন্থী তারা দাবি তোলে ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন করে শিখদের নিজস্ব স্বাধীন রাষ্ট্র খালিস্তান প্রতিষ্ঠার।

আকবরের বিবরণ অনুসারে, শিখদের ভিতরেও উগ্রপন্থীরা সংখ্যাল্প ; কিন্তু তাদের যা অভীষ্ট তা অস্পষ্টতাহীন, এবং অভিলাষপূরণের উদ্যোগে তারা নিরলস, নির্বিবেচক। অকালিদের ভিতরে মধ্যপন্থীরা শিখ "কৌমে"-র উপরে বিশেষ জোর দিলেও কখনো প্রকাশ্যে খালিস্তানের দাবি সমর্থন করেন নি ; কিন্তু জরনেল সিং ভিন্দ্রানওয়ালের নেতৃত্বে উগ্রপন্থীদের প্রভাবপ্রতিপত্তি দ্রুত বাড়তে থাকে। অকালি মধ্যপন্থীদের দুর্বল করবার উদ্দেশ্যে প্রথম দিকে কংগ্রেস নেতারা ভিন্দ্রানওয়ালের প্রতিষ্ঠায় যথেষ্ট সহায়তা করেন। তা ছাড়া, ভারতের বাইরে যে বহুসংখ্যক বিত্তবান শিখ বাস করেন তাঁদের ভিতরে অনেকে শিখ উগ্রপন্থীদের নানাভাবে পুষ্ট করতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত উগ্রপন্থীরা এতটা প্রবল হয়ে ওঠে যে অকালি নেতারাও তাদের নির্দেশে চালিত হতে শুরু করেন। উগ্রপন্থীরা বেছে-বেছে লোক খুন করতে থাকে ; অমৃতসরের স্বর্ণমন্দিরকে তারা দুর্গে রূপান্তরিত করে ; সেখানে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র সংগৃহীত হয়। অকালিরা ঘোষণা করে যে ৩রা জুন থেকে পানজাবের উৎপন্ন শস্য আর পানজাবের বাইরে যেতে দেওয়া হবে না, এবং শিখরা আর সরকারকে কোনো খাজনা দেবে না। তেসরা জুন রাতে পানজাবে ৩৬ ঘণ্টার জন্য কারফু জারি হয়। ৪ঠা জুন রাতের শেষ প্রহরে স্বর্ণমন্দিরে সশস্ত্র উগ্রপন্থীদের সঙ্গে সরকারি সেনাবাহিনীর লড়াই শুরু হয় ; শেষ হয় ৭ই জুন। লড়াইয়ে উগ্রপন্থীরা হারে বটে, কিন্তু তাদের সমর্থকরা স্বর্ণমন্দির আক্রমণের শোধ নেয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে ৩১শে অক্টোবর তাঁর নিজের আবাসে হত্যা করে। পালটায় দিল্লীতে এবং ছোটো-বড়ো অনেকগুলি শহরে বহু শিখকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়। স্বর্ণমন্দির আক্রমণ এবং দিল্লীর গণহত্যা শিখেদের মনে যে প্রতিক্রিয়া এনেছে তাতে অকালিদের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের সমঝোতা খুবই দুঃসাধ্য। আকবরের মতে, ধর্মীয় নিরপেক্ষতা আর গণতন্ত্রের আদর্শ ভারতবর্ষকে একটি নেশনের রূপ দিয়েছে, কিন্তু অধিকাংশ শিখের মনে এই দুই আদর্শের আকর্ষণ টিঁকবে কিনা এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া তাঁর মতে আজ খুবই শক্ত। বস্তুত আকবর গণতন্ত্রের কথা বললেও এটা স্পষ্ট যে দিল্লীর প্রধান নির্ভর এখন সেনাবাহিনী, এবং সম্প্রতি শিখ উগ্রপন্থীরা যেভাবে ব্যাপক সাম্প্রদায়িক হত্যার পথ বেছে নিয়েছে তাতে সেনাবাহিনীর ভূমিকা আরো বৃদ্ধি পাবে এটি প্রত্যাশিত।

তৃতীয় পর্বের বেশিটাই কাশ্মীরসংক্রান্ত। আকবর নতুন কোনো তথ্য দেন নি, তবে পাকিস্তানপর্বের আলোচনায় যেমন তিনি জিন্নাহ্‌র প্রতি আন্তরিক অনাস্থা আর অশ্রদ্ধা গোপন করেন নি, এ পর্বে তেমনই নেহরু এবং আবদুল্লাহ্‌ দুজনেই যে তাঁর বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন এটি সুপরিস্ফুট। তাঁর মতে, দুজনেই ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রে বিশ্বাসী ; দুজনেই কাশ্মীরকে ভারতবর্ষের অবিচ্ছেদ্য অংশরূপেই দেখেছেন। তবে শেখ আবদুল্লা ভারতের সঙ্গে যুক্ত থেকেও কাশ্মীরের স্বাতন্ত্র্য চেয়েছিলেন, আর তাঁর শত্রুরা সচেতনভাবে তাঁর এই মনোভাবকে ভারতবিরোধী আর সাম্প্রদায়িক বলে রটনা করে। ফলে তাঁকে বহু বৎসর বিনা বিচারে বন্দী করে রাখা হয়। এই অন্যায়ের জন্য নেহরুর ব্যক্তিগত দায়িত্ব অনেকখানি, কিন্তু আকবর ব্যাপারটিকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেছেন। ১৯৫৩ সালে আবদুল্লাহ্‌কে যখন বিনা অভিযোগে বন্দী করা হয়, তখন তার জন্য আকবর দায়ী করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কাটজু এবং যুবরাজ করণ সিংকে। তিনি লিখেছেন "নেহরুকে বলা হয় নি তাঁর বন্ধুকে (আবদুল্লাহ্‌কে) বন্দী করা হবে" (পৃ ২৪৯)! বিরোধী পক্ষের আন্দোলনের চাপে ১৯৫৮ সালের জানুয়ারি মাসে আবদুল্লাহ্‌কে মুক্তি দেওয়া হয় ; মুক্তি পাওয়ার পর চারমাস সম্পূর্ণ না হতেই আবদুল্লাহ্‌র নামে ষড়যন্ত্রের মিথ্যে মামলা এনে আবার তাঁকে জেলে পোরা হয়, এবারে মেয়াদ ছ বছরের। আকবর নেহরুর আচরণের ব্যাখ্যা করেছেন এই বলে যে ১৯৫৩-র "ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত" নেওয়ার পর তার যুক্তিনির্দেশ অনুসরণ করা ছাড়া নেহরুর উপায় ছিল না (পৃ ২৫৬)। বইটির এই অংশের ব্যাখ্যাবিশ্লেষণ বেশ দুর্বল। কাশ্মীরের ক্ষেত্রে নেহরু যে প্লেবিসিটের প্রতিশ্রুতি দিয়ে রাখেন নি জোরজবরদস্তি করে, লোভ দেখিয়ে, স্বীকৃত জননেতাকে কারারুদ্ধ করে সেই রাজ্যকে ভারতভুক্ত রাখার দায়িত্ব যে বিশেষ করে তাঁর, তথ্যসমর্থিত এই ব্যাপারটিকে স্বীকার না করা পর্যন্ত নেহরুভক্তরা একদেশদর্শিতার দোষ এড়াতে পারবেন না।

আবদুল্লাহ্‌র পঞ্চাশ-বছর-ব্যাপী রাজনৈতিক জীবনের প্রায় যোলো বছর কেটেছিল জেলে। আকবর তাঁকে যেভাবে গণতন্ত্রে সমর্পিতপ্রাণ বলে উপস্থিত করেছেন তাতে কিছুটা আধিক্য আছে। বস্তুত, ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ এবং বিপক্ষদলের উপরে ক্ষমতার অপপ্রয়োগ উভয় ক্ষেত্রেই নেহরু অথবা আবদুল্লাহ্‌র রাজনৈতিক আচরণ খুব একটা গণতন্ত্রসম্মত ছিল না। আবদুল্লাহ্‌র মৃত্যুর পর কাশ্মীর-ভারত সম্পর্কের সমস্যা আবার প্রবল হয়ে ওঠে। আবদুল্লাহ্‌র পুত্র এবং উত্তরাধিকারী ফারুক কাশ্মীরে নিজের জনসমর্থন বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে ভারতের অন্যত্র কংগ্রেসের প্রতিপক্ষ যেসব দল প্রভাবশালী হয়ে উঠছিল তাদের সমর্থন জানান ; ইন্দিরা গান্ধীর দৃষ্টিতে তিনি হয়ে দাঁড়ান 'শত্রু'। ১৯৮৪ জুলাই মাসে কেন্দ্রীয় সরকার ষড়যন্ত্র করে ফারুককে সরিয়ে তার ভগ্নীপতি এবং প্রতিদ্বন্দ্বী জি. এম. শাহ্‌কে কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রী করে। ফলে দিল্লীর উপরে কাশ্মীরিদের আস্থা নড়ে গেছে। আকবর মনে করেন, ভারতের নেতারা যদি গণতন্ত্রের নীতি অনুযায়ী চলেন তাহলে কাশ্মীর ভারতের সঙ্গেই থাকবে। অন্যথায় ভারতের সঙ্গে কাশ্মীরের সম্পর্ক অনিশ্চিত হয়ে পড়বে।

গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, সংহতি—সবই আমাদের কাম্য ; সুতরাং লেখকের বক্তব্যের প্রতি সহানুভূতি বোধ করা আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক। নাটকীয় রীতিতে ঘটনাবিন্যাসে তাঁর নিপুণতা আছে ; তাৎক্ষণিক ইতিহাস রচনা যেসব গুণে জনপ্রিয় হয় সেগুলি তিনি আয়ত্ত করেছেন। কিন্তু চিন্তার অগভীরতা আর বিচারপদ্ধতির শিথিলতাকে সাংবাদিক চাতুর্য পুরোপুরি ঢাকতে পারে নি। ভারতবর্ষ একটি 'নেশন' এবং এখানে গণতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত—এই দুটি প্রস্তাব তাঁর কাছে প্রায় স্বতঃসিদ্ধ। ভারত একটি স্বাধীন রাষ্ট্র বটে, কিন্তু ভারতবাসীরা কি সাধারণস্বীকৃত অর্থে একটি নেশন? বিকাশ এবং সংহতির জন্য ভারতের পক্ষে নেশন হওয়া কি জরুরি অথবা অনিবার্য? ভারতের সমৃদ্ধ বৈচিত্র্যকে স্বীকৃতি এবং মূল্য দিয়ে এখানে কি এমন এক যথার্থ ফেডারাল বা আমেল ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব নয় যেখানে বহুজাতিকতা রাজনৈতিক-আর্থিক-সাংস্কৃতিক সংহতিকে ব্যাহত না করে বরং উপমহাদেশব্যাপী সমামেল বা কনফেডারাল ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটাতে পারে? নেশনের সামূহিক সত্তার উপরে অতিরিক্ত ঝোঁক কি গণতান্ত্রিক বিকাশের প্রবণতাকে দুর্বল করে না? অপর পক্ষে, দেশবিভাগ এবং স্বাধীনতার পরে এদেশে যে সংবিধান রচিত হয় তার মূল নীতি গণতান্ত্রিক হলেও সে সংবিধানের রচনায় ভারতীয় জনসাধারণের কতটুকু সচেতন এবং সক্রিয় ভূমিকা ছিল? গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে দৃঢ়মূল করবার জন্য দেশবাসীর যে শিক্ষা এবং মানসবিবর্তন প্রয়োজন তার দিকে গত কয়েক দশকে আমরা কতটুকু এগিয়েছি? তাঁরা জনপ্রিয় ছিলেন বলেই কি গান্ধী অথবা নেহরুর নেতৃত্বকে গণতান্ত্রিক বলা চলে? মনোবিজ্ঞানী এবং সমাজবিজ্ঞানীরা যাকে 'অথরিট্যারিয়্যান পারসোন্যালিটি' বলেন জিন্নাহ্‌র মতোই এঁদের চরিত্রে এবং আচরণে তার অনেকগুলি লক্ষণ কি চোখে পড়ে না? ভারতীয় সংবিধানে গণতান্ত্রিক আদর্শ যতটুকু স্বীকৃতি পেয়েছিল তা কি নেহরু এবং ইন্দিরার আমলে লক্ষণীয়ভাবে খণ্ডিত তথা খর্বিত হয় নি? যেদেশে অধিকাংশ লোক এখনো নিরক্ষর এবং দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করে সেখানে গণতন্ত্রের বাস্তবতা কতখানি? বস্তুত, একদিকে পাকিস্তানি আক্রমণের আশঙ্কাকে জনসাধারণের মনে প্রবল করে এবং অন্যদিকে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে বিক্ষোভকে খুঁচিয়ে তুলে দিল্লী কি ক্রমাগতই কেন্দ্রের হাতে শক্তিবৃদ্ধির চেষ্টা করছে না? যে ধরনের আর্থিক উন্নয়নের পরিকল্পনাকে কংগ্রেসি নেতারা গত প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর ধরে বাস্তবায়নের চেষ্টা করছেন তার প্রবণতা কি ধনীকে আরো ধনী এবং গরিবকে আরো গরিব করার এবং ব্যাপক আমলাতান্ত্রিক এবং মাধ্যমিক অপচারকে আরো বাড়ানোর দিকে নয়? সৈন্যশক্তিকে নিয়োগ করে আভ্যন্তরিক বিক্ষোভকে সাময়িকভাবে দমন করা যায় বটে, কিন্তু সৈন্য বা পুলিশ দিয়ে কি গণতন্ত্রকে জোরদার করা সম্ভব?

এসব প্রশ্ন যে আকবরের মনেও একেবারে ওঠে নি, বইটি পড়ে তা মনে হয় না। কিন্তু তিনি এসব নিয়ে বিচারের দায়িত্ব এড়িয়ে গেছেন। জাতীয় সংহতি এবং গণতন্ত্র তাঁর অভীষ্ট। কিন্তু কী ভাবে বৈচিত্র্যের স্বীকৃতি তথা বিবর্ধনের ভিতর দিয়ে সৃজনধর্মী আর নির্ভরযোগ্য ঐক্য গড়ে উঠবে, কী ভাবে জনসাধারণের মনে ভাববিপ্লব এবং সমাজ-রাষ্ট্র-অর্থব্যবস্থার রূপান্তর এবং পরিচালনায় জনসাধারণের সক্রিয় যোগদান গণতন্ত্রকে এদেশে বাস্তব তথা দৃঢ়মূল করবে, সে সম্পর্কে তিনি প্রায় নীরব। শুধু উলেমা আর অকালিরাই কি সংহতি আর গণতন্ত্রকে বিপন্ন করেছে? হিন্দুদের জাতপাতের ঐতিহ্য ; কংগ্রেসের মহাত্মাজী-পণ্ডিতজী-দেবীজী তারণমন্ত্র, ইংরেজি হটিয়ে হিন্দিকে সকলের ঘাড়ে চাপানোর জোর-জবরদস্তি, গ্রামাঞ্চলে গরিব চাষি আর খেতমজুরদের সর্বনাশ করে উচ্চবিত্ত আর মধ্যবিত্ত চাষিকে সবরকম সুযোগসুবিধা দেওয়া, শহরে শহরে বেকার-সংখ্যা, বস্তি আর কালোবাজারের সম্প্রসারণ—এসবই কি সংহতি তথা গণতন্ত্রের পরিপন্থী নয়? সাম্প্রদায়িক উগ্রপন্থীদের কাজকর্মের বিরোধিতা সংগত এবং স্বাগত। কিন্তু ভারতের সমস্যা আরো অনেক জটিল, বহুমুখী, বদ্ধমূল।

শিবনারায়ণ রায়

এক নির্মোহ জ্ঞানতপস্বীর জীবনজিজ্ঞাসা

An Ever-expanding Quest of Life and Knowledge, by S. Dasgupta. Orient Longman, Calcutta. 1971. pp. 290. Price Rs. 20

এই বইটিতে প্রখ্যাত দার্শনিক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের জীবনী এবং দর্শনের ও সাহিত্যে তাঁর দান সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করেছেন তাঁর সহধর্মিণী সুরমা দাশগুপ্তে। লেখিকা নিজে দর্শনশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য এবং অধ্যাপনায় কৃতিত্বের জন্য খ্যাতিলাভ করেছেন। তিনি দীর্ঘকাল সুরেন্দ্রনাথের গবেষণাকর্মের সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন এবং তাঁর দার্শনিক চিন্তার অংশভাগিনী ছিলেন। জ্ঞানতপস্যার স্রোতে দুটি জীবনের সম্মিলিত অবগাহনের এমন চিত্র অতি দুর্লভ। লেখিকা বলেছেন ঃ

'It was the same work and interest we lived for and one had become an inseparable part of the other. We had created a different world for us both in which we lived.'

'চতুরঙ্গে' (ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫) প্রকাশিত 'সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত' প্রবন্ধে অমিয়কুমার মজুমদার বলেছেন, 'সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের জন্ম ইংরেজি ১৮৮৭ সালে...'। সুরেন্দ্রনাথের চাকুরি-সংক্রান্ত সরকারি কাগজপত্রে দেখা যায় যে তাঁর জন্ম হয়েছিল ১৮৮৭ সালের অক্টোবর মাসে। কিন্তু তিনি নিজে সুরমা দেবীকে বলেছিলেন যে তাঁর জন্ম হয়েছিল ১৮৮৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। তাঁর মতে এটিই সঠিক তারিখ। সুতরাং ১৯৮৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তাঁর জন্মের পর শতবর্ষ পূর্ণ হবে।

অমিয়বাবুর প্রবন্ধে কিছু তথ্যগত ত্রুটি আছে। তিনি বলেছেন, সুরেন্দ্রনাথ '১৯১২ সালে বিলাতে গিয়ে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ডি. ফিল. উপাধি পান।' কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণার কৃতিত্বের জন্য পিএইচ.ডি. উপাধি দেয়, ডি. ফিল. নয়। সুরেন্দ্রনাথ (এবং পরে সুরমা দেবী) পিএইচ. ডি. উপাধি পেয়েছিলেন। ডি. ফিল. উপাধি দেয় অকসফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়। সুরেন্দ্রনাথ কেমব্রিজ থেকে উপাধি পেয়েছিলেন ১৯২২ সালে। তার অন্তত দু বছর আগে তিনি বিলাতে যান—১৯২২ সালে নয়।

'লর্ড লিটনের হস্তক্ষেপের ফলে' সুরেন্দ্রনাথের সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষপদে নিয়োগের 'সব বাধা দূর হয়ে যায়'—অমিয়বাবুর এই কথাটি ঠিক নয়। লিটন বাঙলার গভর্নর ছিলেন ১৯২২-২৬ সাল। ১৯২৪ সালে ড আদিত্যনাথ মুখোপাধ্যায় সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ১৯৩১ সাল পর্যন্ত তিনি এই পদে আসীন ছিলেন। ১৯৩১ সালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারের পদে নিযুক্ত হন এবং সুরেন্দ্রনাথ সংস্কৃত কলেজে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। তখন বাঙলার গভর্নর ছিলেন সার স্ট্যানলি জ্যাকসন (১৯২৭-৩১)। লিটনের আমলে সুরেন্দ্রনাথ সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হন নি, হয়েছিলেন লিটনের বাঙলা-ত্যাগের প্রায় পাঁচ বছর পরে।

সুরেন্দ্রনাথের রচিত গ্রন্থাবলীর যে তালিকা অমিয়বাবু দিয়েছেন সেটা অসম্পূর্ণ। দুটি ইংরেজি বইয়ের নাম নেই ঃ

A History of Sanskrit Literature Rabindranath, The Poet and Philosopher

সুশীলকুমার দের সহযোগিতায় লিখিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত, সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস একটি অতি মূল্যবান গ্রন্থ। সংস্কৃত সাহিত্য আলোচনায় সুরেন্দ্রনাথ যে পাণ্ডিত্য এবং রসবোধের পরিচয় দিয়েছেন তা তাঁর বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় বহন করে।

বাঙলায় লেখা কয়েকটি বইয়ের নামও অমিয়বাবু বাদ দিয়েছেন : (১) আয়ুর্বেদ ; (২) নিবেদন (কবিতা-সংগ্রহ) ; (৩) প্রাচীন ভারতীয় চিত্রকলা। তাঁর উল্লিখিত 'ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস' বইটির সঠিক নাম 'ভারতীয় দর্শনের ভূমিকা'।

সুরেন্দ্রনাথের রচিত কয়েকটি ইংরেজি বই তাঁর দেহাবসানের পর সুরমা দেবীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে। এগুলির নাম অমিয়বাবুর তালিকায় নেই।

History of Indian Philosophy (Volume 5)
Fundamentals of Indian Art
Religion and Rational Outlook
Vanishing Dreams

প্রথম এবং তৃতীয় বইটির কথা অমিয়বাবু প্রবন্ধের মধ্যে অন্য প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন। চতুর্থ বইটির নাম উল্লেখ না করে তিনি লরেনস বিনিয়ন-এর প্রশংসাবাণী উদ্ধৃত করেছেন। এই বইতে সুরেন্দ্রনাথের বাঙলা কবিতার ইংরেজি অনুবাদ আছে। অনুবাদ যে সুরেন্দ্রনাথ নিজেই করেছিলেন সেটা অমিয়বাবু বলেন নি।

সুরমা দেবীর বইটির নাম খুবই অর্থবহ, কয়েকটি শব্দের মাধ্যমে তিনি সুরেন্দ্রনাথের জীবনের মূল সুরটি প্রকাশ করেছেন। তিনি জানতে চেয়েছেন জীবনের রহস্য এবং জ্ঞানের স্বরূপ। তাঁর সমগ্র জীবন যেন তীর্থযাত্রা। প্রাচীন ভারতের তীর্থযাত্রীদের মতোই তিনি মূল লক্ষ্যের কথা মনে রেখে, শারীরিক ক্লেশ এবং সাংসারিক ঝড়ের দাপট উপেক্ষা করে, গন্তব্যস্থলের দিকে অগ্রসর হয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে দলীয় লড়াই, রাজনীতির প্রশস্ত রণাঙ্গনে অহিংস কোন্দল—কিছুই তাঁকে পথভ্রষ্ট করতে পারে নি, কারণ নির্বাচিত পথ তাঁকে পরম প্রাপ্তির দিকে নিয়ে যাচ্ছিল। তাঁর জিজ্ঞাসার পরিধি ক্রমাগত বেড়ে যাচ্ছিল। এক খণ্ডে ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস লিখবেন, এটাই ছিল তাঁর প্রাথমিক সংকল্প। কিন্তু এই মহারত উদ্‌যাপন করতে তাঁকে পাঁচ খণ্ড লিখতে হয়েছিল। প্রশ্নের পর প্রশ্ন তাঁর চিত্ত আলোড়িত করল। বহু শ্রমে এবং অর্থব্যয়ে তিনি বহু বিস্মৃত কীটদষ্ট পুথি সংগ্রহ করলেন। একটি চক্ষু দৃষ্টিহীন, রোগজীর্ণ দেহ ভেঙে পড়ছে, তবু তিনি নতুন তথ্যের সন্ধান করলেন, সত্যের নতুন আলোতে মনকে সঞ্জীবিত করলেন। জ্ঞানতপাসুর এই যাত্রাপথে সঙ্গিনী এবং সহকারিণী ছিলেন সুরমা দেবী। প্রাচীন ভারতে দর্শন জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন পারমার্থিক চিন্তা-রূপে বিবেচিত হত না, জীবনের সকল দিকই দর্শনচর্চার অঙ্গীভূত ছিল। সুরেন্দ্রনাথ দর্শনের দিক থেকে আয়ুর্বেদের বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।

'ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস' গ্রন্থের উৎসর্গপত্রে সুরেন্দ্রনাথ বলেছেন ঃ

'The work and ambition of a life-time is herein humbly dedicated with supreme reverence to the great sages of India, who, for the first time in history, formulated the true principles of freedom and devoted themselves to the holy quest of truth and the final assessment and discovery of the ultimate spiritual essence of man through their concrete lives, critical thought, dominant will and self-denial.'

এই সাধনার উত্তরসূরী ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ। বার বার রাজনৈতিক ভূমিকম্প ভারতকে বিধ্বস্ত করেছে, ভারতীয় সমাজ বার বার নব কলেবর গ্রহণ করেছে, প্রাচীন ধর্ম রূপান্তরিত হয়েছে। কিন্তু ভারত-জীবনের যে ধারা একই খাতে প্রবাহিত হচ্ছে। এই সত্যটি সুরেন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি বলেছেন :

'Even at this day all the obligatory duties of the Hindus at birth, marriage, death, etc., are performed according to the old Vedic ritual. The prayers that a Brahmin now says three times a day are the same selections of Vedic verses as were used as prayer verses two or three thousand years ago...the Vedas, far from being regarded as a dead literature of the past, are still looked upon as the origin and source of almost all literartures except purely secular poetry and drama.'

সুরেন্দ্রনাথ সিদ্ধান্ত করেছেন :

'...in spite of the many changes that time has wrought, the orthodox Hindu life may still be regarded in the main as an adumbration of the Vedic life, which had never ceased to shed its light all through the past.'

আজকাল যাঁরা রাজনৈতিক বা অন্য কোনো কারণে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে বড়ো-বড়ো কথা বলেন তাঁদের কর্তব্য সুরেন্দ্রনাথের এই মন্তব্যটির মর্ম অনুধাবন করা। আর যাঁরা বিদেশী দর্শনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত জীবনাদর্শ এদেশে প্রতিষ্ঠিত করতে বদ্ধপরিকর তাঁরাও এই মন্তব্যটির ঐতিহাসিক তাৎপর্য বিচার করতে পারেন।

সুরমা দেবীর বইতে সুরেন্দ্রনাথের জীবনী এবং সারস্বত সাধনার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ পাওয়া যায় না। ছয়টি অধ্যায়ের মধ্যে চারটিতে জীবনী সম্বন্ধে আলোচনা, তথ্য এবং তারিখের প্রাচুর্য নেই ; কিন্তু জ্ঞানতপস্বীর যে ছবিটি পাঠকের চোখের সামনে ফুটে ওঠে সেটি খুবই চিত্তাকর্ষক। সুরমা দেবী ইংরেজি শব্দের মাধ্যমে ছবি আঁকতে জানেন। মৃত্যুর কিছুদিন আগে সুরেন্দ্রনাথ এবং সুরমা দেবী বর্ষা-সন্ধ্যায় লখনউতে তাঁদের বাড়ির বারান্দায় বসে থাকতেন :

'...we would...look up at the sky, overcast with dark tropical clouds, hear the incessant patter of the rain which sounded like music to our ears and we would look at the vegetation which used to appear unusually charming, being refreshed with cool showers. We used to compose Sanskrit verses in the style of Kalidasa's *Meghadutam*. He would compose several verses in different meters and I, a poor composer, could only contribute one or two lines here and there...'.

সুরেন্দ্রনাথের বয়স তখন ৬৫ অতিক্রম করেছে, দেহ জরাগ্রস্ত, মৃত্যুর কালো ছায়া স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তখন তিনি বর্ষাসন্ধ্যায় বারান্দায় বসে কালিদাসের অনুকরণে বিভিন্ন ছন্দে সংস্কৃত কবিতা রচনা করছেন মুখে-মুখে! সুরমা দেবী পাঠকের এসব কবিতা উপহার দেন নি, এগুলি লিখে রাখা হয়েছিল কিনা তা বলেন নি।

যিনি দর্শনের সূক্ষ্মতম তত্ত্ব বিশ্লেষণে অপূর্ব পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছেন তিনি মরমী কবিও ছিলেন। তিনি বাঙলায় বহু কবিতা লিখেছেন, তার কিছু অংশ নিজেই ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের কবিতার রসাস্বাদনে এবং ব্যাখ্যায় তাঁর অসীম আগ্রহ ছিল। আমাদের দুর্ভাগ্য, তাঁর 'রবিদীপিতা' এখনা বিস্মৃতির অন্তরালে চলে গেছে। ছাত্রসমাজে রবীন্দ্র-সাহিত্য পাঠে আগ্রহ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে

তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজ 'রবীন্দ্র পরিষদ' স্থাপন করেন ১৯২৭ সালে। পরিষদের সভায় তিনি ভাষণ দিতেন। রবীন্দ্রনাথের বর্ষার কবিতা সম্বন্ধে তাঁর একটি ভাষণ বর্তমান সমালোচকের এখনও মনে পড়ে। তাঁর কথাগুলি মনে নেই, মনে আছে তাঁর কাব্যরসসিঞ্চিত কণ্ঠস্বর, তাঁর প্রসন্ন আননে ব্যঞ্জনাময় হাস্যরেখা।

সুরেন্দ্রনাথ ভারতীয় দর্শনের যে ইতিহাস লিখেছেন সেটি শুধু তথ্যের আকর নয়। তিনি তথ্যকে যাচাই করেছেন, বিশ্লেষণ করেছেন, নিজের প্রজ্ঞার আলোকে তার মূল্যায়ন করেছেন। মোটামুটি এই ধরনের কাজ প্রাচ্য তথা পাশ্চাত্ত্য দর্শনের সকল ঐতিহাসিকই করে থাকেন। কিন্তু সংগৃহীত তথ্যের বিপুলতায়, বিশ্লেষণের গভীরতায় এবং মূল্যায়নের বৈশিষ্ট্যে সুরেন্দ্রনাথ ভারতীয় দর্শন আলোচনার ক্ষেত্রে অনন্য স্থানের অধিকারী।

আমরা 'দার্শনিক' শব্দটি সাধারণত খুব হালকাভাবে ব্যবহার করি, ভুলে যাই যে যাঁরা দর্শনের ইতিহাস রচনা বা দার্শনিক তত্ত্বের ব্যাখ্যা করেন তাঁরা সকলেই 'দার্শনিক'পদবাচ্য নন। যাঁর নিজস্ব দার্শনিক চিন্তা যুক্তিসিদ্ধভাবে একটি বিশিষ্ট রূপ নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে তিনিই 'দার্শনিক'-পদবাচ্য। এই অর্থে সুরেন্দ্রনাথ প্রকৃত 'দার্শনিক' ছিলেন।

সুরমা দেবী বলেছেন, সুরেন্দ্রনাথ তাঁর নিজস্ব দর্শন ব্যাখ্যা করে দুই খণ্ডে বিভক্ত একটি গ্রন্থ রচনার সংকল্প করেছিলেন। এই দর্শন প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্ত্য দর্শন থেকে মূলত পৃথক ছিল, যদিও প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্ত্য দর্শনে সুরেন্দ্রনাথের গভীর পাণ্ডিত্য একে সমৃদ্ধ করেছিল। তাঁর দার্শনিক চিন্তার বিবর্তনে বিজ্ঞানের—বিশেষত পদার্থবিদ্যার এবং জীববিজ্ঞানের—একটি বিশেষ স্থান ছিল। এফ.এ. ক্লাসে পড়ার সময় বিজ্ঞান এবং সংস্কৃত ভাষা এবং সাহিত্যের প্রতি তাঁর সমান আকর্ষণ ছিল। রসায়ন তাঁর পাঠ্য বিষয়গুলির অন্তর্ভুক্ত ছিল। কৃষ্ণনগর কলেজে এই বিষয়টি সুরেন্দ্রনাথ পড়েছিলেন ওই কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ এবং রসায়নের প্রখ্যাত অধ্যাপক জ্যোতিভূষণ ভাদুড়ীর কাছে। পরবর্তী কালে তিনি সংস্কৃতকে প্রধান পাঠ্যবিষয়রূপে গ্রহণ করেন। সংস্কৃতে এম.এ. পরীক্ষায় সাফল্যের পরে তিনি দর্শনে এম.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। সম্ভবত মধ্য বয়সে দর্শনের সঙ্গে বিজ্ঞানের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বিষয়ে তিনি অবহিত হয়েছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ. ডি. ডিগ্রি (১৯২০) লাভের জন্য তিনি যে গবেষণা-গ্রন্থ দাখিল করেছিলেন তার বিষয় ছিল যোগদর্শন।

দীর্ঘকাল পরে ভিয়েনাতে পাশ্চাত্ত্য মনস্তত্ত্বশাস্ত্রের গুরু ফ্রয়েডকে সুরেন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে যোগদর্শনের মতে মানুষ সাধনার ফলে নির্জ্ঞানকে সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। ফ্রয়েড মন্তব্য করেন যে এটা অসম্ভব। সুরেন্দ্রনাথ উত্তর দিলেন যে ভারতীয় যোগীরা বহুকালব্যাপী সাধনার ফলে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন তাকে কোনোরকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়া বাতিল করা বিজ্ঞানসম্মত নয়। এই কথোপকথন থেকে দর্শন আলোচনায় পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সুরেন্দ্রনাথের ধারণার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। অবশ্য সকল রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার অত্যাবশ্যক নয়; পদার্থবিদ্যার উচ্চতম স্তরে অনেক তথ্য শুধু কাগজ-কলম নিয়ে অঙ্ক কষে আবিষ্কার করা হয়েছে।

যাই হোক, সুরেন্দ্রনাথ তাঁর নিজস্ব দর্শনের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা রেখে যেতে পারেন নি। প্রধান বাধা ছিল ভগ্নস্বাস্থ্য এবং 'ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস' গ্রন্থের পঞ্চম খণ্ড রচনা সমাপ্তির জন্য তাঁর আগ্রহ। আগ্রহী পাঠকের জন্য সুরমা দেবী একটি প্রবন্ধ এবং দুটি গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন, যেখানে সুরেন্দ্রনাথের নিজস্ব দর্শনের অসম্পূর্ণ বিবৃতি পাওয়া যাবে।

'Dependent Emergence', an essay in *Contemporary Indian Philosophy* (ed. Radhakrishnan and Muirhead).

Religion and Rational Outlook.
Perspectives of Philosophy and Other Essays.

জীবন-জিজ্ঞাসার বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে সুরেন্দ্রনাথের গভীর চিন্তার কিছু পরিচয় পাওয়া যায় সুরমা দেবীকে লেখা তাঁর ৬৪টি চিঠিতে। চিঠিগুলি লেখা হয়েছিল বাঙলায়, বিভিন্ন জায়গা থেকে, ১৯৩২-৪৩ সালে। সুরমা দেবী তাঁর বইতে ইংরেজি অনুবাদ দিয়েছেন।

জাহাজ ভূমধ্যসাগরে চলছে, সিসিলি দ্বীপের কাছাকাছি এসেছে। তারিখ ১৫ এপ্রিল ১৯৩৯। বাঙলা নববর্ষ। সুরেন্দ্রনাথ লিখছেন:

'I paid my homage to my Lord on the New Year's day. I keep my Lord of the heart to myself, my eyes do not know any satiety looking on at Him.'

১৯৪৩ সালে কলকাতায় বসে সুরেন্দ্রনাথ লিখছেন:

'The Lord of the universe... creates in delight. He destroys in joy...He makes flowers and leaves to blossom in different seasons; but in winter he makes them fall and wither...Thus also man grows in youth, breaks down in the cruelty of old age...The eternal Artist is painting new pictures, and when he wishes he wipes them out.'

সুরেন্দ্রনাথ আত্মজীবনী লিখতে আরম্ভ করেছিলেন, কিন্তু ভূমিকা ছাড়া আর কিছুই লিখতে পারেন নি। বাঙলায় লেখা এই ভূমিকাটির ইংরেজি অনুবাদ করে সুরমা দেবী তাঁর বইতে ছেপেছেন। এতে জীবনীসংক্রান্ত কোনো তথ্য নেই, আছে মানবসত্তার ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে সুরেন্দ্রনাথের নিজস্ব ধারণার বিশ্লেষণ।

'We human beings are twice born, first we are born on the biological level, and then we grow out of it and wake up on a different level, which is of the mind, which has a different value, and a supra-biological life, and that is our higher birth or a spiritual one.'

মানুষ যখন এই উচ্চতর জন্মপ্রাপ্তির পর পরিণত বয়সে আত্মজীবনী লেখে, তখন সে নিম্নতর জন্মের ঘটনাবলী বর্ণনা করে তাঁর দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতার আলোকে রঞ্জিত করে।

'This may be compared to the spontaneous art-creation of an artist who re-lives his experiences and creates them anew.'

বাঙালি আত্মবিস্মৃত জাতি, একথা এখন আর বলা যায় না। সাহিত্যিক তথা মনীষীদের জন্মশতবার্ষিকী উৎসব এখন বাঙালি সমাজে উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। কিন্তু মহামনীষী সুরেন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকী সম্বন্ধে কোনো আগ্রহের চিহ্ন লক্ষ্য করি নি। প্রেসিডেন্সি কলেজ এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল তাঁর অধ্যাপনার ক্ষেত্র। সংস্কৃত কলেজে তিনি ছিলেন ছাত্র ও অধ্যক্ষ। কোথাও তাঁর নাম উচ্চারিত হয় না। তিনি ছিলেন কবিগুরুর অন্তরঙ্গ সুহৃদ এবং রবীন্দ্রচর্চার ক্ষেত্রে অন্যতম পুরোধা, কিন্তু বিশ্বভারতী তাঁর সম্বন্ধে নীরব। বরিশাল জেলার এক প্রাচীন এবং খ্যাতিমান বংশে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু স্মৃতিরক্ষার ব্যাপারে বরিশাল সেবা সমিতির আগ্রহ আছে বলে শুনি নি।

তবে সুরেন্দ্রনাথের স্মৃতি বেঁচে থাকবে, বাঙালির উদাসীনতার ফলে তা নষ্ট হবে না। যতদিন ভারতীয় দর্শন পঠিত এবং আলোচিত হবে ততদিন তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে তিনি বেঁচে থাকবেন।

অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের মধ্যে দ্বারকানাথের সন্ধান

দ্বারকানাথ ঠাকুর : বিস্মৃত পথিকৃৎ—কৃষ্ণ কৃপালনী। অনুবাদ—ক্ষিতীশ রায়। ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, নয়া দিল্লি, ১৯৮৪। পৃ ৩৬৮। সাতাশ টাকা।

দ্বারকানাথ ঠাকুর শুধু জোড়াসাঁকো-ঠাকুরবাড়ির কৃতী পুরুষ নন, তিনি উনিশ শতকে বঙ্গীয় নবজাগরণের অন্যতম নেতৃস্থানীয় বিখ্যাত ব্যক্তি। রামমোহনের স্নেহভাজন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পিতা, রবীন্দ্রনাথের পিতামহ, প্রিন্স দ্বারকানাথ তাঁর স্বল্প জীবন-পরিধির মধ্যে যথেষ্ট কর্মকৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। বিশেষভাবে ব্যাবসাবাণিজ্যে বাঙালিদের মধ্যে তাঁকে 'পথিকৃৎ' মনে করার কারণ আছে। নিজের চেষ্টায় বিরাট সম্পত্তির অধিকারী হয়েছিলেন, সেকালের তথাকথিত রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল, একাধিকবার বিলাত গেছেন, সাহেবসুবোর কাছে সমাদর পেয়েছেন—সব মিলিয়ে এক কিংবদন্তীর নায়ক। কিশোরীচাঁদ মিত্র ১৮৭০ সালে প্রকাশ করেছিলেন মেময়ার অব দ্বারকানাথ টেগোর। সংবাদপত্রে সেকালের কথা বা সাময়িকপত্রে সমাজচিত্রের মতো সংকলনগ্রন্থে তাঁর সম্বন্ধে অনেক খবর ছড়িয়ে আছে। দেবেন্দ্রনাথ তাঁর আত্মজীবনীতে পিতার কথা অল্পস্বল্প লিখেছেন। রবীন্দ্রনাথ পিতামহকে নিয়ে স্বতন্ত্রভাবে কিছু না লিখলেও পিতামহ সম্বন্ধে তাঁর গৌরববোধের নিদর্শন ছড়িয়ে আছে বিভিন্ন রচনায়, বিশেষত ঠাকুরবাড়ির 'স্বাদেশিকতা' যে দ্বারকানাথের প্রভাবজাত এমন কথা জানিয়েছেন জীবনস্মৃতির প্রথম পাণ্ডুলিপিতে (দ্র. জীবনস্মৃতি, ১৯৬২, পৃ. ১৮৮)। ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর প্রপিতামহের জীবনী লিখেছিলেন অনেকদিন আগে, ১৯৬৯ সালে তা গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়েছে। ব্লেয়ার বি. ক্লিঙ ১৯৭৬ সালে লিখেছেন পার্টনার ইন এম্পায়ার, দ্বারকানাথ টেগোর অ্যানড দি এজ অব এনটারপ্রাইজ ইন ঈসটারন ইনডিয়া। রবীন্দ্রনাথের নাতজামাই কৃষ্ণ কৃপালনী ১৯৮০ সালে লেখেন দ্বারকানাথ টেগোর এ ফরগট্‌ন পায়োনীয়র : এ লাইফ। সম্প্রতি ক্ষিতীশ রায়-অনূদিত কৃপালনীর ইংরেজি বইটির বাঙলা-সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। দ্বারকানাথ-চর্চা যেভাবে একালে প্রসার পেয়েছে তাতে আর তাঁকে 'বিস্মৃত' বলা যায় কিনা সন্দেহ। তবে কৃপালনীর লেখা জীবনীটি এক হিসাবে দ্বারকানাথের প্রথম পূর্ণাঙ্গ জীবনী, সেদিক থেকে বইটির মূল্য অপরিসীম।

অন্যদিকে কৃপালনীকে দ্বারকানাথের জীবনী লেখার যোগ্যতম ব্যক্তি মনে করা যায়। তিনি শুধু ঠাকুর-পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত নন, তিনি বিলাতে ইনডিয়া অফিস এবং ব্রিটিশ লাইব্রেরিতে পাঁচ মাস কাজ করার সুযোগ পেয়েছেন, যে সুযোগ খুব কম ভারতীয় লেখক পান। অবশ্য কোনো

ফাউনডেশন বা য়ুনিভার্সিটির আর্থিক সহায়তা পান নি বলে ভূমিকায় তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। আসলে মারকিন গবেষকের মতো অর্থানুকূল্য খুব কম ভারতীয়ের কপালেই জোটে। তা ছাড়া কৃপালনীর লেখা পড়ে মনে হয় তথ্যসংগ্রহ তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না, তিনি বিশেষ একটি বক্তব্য প্রমাণের উদ্দেশ্যে দ্বারকানাথ জীবনী লিখেছেন। সেদিক থেকে এটি ব্যাখ্যামূলক জীবনী। তাঁর বক্তব্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে ভূমিকায় উত্থাপিত প্রশ্নগুলি থেকে—যথা, "মহর্ষি-প্রভাবের মোহিনী মায়ার আবরণ অপসারণ করে আমি দেখতে চেয়েছিলাম ঠাকুর-পরিবারের পূর্বসূরীদের মধ্যে কেউ কি এমন ছিলেন যিনি রবীন্দ্রনাথকে অন্তত অংশতও সম্ভবপর করে থাকবেন?" "এই বিস্মৃতপ্রায় লোকটি কি তবে কুলে কালি দিয়েছিলেন বলে পরিবারের কেউ তাঁর নাম উচ্চারণ করে না? যে-লোকটি তাঁর জীবিতকালে এত লোকের শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন, মৃত্যুর পর তাঁকে এত তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা হল কেন?" কৃপালনীর ধারণা, রবীন্দ্রনাথ তাঁর "বহুমুখী প্রতিভা এবং নানা বিষয়ে আগ্রহ ও ঔৎসুক্য, মূলত ইহজাগতিক অথচ বিশ্বব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গি, সঙ্গীতে ও আত্মপ্রকাশের বিভিন্ন শিল্পে ঐকান্তিক প্রীতি, ভারতে নাট্যশিল্পের পুনরুত্থানের জন্য সক্রিয় আগ্রহ" ইত্যাদি পেয়েছিলেন তাঁর পিতামহের কাছ থেকে। কিন্তু পিতা তাঁর পুত্রের মনে পিতামহ সম্বন্ধে এমনই বিরূপতা জাগিয়ে তুলেছিলেন যে রবীন্দ্রনাথের শুধু দ্বারকানাথের স্মৃতিরক্ষার কোনো চেষ্টা করেন নি তাই নয়, দ্বারকানাথের কাগজপত্র নিজে বিনষ্ট করেছেন। অর্থাৎ কৃপালনীর আসল অভিযোগ দেবেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে (অকৃতজ্ঞতা, সুবিধাবাদ, ভণ্ডামি—কী নয়?), তবে সেই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে অপরিসীম শ্রদ্ধা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধেও কিছু অভিযোগ আছে। ভারি অদ্ভুত একটি সিদ্ধান্তবাক্যে লেখক বইয়ের উপসংহার করেন—"এই পৌত্র-পিতামহ প্রশ্নটি বর্তমান লেখককে খুবই ভাবিয়েছে এবং সে-প্রশ্নের সদুত্তর তিনি আজও পান নি। তবে তিনি এক প্রকার নিঃসন্দেহ যে রবীন্দ্রনাথ যদি একটু কষ্ট করে তাঁর পিতামহের জীবন ও কার্যকলাপ অনুধাবন করতে পারতেন, তাঁর সহজাত ঔদার্যগুণ ও পরোপকার-প্রবৃত্তি বিশ্লেষণ করে দেখতে পারতেন—তবে তিনি নিশ্চয় ক্রমে তাঁকে ভালো করে বুঝতে ও শ্রদ্ধা করতেও শিখতেন।"

কিন্তু সমগ্র বইটি একাধিকবার পড়ার পরও লেখকের সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া যায় না। লেখক নিজেই দ্বারকানাথের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাভাবনা কাজকর্মের পার্থক্য নির্দেশ করেছেন নানা স্থানে, যেমন জমিদার হিসাবে দুজনের তুলনা (৭৮), অহিফেন ব্যবসায়ে দ্বারকানাথের আগ্রহ ও এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ধারণা (১০৪), দ্বারকানাথের সুবিধাবাদী ধর্মাচরণ ও রবীন্দ্রনাথের ধর্মাদর্শ, ইত্যাদি। কিন্তু মুশকিল হয়েছে, কৃপালনী আগাগোড়াই একটা 'ধরে-নেওয়া' প্রতিপাদ্যের দিকে তাকিয়ে বইটি লিখেছেন। 'কথিত আছে', 'মনে হয়', 'হয়তো' 'হতে পারে'—এ ধরনের শব্দব্যবহার যথেচ্ছ। কল্পকাহিনীর দিকে ঝোঁক প্রায় সর্বত্র, যেমন পত্নীর মৃত্যুর পর "শোকাভিভূত অবস্থায় একান্তে বসে থাকতে কত ছবিই না তাঁর মনের পটে ভেসে থাকবে—বিবাহরাত্রে সেই লাল চেলি-পরা বালিকা বধূ, প্রথম যৌবনের সেই সব মিলনমধুর দিন।" দ্বারকানাথকে সমর্থন করতে গিয়ে দেবেন্দ্রনাথকে যে-ভাবে সব দিক থেকে তাঁর বিপরীত-ধর্মী চরিত্ররূপে উপস্থিত করা হয়েছে তাতে মনে হয় লেখক নাটক লিখছেন, প্রয়োজনমতো তথ্য গ্রহণ-বর্জনের অধিকার তাঁর আছে। অন্যদিকে একই কারণে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধেও সত্য কথা বলা সম্ভব হয় নি।

দ্বারকানাথের জীবনী পড়লে তাঁর যে ছবিটি আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে, তা হল—বিষয়ী, ইহবাদী, সফল, ভোগসর্বস্ব, নীতি-দুর্নীতি-নিরপেক্ষ বহুমুখী ব্যক্তিত্বের অধিকারী একটি মানুষ, রেনেসাঁসের কালে যাঁর আবির্ভাব প্রত্যাশিত। কিন্তু "ব্যবসা-বাণিজ্যের একজন অসমসাহসিক সংগঠক ও উদ্যোগী" পুরুষ প্রভূত বিত্তের অধিকারী হয়েছেন বলেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হবেন একথা ভাবা কঠিন। (রবীন্দ্রনাথের উপর অন্তত পিতামহের ব্যবসায়ী-বুদ্ধি বর্তায় নি, তার দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রজীবনীতে মিলবে)। অন্যদিকে 'প্রিন্স দ্বারকানাথের পৌত্র'—এই পরিচয় রবীন্দ্রনাথের কাছে কেন আপত্তিকর ছিল, দ্বারকানাথ-ইতিবৃত্ত অনুসরণ করলেই তা বোঝা যাবে।

কৃপালনী জানিয়েছেন, "ঠাকুর-পরিবার কোম্পানির দৌলতে নিঃসন্দেহ সমৃদ্ধি লাভ করেছিল। ধর্মাধর্ম নিয়ে যাঁরা খুঁতখুঁতে ছিলেন না, সুযোগ-সুবিধাসন্ধানে যাঁরা তৎপর ছিলেন, তাঁদের তখন রোজগারের পথ খোলা ছিল চতুর্দিকে।" "ব্রিটিশ শক্তির আবির্ভাব ও প্রতিষ্ঠালাভের সঙ্গে" ঠাকুর-পরিবারের যোগাযোগকে দ্বারকানাথ ভালোভাবেই কাজে লাগিয়েছিলেন নিজের জীবনে। লেখকের ভাষায়, দ্বারকানাথের "যদি জীবনদর্শন বলতে কিছু থেকে থাকে তা ছিল বাস্তবধর্মীর জীবনদর্শন।" তাই 'গুরু' রামমোহনের অনুসরণ তাঁর পক্ষে কখনোই সম্ভব হয় নি—লক্ষ্মীজনার্দনের পূজা, জপতপ রাখতে হবে সমাজের দিকে তাকিয়ে, অন্যদিকে ইংরেজের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্কস্থাপন ও ব্যাবসায় উন্নতির প্রয়োজনে শুধু গোমাংস ও মদ্য গ্রহণ নয়, বাগানবাড়িতে সাহেবতোষণ করতে হবে। দ্বারকানাথ শুধু ভারতবর্ষে ইউরোপীয়দের স্থায়ী বসবাসের জন্য ওকালতি করেন নি, অবাধ বাণিজ্যনীতির তিনি শুধু প্রধান সমর্থক ছিলেন না, কিংবা নীলচাষের নির্বিঘ্ন সমর্থনে সোচ্চার হন নি, তিনি 'কালা আইনে'র বিরুদ্ধতা পর্যন্ত করেছেন। কালা আইনের বিরুদ্ধে বক্তৃতায় তিনি ইংরেজ-প্রেমে মত্ত হয়ে এমন অনেক কথা বলেন, যে-জন্য সেকালেই তাঁকে ধিকৃত হতে হয়েছে। আত্মপক্ষ সমর্থনে তিনি 'ইংলিশম্যানে' যে চিঠি লেখেন তাতে তিনি ভারতবাসীর মধ্যে 'সত্যবাদিতার অভাব, সততার অভাব ও নিজস্ব সিদ্ধান্ত বিচারের অভাবে'র কথা বললেন না, সেই সঙ্গে তার জন্য দায়ী করলেন মুসলমান শাসকদের। এখানেই শেষ নয়, ইউরোপে থাকার সময় 'মহামান্য কোর্ট অফ ডিরেক্টরস'কে লিখলেন 'বিধাতার বিধানে যে লক্ষ লক্ষ লোকের কল্যাণ ও উন্নতি সাধনের দায় আপনাদের উপর বর্তেছে, সে-দায়িত্ব পালনে আপনাদের সহৃদয় ব্যাকুলতা সমগ্র পৃথিবীর মুগ্ধ প্রশংসা অর্জনের দাবী রাখে।' কৃপালনী দ্বারকানাথের সমর্থনে লেখেন, "ভারতের সদাগর-রাজ কি কূটনীতির চাল চেলেছিলেন বিলাতের সদাগর-রাজদের সঙ্গে? তা না হলে লর্ড মেয়রের ভোজসভায় ম্যানসন হাউস-এর বক্তৃতায় যে-হঠকারিতা করেছিলেন এবং যার বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন কেবল ভারতীয় বন্ধুরা নয়, অপিচ বিলাতের বন্ধুরাও—সেই প্রমাদের পুনরুক্তি করতে গেলেন কেন? ম্যানসন হাউস-এর বক্তৃতায় একটা তবু বাঁচোয়া এই ছিল যে স্তুতির অতিশয়োক্তিকে লোকে ব্যাজস্তুতি বলে মনে করতে পারত—যেমন করেছিলেন বেঙ্গল হরকরার সম্পাদক। কিন্তু ডিরেক্টরদের উদ্দেশ্যে লিখিত চিঠির প্রবল উচ্ছ্বাসের মধ্যে অন্তঃসলিল ছলাকলার কোনো অবকাশই ছিল না—ছিল নিছক খোশামুদি।" পৌত্র রবীন্দ্রনাথ কি কোনোদিন ইংরেজ সরকারের এমন 'খোশামুদি' করতে পারতেন?

এইবার বঙ্গানুবাদ সম্বন্ধে সামান্য দু-একটি কথা বলি। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশ রায় এই অনুবাদ করেছেন একথা ঠিক ভাবতে পারছি না। ইংরেজি বইয়ের সঙ্গে মিলিয়ে পড়লে অনুবাদ আদৌ নির্ভরযোগ্য মনে হবে না (যেমন ইংরেজি বইয়ের ৬০ পৃষ্ঠা ও বাংলা বইয়ের ৭০ পৃষ্ঠা দেখুন)। বাঙলা বাক্যগঠন প্রায়ই বিভ্রান্তিকর, যেমন 'সর্বোপরি, রচনা কি করেছেন এমন একটা মধুর পরিবেশ যেখানে সকল প্রজা সুখে ও আনন্দে বসবাস করতে পারেন?' (৭৯)। কিংবা 'দ্বারকানাথের জীবন যেন ইতিহাসের বিদ্রূপ' (৩১৭)। 'মায়', 'রমরমা', 'বহুবিশিষ্ট', 'প্রোৎসাহিত' ধরনের শব্দ যেখানে-সেখানে। বাঙলা বইয়ের প্রুফ যত্ন করে দেখা হয় নি, ফলে ছাপার ভুল অজস্র। কোন্‌টি লেখকের ভুল, আর কোন্‌টি মুদ্রাকরপ্রমাদ, তা দেখার জন্য বারবার ইংরেজি বই মিলিয়ে দেখতে হবে। অন্য ধরনের কিছু সম্পাদনারও প্রয়োজন ছিল। একই ঘটনার পুনরুক্তি (যেমন ৩১৬ পৃষ্ঠা ও ৩৩৬ পৃষ্ঠায়) কি পরিহার করা যেত না? আর লেখকের আত্মকথন বইয়ের শেষাংশে কোন্ প্রয়োজন সিদ্ধ করেছে তা জানি না। অন্তত দ্বারকানাথকে জানতে বা বুঝতে তা সাহায্য করে না।

অলোক রায়

বঙ্গভূমিতে রেনেসাঁসের যথার্থ চরিত্র

উনিশ শতকের বাংলার জাগরণ : তর্ক ও বিতর্ক—সম্পাদনা : নরহরি কবিরাজ। কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী। কলকাতা-১২ ; মূল্য—চল্লিশ টাকা।

সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাষ্ট্রনৈতিক, ধর্মগত—সমস্ত দিক দিয়ে বাঙলার একটা অন্তরঙ্গ আর বহিরঙ্গ পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল উনিশ শতকের প্রায় সূচনাকাল থেকে। কারণ এ সময়ে যে নবজাগৃতি ঘটেছিল তা বাঙালির পুরানো ধ্যানধারণায় যেমন একটা আঘাত হেনেছিল, তেমনি একটা প্রত্যাঘাতও লক্ষ্য করা গিয়েছিল। নতুন জীবনবোধ এবং পুরানো জীবনবোধের এই সংঘাতে নতুনের আত্মপ্রতিষ্ঠা আর পুরাতনের আত্মরক্ষার চেষ্টায় প্রথমে দেখা দিয়েছিল তর্ক এবং কবিগানের চাপান-উতোরের মতোই পরে তর্কের পিঠে দেখা দিয়েছিল বিতর্ক। এসব তর্ক-বিতর্ক নিয়েই উনিশ-শতকীয় সমাজ ও দেশ আন্দোলিত হয়েছিল। প্রধানত সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠাগুলিতে এই তর্ক-বিতর্কের দলিল রক্ষিত হয়ে এসেছে। সংগ্রাম যত ঘনীভূত হয়েছে, তর্ক যত প্রবল হয়েছে, বিতর্কও তত বিস্তৃত হয়েছে।

কিছুদিন আগে থেকেই এই তর্ক-বিতর্ক নিয়ে একটা প্রশ্ন বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছে। উনিশ-শতকীয় এই বাঙলার আভ্যন্তরিক পরিবর্তনকে অনেকেই নবজাগরণ, পুনর্জাগরণ বা পশ্চিমী মতে 'রেনেসাঁস' আখ্যা দিতে রাজি হচ্ছেন না। ইয়োরোপের সুবিখ্যাত রেনেসাঁস (ফ্রান্স, ইতালি, ইংল্যানড, জারমানি প্রভৃতি দেশে) কাব্যকলা-দর্শনবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে নতুন আবিষ্কার, জীবনবোধে নতুন আশা এবং

নতুন জীবনাদর্শ গড়ে তুলেছিল তার প্রকৃতির সঙ্গে বঙ্গদেশীয় জাগরণের নাকি কোনো মিল নেই।

এর পরেই আবার একটা প্রশ্ন অন্য কোনো গোষ্ঠী থেকে উচ্চারিত হয়ে চলেছে যে, যে জাগরণ বিদেশী শাসনের অবসান কামনা করে নি, রাজনৈতিক স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে আন্দোলনের মূল কেন্দ্রে স্থাপন করে নি—তাকে কী করে আমরা নবজাগরণ বলব। প্রাচীনের মাটিতে নবীনের অভ্যুদয়ের এই সংগ্রামকে তাঁরা বহিরাচারীও বলেছেন। অথচ দেশের অধিকাংশ চিন্তাবিদ্‌ই একে রেনেসাঁস বলে ভেবে এসেছেন এবং এই আন্দোলনের দ্বিতীয়ার্ধের অংশভাক্‌ পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৭-১৯১৯) তাঁর আকরগ্রন্থ 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থে একে নবজাগরণ বলেই প্রথম ঐতিহাসিক স্বীকৃতি দিয়েছেন।

ফলে, এককালে যে তর্ক-বিতর্ক রক্ষণশীল এবং প্রগতিপন্থীদের মধ্যে দেখা দিয়েছিল এখন তারই পিঠে আবার নব 'রক্ষণশীল' এবং 'প্রগতিশীল'দের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক অন্য একরকম চেহারা নিয়ে দেখা দিয়েছে। এই দ্বিতীয় সমস্যাটা আরও ঘনীভূত হয়েছে এই কারণে যে উভয় পক্ষই নিজেদেরকে যথার্থ ঐতিহাসিক-দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন এবং 'প্রগতিপন্থী' ঘোষণা করেছেন। কিন্তু রেনেসাঁস যে 'মুখ্যত চিৎসম্পদ, বস্তুসম্পদ তাতে কম অর্থপূর্ণ নয়, কিন্তু তা আনুষঙ্গিক'—কোনো একটি পক্ষ এটি বিস্মৃত হয়ে বসে আছেন। এই দ্বিতীয় ধারার প্রসঙ্গকে উপজীব্য করেই কৃতবিদ্য তাত্ত্বিক-সমালোচক নরহরি কবিরাজের সম্পাদনায় বর্তমান প্রবন্ধসংকলনপুস্তকটি প্রকাশিত হয়েছে। বলা প্রয়োজন, যদিও বইটির নামের সূচনায় 'উনিশ শতক' কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে কিন্তু যথার্থভাবে দেখতে গেলে এর মুখ্য আলোচনাপর্বটি উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ঘিরেই—বড়োজোর আরও এক দশক কাল বেশি গ্রহণ করা হয়েছে। একমাত্র 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র উল্লেখে দ্বিতীয়ার্ধের সাতের দশক স্পর্শ করা হলেও উনিশ শতকের গোটা চেহারাটি এখানে ধরা পড়তে পারে নি। তা না পড়লেও উনিশ শতকের প্রথমার্ধে প্রায় পূর্ণাঙ্গরূপে উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে।

এই চেষ্টাকে তিনটি স্তরে বিন্যস্ত করা হয়েছে বইটিতে। প্রথমভাগে তর্ক, দ্বিতীয় ভাগে বিতর্ক এবং তৃতীয় ভাগে উনিশ শতকের পাঁচটি সাময়িক পত্র থেকে কিছু প্রসঙ্গ সংকলিত হয়েছে।

প্রথম ভাগের সঙ্গে তৃতীয় ভাগের প্রকৃতিগত মিল আছে। কারণ প্রথম ভাগটিতে 'বঙ্গদূত' (১৮২৯), 'জ্ঞানান্বেষণ' (১৮৩১), 'বেঙ্গল স্পেকটেটর' (১৮৪২), 'তত্ত্ববোধিনী' (১৮৪৩), 'হিন্দু পেট্রিয়ট' (১৮৫৪-৬১), এবং 'সোমপ্রকাশ' (১৮৫৮-৬৩) পত্রিকার আলোকে উনিশ-শতকীয় তর্ক যে বাঙলার রেনেসাঁসকে কিভাবে সম্ভবপর করে তুলেছিল তার মনোযোগী আলোচনা আছে। 'বেঙ্গল স্পেকটেটর' ও 'তত্ত্ববোধিনী' আলোচনা করেছেন স্বয়ং সম্পাদক, বাকিগুলির আলোচনা করেছেন যথাক্রমে ছায়া দাশগুপ্ত, দীপিকা বসু, অমর দত্ত এবং নন্দিনী সেন। তৃতীয় ভাগে যেসব পত্রিকা থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সমাহৃত হয়েছে সেগুলি হল বেঙ্গল স্পেকটেটর, তত্ত্ববোধিনী, সোমপ্রকাশ, অমৃতবাজার পত্রিকা এবং সাধারণী। ফলে তৃতীয় ভাগটি প্রথম ভাগের পরিপূরক হয়ে উঠেছে।

এই তৃতীয় 'পরিশিষ্ট' অংশটিকে বিন্যস্ত করা হয়েছে সুপরিকল্পিতভাবে। ফলে স্বাধীনতা—আত্মিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক ; সম্প্রদায়গত—হিন্দু ও মুসলমান এবং কৃষিগত প্রশ্নে বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে। আমাদের দেশের পুরানো পত্রপত্রিকা ক্রমশ দুষ্প্রাপ্য হয়ে পড়েছে, দুষ্প্রাপ্য হয়ে পড়ছে অব্যবহার্য—এহেন সময়ে এই সংকলন যতই ক্ষুদ্রাকার হোক—সংগ্রহযোগ্য বলে মনে হয়। বিনয় ঘোষ অজস্র বাঙালি পাঠকের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়ে আছেন অন্তত এই জন্যই। বঙ্গদূত, জ্ঞানান্বেষণ, হিন্দু পেট্রিয়টের সংকলন থাকলে ভালো হত, যদিও এগুলি খুবই দুষ্প্রাপ্য। জ্ঞানান্বেষণের একটি সংকলন (মুখ্যত ইংরেজি) অবশ্য সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে ড. সুরেশচন্দ্র মৈত্রের সম্পাদনায়।

রামমোহন রায়ের কলকাতায় স্থিতিকাল (১৮১৫) থেকেই বস্তুত উনিশ-শতকীয় বাঙলার জাগরণ সূচিত হয়েছিল। তাঁর এবং তাঁকে কেন্দ্র করে রচিত পুস্তিকাবলীতে তর্ক-বিতর্কের প্রথম অধ্যায় বিধৃত হয়ে আছে। এর দ্বিতীয় অধ্যায় বিধৃত হয়ে আছে উৎকলিত পত্রপত্রিকাগুলির পৃষ্ঠাতে। প্রধানত এগুলিকে উপজীব্য করেই বিশ শতকের এই সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত কৃতবিদ্য মনীষীরা এই নবজাগরণের প্রকৃতি নির্ণয়ের নানা উদ্যোগ নিয়েছেন বিভিন্ন সময়ে। এঁদের মধ্যে সুশোভন সরকার, রমেশচন্দ্র মজুমদার, ভবানী সেন প্রভৃতিরা যেমন আছেন, তেমনি আছেন ডেভিড কফ, ব্রুমফিল্ডের মতো বিদেশীরা এবং ফ্রনটিয়ার প্রভৃতির মতো কিছু পত্রপত্রিকা।

আসলে এই বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে প্রধানত মার্কসবাদের আলোকে বিশ্বের সমস্ত আন্দোলনকে বিচার করে দেখার একটা প্রবণতা দেখা দিয়েছে। যা মার্কসীয় সূত্রের প্রতি আনুগত্য দেখায় না, মার্কসবাদীরা তাঁকে প্রগতিহীন অমূলক বলে ঘোষণা করেন। উনিশ শতকের বাঙলার জাগরণকেও এই মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার একটা চেষ্টা করা হয়েছে যেমন, তেমনি আবার ধনতন্ত্রপুষ্ট কিছু সমালোচক তাদের কৌলীন্যে অনেক কিছুকেই তাদের প্রতিষ্ঠাভূমিচ্যুত করে চলেছেন। প্রধানত এই দুই আপতন কোণিক সংগ্রামের প্রতিবাদের জন্যই এই বইয়ে 'সমমতাবলম্বী' কিছু বিশ্বজ্জনের মতামতবহ প্রবন্ধ সম্পাদক সমাহরণ করেছেন। উনিশ শতকের নবজাগরণের রঙটা 'কালো' বলে যাঁরা ঘোষণা করতে চেয়েছেন, তাঁদের প্রতিবাদের জন্যই পাঁচটি প্রবন্ধ রচনা করেছেন নির্মাল্য বাগচী, দীপিকা বসু, সুশীল জানা এবং নরহরি কবিরাজ স্বয়ং। অধ্যাপক নির্মাল্য বাগচী আলোচনা করেছেন ঔপনিবেশিক যুগে ভারতের উচ্চশিক্ষাব্যবস্থা। তিনি তাঁর আলোচনাকে বিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত বিস্তৃত করে এনে সাম্রাজ্যবাদের আসাতে ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থার চেহারাটিকে একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ দিয়েছেন। দীপিকা বসু এবং নরহরি কবিরাজ দুজনেই বাঙলার নবজাগরণের প্রকৃতিগত চেহারাটি আমাদের কাছে যথার্থভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। দীপিকা বসু অবশ্য সমালোচনার চেয়ে তথ্যকেই ভিত্তি করেছেন, সম্পাদক নরহরি কবিরাজ (যিনি ভূমিকা ছাড়া এই বইয়ে নিজের মোট চারটি প্রবন্ধ-রচনা সংযুক্ত করেছেন) সেক্ষেত্রে বিতর্কে লিপ্ত হয়ে 'বন্ধু'বেশী সমালোচকদের একহাত নিয়েছেন। তিনি বাঙলার জাগরণে ভদ্রলোকদের ভূমিকা নিয়ে দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছেন এবং তথাকথিত ভদ্রলোকদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেছেন। 'বাবু'দের নিয়ে নানা কথা লিখলেও বঙ্কিমচন্দ্রের অনবদ্য প্রবন্ধ 'বাবু' তাঁর আলোচনার পরিধিভুক্ত হল না কেন, তা অবশ্য বুঝতে পারি নি। কিন্তু তাঁর প্রবন্ধ তাঁর যুক্তিকোণ থেকে খুবই ড্যাশিং বলা যেতে পারে। সুশীল জানার প্রবন্ধটি গ্রন্থটিকে সম্পূর্ণতা দিয়েছে (যদি বঙ্কিমকে নিয়ে এমন একটি প্রবন্ধ থাকত—হলই বা তিনি হিন্দু রিভাইভ্যালিজমের পুরোধা পুরুষ)। তিনি 'রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে নবজাগরণ'কে ব্যাখ্যা করেছেন। রামমোহন রায় (রমেশচন্দ্র মজুমদার শেষ বয়সে এঁর উপর এত খড়্গহস্ত হয়েছিলেন কেন-কে জানে!), বঙ্কিমচন্দ্র, বিদ্যাসাগরকে নিয়ে রচিত ত্রিবিধ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের মতামতকে ভিত্তি করে শ্রীযুক্ত জানা এই অনুপম প্রবন্ধটি লিখেছেন এবং তাঁর মতের বিরোধিতা করতে তেমন কেউ আসবেন বলে মনে হয় না।

যেহেতু এই বইটির প্রকাশ কিছুটা উদ্দেশ্যমূলক সেহেতু উনিশ শতকের তর্কবিতর্কের প্রসঙ্গে এর তথ্যগত দিক্‌নির্দেশের সঙ্গে এর আঙ্গিকগত বিষয়গুলি আলোচিত হবার সুযোগ থাকে নি। নইলে বিধবাবিবাহ-কৌলীন্য-বহুবিবাহপ্রথা, মদ্যপান-নিবারণ আন্দোলন, জাতিভেদপ্রথা নিয়ে আলোচনার আরও কিছু অবকাশ যেমন ছিল, তেমনি বাঙলা বিতর্ক-রচনার গদ্যভঙ্গি এবং আঙ্গিক-বৈচিত্র্য নিয়েও হয়তো ভূমিকায় অন্তত উল্লেখ করার অবকাশও মিলত। তবুও সন্দেহ এবং সংশয়ের নিরসনকল্পে সম্পাদক এবং লেখকমণ্ডলী এগিয়ে এসে সজীব প্রশ্নটিকে আরও জীবিত করে উপস্থিত করেছেন সন্ধিৎসু পাঠকের কাছে। এখনও বাঙলার যথার্থ ইতিহাস রচিত হল না—এই আক্ষেপ বঙ্কিমচন্দ্রের এতকাল পরেও করতে হচ্ছে আমাদের।

বারিদবরণ ঘোষ

ব্রাত্যজনের রুদ্ধ ইতিহাস

Subaltern Studies III. Writings on South Asian History and Society. Edited by : Ranajit Guha, Oxford University Press, 1984. Rs. 135.

'সাবঅলটারন স্টাডিজ' ভারতীয় সমাজবিজ্ঞানের জগতে আর-তত-গরম-খবর নয়। আলোচ্য বইটির প্রথম খণ্ড কয়েক বছর আগেই বেরিয়ে গেছে এবং সর্বোপরি এঁদের প্রবন্ধক রনজিৎবাবুর বইটিও ('এলিমেন্টারি আসপেকটস অফ পিজান্ট ইনসারজেনসি ইন কলোনিয়াল ইনডিয়া, ১৯৮৩) বেরিয়ে গেছে বছর দুয়েক আগে।

নিম্নবর্গবাদী এই ঐতিহাসিকদের বিশেষত্ব হল তাঁদের তত্ত্বমুখাপেক্ষিতা, একটি বিশেষ ইতিহাসের তত্ত্ব মাথায় রেখে দলিল-জিজ্ঞাসায় রত হওয়া, এবং "ইতিহাস হল তথ্যজিজ্ঞাসা"—এইরকম শিশুসারল্যোপম এমপিরিসিজমকে সরাসরি নাকচ করা। দলিল-জিজ্ঞাসা অর্থাৎ দলিল (ডকুমেনট) কিভাবে পড়তে হবে তার সন্ধান এঁদের ইতিহাসজিজ্ঞাসার অনেকটা জুড়ে থাকে। পুরোনো ইতিহাস দলিলে-পাওয়া তথ্যের সহায়তায় অতীতের পুনর্গঠন করতে চায়, নতুন ইতিহাস দলিলের ভেতর থেকে কাজ করে, বিবিধ বিন্যাসে দলিলকে সাজায়, দলিলের মধ্য থেকে খুঁজে বের করে ইউনিট (যেমন পুরোনো ইতিহাস ইউনিট বলতে কেবল অঞ্চল বা সাময়িক ইউনিট বোঝে : চতুর্দশ লুই-এর কাল, মারিয়া থেরেসার রাজত্বকালের অসট্রিয়া ইত্যাদি ; নতুন ইতিহাস দলিলের মধ্য থেকে নতুন ইউনিট সংজ্ঞায়িত করে ঃ ফিউডালিজম্‌-ব্লক, বা "ভোগ"-এর ইতিহাস—জ' র‍্যাদ্রীয়ার, শাস্তির ইতিহাস—ফুকো, ঘাড় ব্যব-

হারের ইতিহাস—ই. পি. টমসন, দামের ইতিহাস—লাব্রুস, সোনার ইতিহাস—ভিলার, প্রাচ্য-নামক ধারণাটির ইতিহাস—এডওয়ার্ড সেইদ ইত্যাদি)। দলিলের মধ্য থেকেই সংজ্ঞায়িত হয় সময়ের অক্রমিকতা, অসম বিকাশ। অর্থাৎ, নব্য বিচারে দলিল আর নিছক ইতিহাস রচনার ছেনি-হাতুড়ি নয়, ইতিহাস মানে কেবল বিস্মৃত অতীতকে স্মৃতিতে ফিরিয়ে আনা নয়, হারানো সময়ের পুনরুদ্ধার নয়, বরঞ্চ ইতিহাস হল সেই অনেকগুলি উপায়ের মধ্যে একটি যার দ্বারা সমাজ তার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত দলিলগুলিকে স্বীকার করে, সেগুলির বিকাশ ঘটায়। মিশেল ফুকোর ভাষায়, পুরোনো ইতিহাস অতীতের 'মনুমেন্ট'গুলিকে মুখস্থ করতে চায় আর নতুন ইতিহাস দলিলকেই মনুমেনটে পর্যবসিত করে।

রণজিৎবাবুরা আবার মার্কসবাদীও বটেন। তবে তাঁরা লেনিন পড়েন না, গ্রামচি পড়েন। একটি কৃষিপ্রধান দেশের ঐতিহাসিকের মার্কসবাদী হওয়ার কতকগুলি অসুবিধা রয়েছে। প্রথমত, বিপ্লবী মার্কসিসট প্র্যাকসিস ঐতিহাসিকভাবে উন্নত মূলধনী সমাজের প্রলেতারিয়েতের 'আইডিয়লজি'। তাই মার্কসের জিজ্ঞাসার কেন্দ্রে থাকে মূলধন, মূলধনতন্ত্র। ফরাসি দেশের ইতিহাস-সংক্রান্ত লেখাগুলিতে ক্ষুদ্র উৎপাদক আর চাষীদের প্রতি মার্কসের কটাক্ষ এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। মার্কসিসট ক্যাটেগরিগুলির ফ্রেমে একটি কৃষিপ্রধান সমাজব্যবস্থাকে ভাবাটা এখনও সমস্যাসঙ্কুল। লেনিনের একটি সমাধান রয়েছে : সাম্রাজ্যবাদ মূলধনতন্ত্রকে বিশ্বজোড়া আধিপত্য এনে দেয়। অতএব একটি আপাত প্রাক্‌-মূলধনতান্ত্রিক দেশ ততটাই বিশ্ব-মূলধনতন্ত্রের অঙ্গ যতটা হল শিল্পোন্নত দেশগুলি। সেক্ষেত্রে, পার্থক্যটা খোলসের, মজ্জার নয়। অসম উন্নয়নই যদি মূলধনতন্ত্রের মুখ্য বৈশিষ্ট্য হয় তবে শেকলের সবচেয়ে দুর্বল গিঁটটিতেই আঘাত হানতে হবে—শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে, শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীর ভিত্তিতে, প্রবুদ্ধ ভ্যানগার্ডের পরিচালনায় অনুন্নত দেশগুলিতেই বিপ্লব হবে। স্পষ্টতই কৃষকের ভূমিকা এক্ষেত্রে হবে প্যাসিভ। 'এইটিনথ ব্রুমেয়ার' আর "রাশিয়ার মূলধনতন্ত্রের বিকাশ'—এ দুটি একই লোকের লেখা হতে পারত। নতুনত্ব বরঞ্চ রয়েছে মাও সেতুঙে। তিনি কার্যত চাষিকেই মুখ্য ভূমিকা দেন, গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরার কথা বলেন, জাতীয়-মুক্তিসংগ্রামোত্তর 'নয়া গণতন্ত্র' প্রতিষ্ঠায় অভিলাষী হন। অবশ্য মাও-এর কনজাঙচার-এর মধ্যে এমন অনেক কিছু রয়ে গিয়েছিল, এমন অনেক সমস্যা ছিল যা ধ্রুপদী মার্কসবাদকে কখনই বাস্তব সমস্যা হিসাবে ভাবতে হয় নি ; যেমন অপরিণত শ্রমিকশ্রেণী, জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের সমস্যা, অনগ্রসর কৃষকসমাজ এবং এসবের পশ্চাৎপট হিসাবে চীনের মতো একটি প্রাচীন, এশিয়াটিক সমাজব্যবস্থা। অপর পক্ষে, গ্রামচিকে বোঝার আমাদের অনেক অসুবিধা রয়েছে। প্রথমত, তাঁর অনূদিত লেখাপত্র স্বল্প। দুই, যা আছে তার অনেকটা আবার জেল-ডায়েরির শৈলীতে লেখা—তাত্ত্বিক ডিসকোরস নয়। রণজিৎবাবুরা আবার তার যে অংশটি ক্যাপিটালাইজ করেন তার ব্যাপ্তি একশ পাতারও কম। খুব সংগতভাবেই প্রশ্ন করা চলতে পারে, গ্রামচির কী ওয়ার্ডস যেমন, সিভিল সোসাইটি, সাবঅলটারন/এলিট, প্যাসিভ রেভলিউশন—এগুলি কি 'নোশন' না 'কনসেপ্ট' (আলতুসের অর্থে)। পেরি এনডারসন মহাশয় 'অ্যানটিমনিজ অব আন্তোনিও গ্রামচি' (নিউ লেফট রিভিউ, ১৯৭৫) প্রবন্ধে দেখিয়েছেন যে গ্রামচির চিন্তনের চাবিকাঠি হিসাবে যে শব্দগুলি গ্রাহ্য হয়েছে, গ্রামচির লেখাতেই সেগুলির একাধিক অর্থভেদ করা যায়। গ্রামচিকে ছোটো করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমরা শুধু বলতে চাই, গ্রামচিকে ধর্মগ্রন্থের মতো না পড়ে, রণজিৎবাবুরা যেভাবে দলিল পড়েন, সেভাবে পড়া দরকার।

প্রাক্‌-মূলধনতান্ত্রিক সমাজকে আর এক ধরনের মার্কসবাদীরাও বিশ্লেষণ করেন। এঁরা হলেন পেশাদার নৃতত্ত্ববিদ। ভারতের ইতিহাস-আলোচনায় সেই বিশ্লেষণগুলি কাজে লাগানো যেতে পারে। একমাত্র পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের ব্যতিক্রম বাদ দিলে রণজিৎবাবুরা এ-বিষয়ে খুব উৎসাহী নন বলেই মনে হয়। আমি বলতে চাইছি যে 'লেনিন নারোদনিক' প্রবলেমাটিকটি মার্কসীয় সমাজবিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে অতিক্রম করা হয়ে গেছে। আর সোস্যুর-প্রভাবিত সেমিওলজির টারম ব্যবহার করাটা খুব নতুনত্ব হতে পারে কিন্তু মানবিক সমাজ আর সম্পর্ক তো ভাষার (লাঙ্গ) মতো প্যাসিভ চিহ্নবিদ্যা নয়। বিশেষত রণজিৎবাবুদের প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য হল 'পাওয়ার' অর্থাৎ ক্ষমতাকে জ্ঞানগম্য করা, (মার্কসীয় চিরাচরিত 'স্ট্রাকচারের' বদলে 'ইভনট'কে বিশ্লেষণ করা)। এখন, সেটা করতে গিয়ে তাঁরা একটি মানবতাবাদী, প্রায় সেনটিমেনটাল প্যারাডাইমের আশ্রয় নিচ্ছেন। স্ট্রাকচারালিসটরা 'স্ট্রাকচার' নিয়ে যে কেচ্ছাটা করেছেন, 'ইভনট' নিয়ে আবার সেরকমটা করার কোনো মানে হয় না। সবকিছুকেই ইভনট-এর লেভেলে ঠেলে দিলে, এটা না বুঝলে যে সব ইভনট-এর গুরুত্ব সমান নয়, যে ইভনটদেরও একটা হায়ারারকি আছে—স্ট্রাকচারালিসটদের ভুলটা আবার করা হবে।

রণজিৎবাবুরা চলতি ভাষার বাইরে আর-এক জীবনের কথা বলে সেটাকেই যদি একটা নতুন ভাষা বানিয়ে বসেন তবে তা খুবই দুঃখের হবে। ওঁরা ফুকোর এই কথা মনে রাখলে ভালো করবেন :

"...What we have to use as a point of reference is not the model of language or of the sign but war or battles. The historic force which propels and determines us is in fact warlike ; it is not concerned with language. It is the relation of power, not the relation of meaning that is important. History has no meaning....... It ......should be analysed .....in terms of the understanding of battles, struggles and tactics. Neither dialectic (as the logic of contradiction), nor semiology (as the structure of communication) can account for the intrinsic intelligibility of confrontation. This intelligibility, 'the dialectic', 'the dialectic' 'the dialectic' is a way of evading reality which is always risky and unprotected, by tying it down to the hegelian skeleton ; and 'semiology' is a way of evading its violent, bloody, mortal nature, by tying it to the calm, platonic form of language and dialogue."

('আর্ক' এ ১৯৭৭-এ প্রকাশিত একটি ইন্টারভিউ থেকে)।

এবার বইটির কথায় আসা যাক। মোট সাতটি প্রবন্ধ রয়েছে। প্রথমেই শহীদ আমিনের লেখাটির কথা বলতে হয়। উত্তরপ্রদেশের (১৯২০-২১) নিম্নবর্গের চাষিদের চেতনায় গান্ধীজি কিভাবে মহাত্মা হিসাবে প্রতিভাত হয়েছেন—সেটাই লেখাটির বিষয়। লেখক স্পষ্টভাবে সাবঅলটারন আর এলিট—এই দুই চেতনার পরিমণ্ডলকে চিহ্নিত করেছেন। এলিট-চেতনায় গান্ধী রাজনীতিবিদ, নেতা অর্থাৎ সংগঠিত রাজনীতির একজন কেষ্টবিষ্টু। বিপরীতে নিম্নবর্গের চেতনায় গান্ধী প্রতিভাত হচ্ছেন পয়গম্বর, অবতার, অলৌকিকক্ষমতাসম্পন্ন সাধু বা ত্রাতা-রূপে। আঞ্চলিক সংবাদপত্রের ভিত্তিতে পরিশ্রমসাধ্য গবেষণা করে লেখক দেখাচ্ছেন যে, সাবঅলটারন/এলিট—এই দুই বর্গের সমান্তরালে রয়েছে এদের দুই চেতনার জগৎ। এলিট-চেতনার সঙ্গে যোগ রয়েছে সংগঠিত রাজনীতির : ভোটের, বিবিধ অর্থনৈতিক দাবিদাওয়ার ; অপর পক্ষে, সাবঅলটারন চেতনাকে অসংগঠিত রাজনীতির ক্ষেত্র বলা যাক। সেখানে অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও আইডিয়লজিক্যাল ক্ষেত্রগুলি কিন্তু আলাদা-আলাদা ভাবে প্রোচ্চারিত নয়—পরস্পরের সঙ্গে এমনভাবে মিশে রয়েছে যে একটা থেকে আর-একটাকে আলাদা করা সম্ভব নয়। গান্ধীর রাজনৈতিক এবং নৈতিক অনুশাসনগুলি সেখানে সম্পূর্ণ অন্যতর ডাইমেনশন পাচ্ছে—সেগুলির অনেকগুলির নৈতিক ভিত্তি চলে গিয়ে ম্যাজিক আর রিচুয়ালে পরিণত হচ্ছে, এবং গান্ধী প্রায় এক ব্ল্যাক ম্যাজিশিয়ান, ওঝা আর সুপারম্যান-এ পর্যবসিত হচ্ছেন। লেখক আমাদের ধন্যবাদার্হ, কেননা তিনি প্রথমেই সাবঅলটারন চেতনা'র একটি এমপিরিকাল, তথ্যভরতি ইমেজ হাজির করেছেন।

এর পর 'সাবঅলটারন রাজনীতি'-কে আর একটি বিমূর্ত তাত্ত্বিক ধারণা বলে মনে হয় না, ব্যাপারটা বেশ একটা রক্তমাংসের রূপ পায়। যেহেতু সাবঅলটারন চেতনার ক্ষেত্র সংগঠিত রাজনীতির ক্ষেত্রের থেকে অটোনমাস, তাই গান্ধীর মেসেজ-এর ফরম আর কনটেনট দুটোই অনেকটা পরিবর্তিত হয়ে সাবঅলটারন চেতনায় এসেছে। রাষ্ট্রযন্ত্র তথা জমিদারের বিরুদ্ধে তার ন্যায্য বিক্ষোভের বহিঃপ্রকাশের মাধ্যম হিসাবেও সে তাই 'গান্ধী' মিথটিকে ব্যবহার করেছে। গান্ধীপুজো করার অর্থ দাঁড়িয়েছে শোষণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর সংকল্প গ্রহণ—গান্ধীর অহিংসা-সংক্রান্ত সূক্ষ্ম, নৈতিক রেটোরিকের কোনো প্রেরণা তাই তার কাছে নেই। এর ফলাফল হয়েছে চৌরিচৌরার হিংসাত্মক ঘটনা, যাতে গান্ধী কেঁপে উঠেছিলেন।

চটকল-শ্রমিকের আন্দোলন (১৯২০-৫০) নিয়ে দীপেশ চক্রবর্তীর লেখাটিও চমৎকার। শ্রমিকদের তীব্র জঙ্গি মনোভাব সত্ত্বেও কেন কোন শক্তিশালী ট্রেড-ইউনিয়ন আন্দোলন গড়ে ওঠে নি—দীপেশবাবু এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছেন। তিনি বলছেন যে, ট্রেড-ইউনিয়ন, কনট্রাক্ট এগুলি হল মূলধন-শাসিত রাষ্ট্রকাঠামোর আওতায় গড়ে ওঠা ধারণা যার সঙ্গে সংগঠিত, বৈধ রাজনীতির ধারণা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। চটকল-শ্রমিকের চেতনাকে এই স্তরে তুলে নিয়ে আসাটা ছিল সংগঠকদের কাজ। বামপন্থী সংগঠকরা তাঁদের ভদ্রলোকি, বাবু রাজনীতির গন্ডির মধ্যে থেকে সেটা করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। বস্তুতপক্ষে, তাঁদের দৃষ্টিকোণের মধ্যে রয়ে গিয়েছিল গরিব মানুষের দুঃখ-নিবারণের অ্যামেচারিজম, 'শহিদ' সাজার গ্রাম্যতা। উদাহরণস্বরূপ, জনৈক সংগঠক তাঁর নির্বাচনী ইশ্‌তেহারে ফলাও করে লিখলেন যে, তিনি খুব বড়োলোকের ছেলে, তাঁর বিলিতি ডিগ্রি রয়েছে, তিনি কৃচ্ছ্রসাধনের রাস্তা বেছে নিয়ে শ্রমিক-মঙ্গলের জন্যই ট্রেড-ইউনিয়ন আন্দোলনে এসেছেন। এই মনোবৃত্তি হচ্ছে ফিউডাল মনোবৃত্তি, এবং এ থেকে বড়োজোর যা আসতে পারে তা হল নেতাপুজো, ব্যক্তিগত আনুগত্য—শ্রেণীসচেতনতা নয়। ভদ্রলোক নেতারা যে এলিট/সাবঅলটারন দ্বিত্ব ভেঙে বেরুনোর কথা বলতেন, যে সাম্যের কথা বলতেন, নিজস্ব চেতনায় তাঁরা সেই সাম্যের ধারণায় পৌঁছুতে পারেন নি—বোধ হয় ঠিকভাবে চেষ্টাও করেন নি। ব্যাপারটা নিছক শৌখিন মজদুরি রয়ে গেছে। শ্রমিকেরা নেতাকে ত্রাতা ভেবেছে, ধর্মঘট করেছে, কিন্তু নতুন কোনো চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয় নি। দীর্ঘস্থায়ী, সংগঠিত কোনো আন্দোলনও গড়ে ওঠে নি। দীপেশবাবুর বিশ্লেষণ সম্ভবত আজকের ভারতবর্ষেও প্রযোজ্য।

উত্তরপ্রদেশের মুবারকপুরের আঞ্চলিক ইতিহাস সংক্রান্ত জ্ঞান পান্ডের লেখাটি গুরুত্বপূর্ণ। মুবারকপুরের তিনটি 'ইতিহাস', তিনি বিশ্লেষণ করেছেন—প্রথমটি 'সরকারি' ইতিহাস, দ্বিতীয়টি একজন আঞ্চলিক এলিটের

লেখা, এবং তৃতীয়টি একজন গরিব তাঁতির। বিশ্লেষণ থেকে এই সত্য পরিষ্কারভাবে উঠে আসছে যে 'ফ্যাকট' বলে ইন-ইটসেলফ কিছু নেই, ঐতিহাসিকের আইডিয়লজিক্যাল প্র্যাকটিস দিয়েই ফ্যাকট তৈরি হয়। সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থান দিয়েই নির্দিষ্ট হয় ঐতিহাসিকের বক্তব্য। জ্ঞান পান্ডের গবেষণা আর দলিলজিজ্ঞাসার পদ্ধতি প্রশংসনীয়, কিন্তু তাঁর মধ্যে একটু অতিসরলীকরণের প্রবণতা রয়ে গেছে। যেমন সাবঅলটারন এবং এলিট—উভয় মানসেই সাম্প্রদায়িক পারসেপশন প্রায় একই রকম কেন, এই ব্যাপারটা তিনি খুব ভালোভাবে বিশ্লেষণ করেন নি। তবে তাঁর মতো তরুণ গবেষক অবশ্যই এসব ত্রুটি ভবিষ্যতে কাটিয়ে উঠবেন।

সুমিত সরকারের লেখাটি বাঙলার স্বদেশী আর অসহযোগ আন্দোলনের সময়কার সাবঅলটারন রাজনীতি বিষয়ে। এ সম্পর্কে তিনি আগেও লিখেছেন। দলিল হিসাবে সরকারি নথিপত্র, খবরের কাগজ, ডায়েরি ও কয়েকটি সাহিত্যকর্মকে ব্যবহার করেছেন। সঙ্গে সাবঅলটারন রাজনীতি সম্বন্ধে একটি সুপাঠ্য তাত্ত্বিক আলোচনাও রয়েছে। তবে সমগ্র বাঙলা নিয়ে লিখলে ব্যাপারটা অনেক বিস্তৃত হয়ে পড়ে, এবং সেক্ষেত্রে গুটিকতক 'সাধারণভাবে সত্য' গোছের সিদ্ধান্ত টানতে হয়। বরঞ্চ ক্ষেত্র আরো সীমাবদ্ধ আর ছোটো করলে এবং আঞ্চলিক দলিলগুলিকে (যার অনেকগুলোই খুঁজে বের করতে হবে), নিবিড়ভাবে ব্যবহার করলে আরো অর্থপূর্ণ সিদ্ধান্তে পৌঁছুনো যায়। মৌখিক ইতিহাসকে এঁরা কেউ দলিল হিসাবে ব্যবহার করার কথা ভাবেন নি কেন কে জানে। বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চলের মাইক্রো-ইতিহাসের প্রয়োজন আজ সত্যিই অনুভূত হচ্ছে।

বইটিতে একমাত্র পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের প্রবন্ধটি (গান্ধী অ্যানড দ্য ক্রিটিক অব সিভিল সোসাইটি) সরাসরি 'সাবঅলটারন' থিমটির সঙ্গে যুক্ত নয়। গান্ধীকে নিয়ে মার্কসবাদী তাত্ত্বিকেরা অতি অল্পই ভেবেছেন। সে হিসাবে লেখাটি একটি নতুন দিগন্ত খুলে দিল।

প্রবন্ধটি শুরু হচ্ছে এডওয়ার্ড সেইদের "ওরিয়েনটালিজম" নামক বইটির একটি ছোট্ট আলোচনা দিয়ে। এনলাইটনমেনট-উত্তর য়ুরোপের প্রাচ্যতত্ত্ববিদরা (রেনাঁ, স্যাসি, শাতো ব্রিয়ঁন, তোফয়েল গোতিয়ে) প্রাচ্যনামক একটি মিথ তৈরি করেছিলেন। তাঁদের 'প্রাচ্যতত্ত্বে' প্রাচ্যের একটি বিকৃত রূপ পাই। এই প্রাচ্যতত্ত্বের তাত্ত্বিকদের 'প্রাচ্যে'র মানুষ যেন প্রতীচ্যের মানুষ থেকে অন্যরকম (যেমন আরবের লোকেরা স্বভাবতই বর্বর, ভারতীয়রা স্বভাবতই ধর্মভীরু); প্রাচ্যের ইতিহাস-সমাজ-ধর্ম-সংস্কৃতি-জীবনযাপন শুধু প্রতীচ্যের থেকে আলাদা নয়, তা একেবারেই অন্য রকমের, অন্য ধরনের। যেন প্রাচ্য প্রতীচ্য দুটি আলাদা জগৎ। প্রাচ্যের ইতিহাসে নাকি কোনো বিবর্তন নেই, প্রাচ্যের সমাজ-অর্থনীতি সেই প্রাচীন কাল থেকে নাকি একই জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। এই প্রাচ্যের ইতিহাসকে গতিশীল করার জন্য তাহলে সাম্রাজ্যবাদের ঐতিহাসিক প্রয়োজন রয়েছে। সাম্রাজ্যবাদ তাহলে আসলে প্রাচ্যের মানুষকে বিশ্বের ইতিহাসের বিকাশের মূলধারার মধ্যে এনে প্রাচ্যের মানুষের উপকারই করেছে।

এখন, একটা আশ্চর্যের ব্যাপার হল এই যে, আমাদের জাতীয়তাবাদী চিন্তন কিন্তু প্রাচ্য তথা ভারতবর্ষ সম্পর্কে ওরিয়েনটালিজম-এর এই তাত্ত্বিক ফ্রেমওয়ার্কটি মেনে নেয়। আমাদের জাতীয়তাবাদী চিন্তনের উত্থানের সঙ্গে এসেছিল হিন্দু পুনরুত্থানবাদ এবং সংস্কৃতায়নের আন্দোলন। এসবের হোতারা (উমেশচন্দ্র, রামমোহন, বঙ্কিম, দয়ানন্দ সরস্বতী, বিবেকানন্দ, টিলক ইত্যাদি) যে ভারতবর্ষকে আইডিয়ালাইজ করেছেন, সেই তপোবনঘেরা, ছায়াসুনিবিড়, বর্ণাশ্রমভিত্তিক, শাশ্বত-সনাতন, ধার্মিক, কৃষিভিত্তিক গ্রাম্য সমাজ—এটা একদম প্রতীচ্যের ওরিয়েনটালিসটরা যে মিথ্যে-প্রাচ্যের কথা বলতেন, তার ট্রু-কপি। শুধু একটি পার্থক্য! জাতীয়তাবাদীরা এই ঐতিহাসিক স্থবিরতা, জড়ত্ব, এই মানবেতর অবস্থাকে (তথ্য হিসাবে যেটা সম্পূর্ণ মিথ্যে) প্রাচ্যের মহত্ত্বের আর শ্রেষ্ঠত্বের লক্ষণ বলে চালাতে চান এবং ইচ্ছাটা এরকম যেন ব্রিটিশ-প্রবর্তিত সমস্ত নিয়মকানুন যা গ্রাম্য-সমাজকে ভেঙে দিচ্ছে, সেসব উঠে যাক। আমরা আবার সেই স্বাস্থ্যকর, আদিম, সরল, "হিন্দু" ধর্মযুগে ফিরে যাই। এইভাবে, শাসকের তত্ত্বকে তাত্ত্বিকভাবে মেনে নেওয়ায় আমাদের জাতীয়তাবাদী চিন্তনের গোড়াতেই গলদ রয়ে গেছে এবং সেজন্যই সম্ভবত এই এলিট-জাতীয়তাবাদী চিন্তন আজও একটি যথার্থ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সাংস্কৃতিক হেগেমনি গড়ে তুলতে পারে নি। হয়তো নিছক জাতীয়তাবাদের তাত্ত্বিক কাঠামোয় ব্যাপারটা অসম্ভবও বটে।

এখন, গান্ধী একই সঙ্গে এই এলিট-জাতীয়তাবাদী চিন্তনের বিপরীতে একটি 'আইডিয়লজি' গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন যা জনগণকে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী লড়াইতে শামিল করেছিল এবং তা আবার এলিট নেতৃত্বের আওতাতেই সম্ভব হয়েছিল। তা হলে প্রশ্ন হল: (১) এলিট-জাতীয়তাবাদের সঙ্গে গান্ধীবাদের দূরত্ব কতটা, (২) এনলাইটনমেনট-উত্তর লিবারেল মানবতাবাদের সঙ্গে গান্ধীবাদের কী সম্পর্ক, এবং (৩) সাবঅলটারন চেতনার সঙ্গে গান্ধীর প্রবলেমাটিকের ইনটার‍্যাকশন কোন্ কোন্ বিন্দুতে? প্রশ্নগুলি কেবল তাত্ত্বিক প্রশ্ন নয়, রিয়েলপলেটিক তথা পাওয়ারের প্রশ্নও বটে। পার্থবাবু যে সবকটি প্রশ্নেরই উত্তর দিয়ে ফেলেছেন এমন নয়; তবে এটা তিনি পরিষ্কার দেখিয়েছেন যে আইডিয়লজি হিসাবে লিবারাল মানবতাবাদ থেকে গান্ধীবাদ জ্ঞানতত্ত্বগতভাবেই ভিন্ন এবং তার একটি পালটা, প্রতিবাদী, র‍্যাডিকাল 'ক্রিটিক'। আমাদের র‍্যাডিকাল মার্কসবাদীদের কাছে এই সত্য বোধ হয় খুব সুস্বাদু ঠেকবে না। আর এলিট-জাতীয়তাবাদের সঙ্গে গান্ধীর সম্পর্ক অ্যামবিভায়ালেন্সের — রিয়েলপলেটিকে উভয়ের সম্পর্ক থেকেই এটা প্রমাণ হয়েছে। তা ছাড়া ওরিয়েনটালিজম-এর তাত্ত্বিক কাঠামো উভয়ের ক্ষেত্রেই উপস্থিত। গান্ধীবাদের অ্যামবিগুইটি, প্যারাডকস এখানেই। পার্থবাবু গান্ধীর তাত্ত্বিক বিবর্তন সুন্দরভাবে দেখিয়েছেন। গান্ধীকে, গান্ধীর সিচুয়েশনকে, গান্ধীর তত্ত্বের জটিলতা আর স্ববিরোধকে সর্বপ্রথম মোহমুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখার জন্য লেখক অভিনন্দনীয়।

ডেভিড আর্নল্ড আর ডেভিড হার্ডিম্যানের প্রবন্ধ দুটি সাবঅলটারন থীমের অন্তর্ভুক্ত হলেও, রণজিৎবাবুর সাবঅলটারন প্যারাডাইম দ্বারা তাঁরা খুব প্রভাবিত বলে মনে হল না। নিম্নবর্গের মানুষকে নিয়ে লিখলেই 'নিম্নবর্গের ইতিহাস' হবে, এরকমটা নয়। আরনলড আর হার্ডিমানের পান্ডিত্য আর নিষ্ঠা সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই, কেবল এগুলিকে 'সাবঅলটারন স্টাডিজ' বললেই আপত্তি ওঠে। তাঁদের গুজরাতের দেবী-আন্দোলনের এবং দাক্ষিণাত্যের কৃষকের দুর্ভিক্ষচেতনার বিশ্লেষণ বেশ দূর-থেকে-করা, ক্লিনিক্যাল রিপোর্ট বলে মনে হয়—নিম্নবর্গের ঐতিহাসিকের কমিটমেনট এখানে নেই।

ভাস্কর মুখোপাধ্যায়

কালের দর্পণে প্রতিফলিত পূর্ণাবয়ব নজরুল

সমকালে নজরুল ইসলাম—মুস্তাফা নূরউল ইসলাম। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা। বিরাশি টাকা।

বাঙলা সাহিত্যের অঙ্গনে আবির্ভাবমাত্রই আলোড়নসৃষ্টি, সমকালীন যুগে তথা জাতীয় জীবনে ঝঞ্ঝার মতো প্রচণ্ড উপস্থিতি এবং অকস্মাৎ স্তিমিত হয়ে যাওয়া—কবি নজরুল ইসলামের জীবনের এই নাটকীয় অধ্যায়ের বিস্তার ১৯২০ থেকে ১৯৪২ পর্যন্ত মাত্র বাইশ বছর। যবনিকাপাতের পরেও এই পরাক্রান্ত জীবননাট্যের রেশ জনমানসকে আলোড়িত করেছে আরো কয়েক বছর—১৯৫০ সাল পর্যন্ত। এই সময়সীমার মধ্যে নজরুল ইসলাম দেশের অসংখ্য ছোটো-বড়ো পত্রপত্রিকায়, বক্তৃতায়, চিঠিপত্রে, স্মৃতিকথায় যেভাবে প্রতিফলিত হয়েছেন, যতভাবে প্রশংসিত, নিন্দিত এবং বিতর্কিত হয়েছেন তার যাবতীয় তথ্য কালানুক্রমিক ধারায় আলোচ্য গ্রন্থে এমনভাবে সংকলিত হয়েছে যা পাঠ করতে-করতে নাট্যদর্শনের মতোই দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে পোঁছে যেতে হয়। সমগ্র গ্রন্থপাঠ শেষ হলে এমন উপলব্ধি অনায়াসেই মনে আসে—কালের দর্পণে প্রতিফলিত এই হচ্ছে পূর্ণাবয়ব নজরুল।

ঢাকার শিল্পকলা একাডেমীর ব্যবস্থাপনায় সুযোগ্য গবেষক ড. মুস্তাফা নূরউল ইসলাম যে অপরিমেয় শ্রম- এবং কঠোর অধ্যবসায় -সহকারে এই বিপুল তথ্যসম্ভার সংগ্রহ করে আলোচ্য গ্রন্থে পরিবেশন করেছেন এবং পরিবেশনের সময় যে মুনশীয়ানা দেখিয়েছেন তাতে ঐতিহ্যসচেতন বাঙালিমাত্রেই তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ বোধ করবে।

১৯১৯ সালে করাচী-প্রবাসী ব্যাটালিয়ান কোয়ার্টার মাস্টার হাবিলদার নজরুল ইসলাম বাঙলা সাহিত্যক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অবজ্ঞাত ব্যক্তি। সওগাত পত্রিকায় তাঁর নাম প্রথম প্রকাশিত হয় এই পত্রিকার কিছু গ্রাহক সংগ্রহ করে দেওয়ার সূত্রে। এই সালেই প্রবাসী নজরুলের কিছু কিছু লেখা কলকাতার কয়েকটি পত্রপত্রিকায় ছাপা হয়। ১৯২০ সালের মার্চ মাসে ৪৯ নং বেঙ্গলি পলটন ভেঙে দেওয়ার পর নজরুল যখন স্থায়িভাবে কলকাতায় চলে এলেন ততদিনে লেখক হিসেবে তাঁর কিছুটা পরিচিতি হয়েছে। তাঁর প্রথম প্রকাশিত কবিতাই সেকালের প্রভাবশালী সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতির মনোযোগ আকর্ষণ করে। তিনি তাঁর 'সাহিত্য' পত্রিকায় নজরুল সম্পর্কে মন্তব্য করেন, 'ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার আশাপ্রদ আভাষ আছে'। এই মন্তব্য প্রকাশের ছ-সাত মাসের মধ্যে প্রবাসী নজরুল কলকাতাবাসী এবং যথার্থ অর্থে তাঁর লেখকজীবনের সূত্রপাত। ১৩২৭-এর বৈশাখ (১৯২০, এপ্রিল) থেকে 'মোসলেম ভারত' পত্রিকার তিনি নিয়মিত লেখক—অগ্রহায়ণের মধ্যে প্রকাশিত হল ধারাবাহিক পত্রোপন্যাস 'বাঁধনহারা', কবিতা 'সাত-ইল্-আরব', 'বাদল-প্রাতের শারাব', 'খেয়াপারের তরণী', 'কোরবাণী', 'মোহররম', 'ফাতেহা-ই-দোয়াজ্-দহম'। মাত্র এই কয়টি রচনার জোরেই বছর না ঘুরতেই বাঙলা সাহিত্যের ভুবনে নজরুল ইসলাম একটি বিখ্যাত নাম। এই হচ্ছে কবির নাটকীয় আবির্ভাবপর্ব। এরপরই বাঙলার আকাশ-বাতাস মথিত হয়ে ওঠে কবির সৃজনী প্রতিভার ঘূর্ণীবেগে। বড়ো, ছোটো, প্রগতিশীল, প্রতিক্রিয়াশীল—নানারকম পত্রপত্রিকায় নজরুলকে নিয়ে আলোচনা, বিতর্ক, নিন্দা আর

প্রশংসার ঝড় বয়ে যেতে থাকে। এই ঝড়ের পূর্বাভাস বেগসঞ্চার, উদ্দামতা : অকস্মাৎ কবি জীবন্মৃত হয়ে পড়ায় স্তিমিত রূপ ধারণ—এর যাবতীয় তথ্যই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ড. নূরউল ইসলাম এমনভাবে অনুসরণ করেছেন যাতে এই ঝঞ্ঝার প্রচণ্ড বেগ অনুভব করা যায়। তাই এমন একটা তথ্যবহুল আকর-গ্রন্থ পাঠ করার সময়েও এর গতিময়-তায় তন্ময় হয়ে থাকতে হয়।

এই গ্রন্থে পরিবেশিত তথ্যে সম-সাময়িক যেসব ব্যক্তিকে নজরুলপ্রতি-ভার মূল্যায়নে প্রয়াসী হতে দেখা যায় তাঁরা সঠিক অথবা বেঠিক মূল্যায়ন করেছেন—এইরকম কোনো বিতর্কের মধ্যে না গিয়ে বলা যায় নজরুলকে কেন্দ্র করে সেই সময়ের বিভিন্ন দৃষ্টি-ভঙ্গির মানুষেরা যে ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছেন তার দ্বারা উল্লেখিত সময়সীমার সমাজমানসের সামগ্রিক অবয়বটাই যেন আভাসিত হয়ে ওঠে। সেই কারণেই এই পুস্তকে পরিবেশিত তথ্যসম্ভার পূর্ণাঙ্গ নজরুলজীবনী রচনার মাল-মশলা মাত্র না হয়ে এটি হয়ে উঠেছে একটি যুগের সমাজ-মনকে অনুধাবন করার পক্ষেও একখানি আকরগ্রন্থ।

গ্রন্থটির ছাপা, বাঁধাই, প্রচ্ছদ সব-কিছুতেই সমধিক যত্ন আর পারিপাট্যের ছাপ পরিস্ফুট। এই পুস্তকে পরি-বেশিত হয়েছে নজরুল-সমসাময়িক-কালের কতিপয় গুণী মানুষের অতি দুষ্প্রাপ্য ছবি, যা এর বাড়তি আকর্ষণ। প্রচ্ছদে শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী-অঙ্কিত নজরুল-প্রতিকৃতিতে রূপ পেয়েছে তরুণ কবির বিশেষ মুড যা মর্মস্পর্শী।

আবদুর রউফ

বাংলাদেশের চিত্রশিল্প

সম্প্রতি শিল্পকলা একাডেমীতে অনুষ্ঠিত হয়েছে সপ্তম জাতীয় চারুকলা প্রদর্শনী। বাংলাদেশের আধুনিক চিত্র-শিল্পের প্রসঙ্গ উঠলেই যাঁর নাম উচ্চারিত হয় তিনি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন (২৯ ডিসেমবর ১৯১৪—২৮ মে ১৯৭৬)। ১৯৩৮ সালে কলকাতা সরকারি স্কুল অব আর্টস থেকে তিনি পাশ করেন। মহাযুদ্ধকালীন তের শ পঞ্চাশের মন্বন্তরের ছবি এঁকে চল্লিশের দশকে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। ৪৭-উত্তরকালে তাঁর প্রাণপণ চেষ্টায় প্রতি-ষ্ঠিত হয় ঢাকা চারুকলা বিদ্যালয়, যা পরবর্তী কালে চারু ও কারু মহাবিদ্যালয় এবং বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত চারুকলা ইনসটিটিউট নামে পরিচিত। আজকের বাংলাদেশের প্রধান শিল্পীদের প্রায় সকলেই এই প্রতিষ্ঠানের ছাত্র অর্থাৎ জয়নুল আবেদীনের ছাত্র। যদিও ওঁরা প্রায় সকলেই ইউরোপের বিভিন্ন দেশ, আমেরিকা, জাপান, ভারত প্রভৃতি দেশে শিল্পকলায় উচ্চশিক্ষা লাভ করেন।

জয়নুল আবেদীন শুধু মহৎ চিত্রশিল্পী ছিলেন না—ছিলেন এক অসামান্য সংগঠকও। জাতীয় ঐতিহ্য-সংস্কৃতি সম্পর্কিত বহু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আমৃত্যু তিনি জড়িত ছিলেন। মৃত্যুর পূর্ববর্তী কয়েক বছর তিনি তাঁর সমস্ত শ্রম নিবেদন করে প্রতিষ্ঠা করেন 'বাংলাদেশ লোকশিল্প ফাউনডেশন' এবং সোনারগাঁয় প্রতিষ্ঠা করেন 'বাংলাদেশ লোকশিল্প জাদুঘর'। তাঁর অকালমৃত্যু হওয়ায় এই জাদুঘরের উপযুক্ত অবয়ব তিনি দেখে যেতে পারেন নি। ঢাকার অদূরে ঐতিহাসিক প্রাচীন শহর সোনারগাঁতে কয়েক শতাব্দীর পুরোনো এক প্রাসাদে তিনি সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত উদ্যোগে গড়ে তোলেন লোকশিল্পের সংগ্রহশালা, যেখানে প্রদর্শিত হচ্ছে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের গ্রামীণ লোকশিল্পীদের তৈরি নানা কাজ : মাটির হাঁড়ি সরা থেকে নকশিকাঁথা এবং মাটি-বাঁশ ইত্যাদির নানা কাজ। গ্রামপ্রধান বাংলাদেশের ঐতিহ্যের

ঢাকার চিঠি

সন্ধানে এখানকার শিল্পীদের বারবার ফিরে যেতে হবে গ্রামে—গ্রামীণ লোকশিল্পীদের কাছে, এ বিশ্বাস দৃঢ়ভাবে পোষণ করতেন শিল্পাচার্য। এখন এই জাদুঘর দেশবিদেশের পর্যটকদের আকর্ষণ করে।

ঢাকা শিল্পকলা একাডেমীর স্থায়ী আর্ট গ্যালারিতে রয়েছে জয়নুল আবেদীনসহ আমাদের প্রধান শিল্পীদের বহু অসামান্য ছবি। তা ছাড়া ময়মনসিংহের ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে এক মনোরম পরিবেশে অবস্থিত শিল্পাচার্যের 'ব্যক্তিগত সংগ্রহশালা', যা নলিনীরঞ্জন সরকারের সাবেক কুঠিতে ১৯৭৫ সালের এপ্রিলে (১লা বৈশাখ ১৩৮২) উদ্বোধন করা হয়। সেখানে শিল্পীর নানারকম মোহন চিত্র স্থান পেয়েছে।

বাংলাদেশের চিত্রশিল্পে দুটো প্রধান ধারা বিদ্যমান : একটি বাঙলার শাশ্বত লোকশিল্পভিত্তিক রিয়ালিসটিক মাধ্যম, এবং অন্যটি পাশ্চাত্তের আধুনিক শিল্পের অনুকরণে বিমূর্ত ধারা। যামিনী রায়ের ভক্ত জয়নুল আবেদীন ছিলেন রিয়ালিসটিক ধারার প্রধান প্রবক্তা। তিনি ছাড়া এই স্কুলের বিশিষ্ট শিল্পী হলেন কামরুল হাসান, শফিউদ্দিন আহমদ, আনোয়ারুল হক, কাইয়ুম চৌধুরী প্রমুখ। পাশ্চাত্য শিল্প-রীতির অনুরাগীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য আমিনুল ইসলাম, রশীদ চৌধুরী, আবদুর রাজ্জাক, মূর্তজা বশীর, কাজী আবদুল বাসেত প্রমুখ।

স্বাধীনতার পরেই আমাদের চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রে এক ধরনের জোয়ার এসেছে। এই সময় সংখ্যাহীন নবীন শিল্পীর আবির্ভাব ঘটে। আজকাল অনবরতই শিল্পীদের 'একক-প্রদর্শনী' হচ্ছে, তা ছাড়া বার্ষিক জাতীয় প্রদর্শনী তো হয়ই। বিগত বছরগুলোয় দু-একটি উল্লেখযোগ্য আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীও হয়েছে—বিদেশেও আমাদের শিল্পীরা বিভিন্ন প্রদর্শনীতে যোগ দিচ্ছেন। উল্লেখযোগ্য যে, ৮৩-র নভেম্বর-ডিসেমবরে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয় 'দ্বিতীয় দ্বিবার্ষিক এশীয় চারুকলা প্রদর্শনী'। সেই প্রদর্শনীতে যোগদান করেন ভারত, চীন, সোভিয়েত ইউ-নিয়ন, জাপান, নেপাল, ভুটান, ইরান, দক্ষিণ কোরিয়া, মালয়েশিয়া, ফিলিপিন, শ্রীলংকা, তুরস্ক এবং বাংলাদেশের শিল্পীবৃন্দ। তাতে স্বর্ণপদক লাভ করেন দক্ষিণ কোরিয়ার সুক জু লী, (তেলরঙ), বাংলাদেশের রাশা (কাঠখোদাই) এবং জাপানের ইয়োশিয়ো কিতায়ামা (কাঠ, বাঁশ, কাগজ, চামড়া, সাঁসা, তামা ইত্যাদির তৈরি একটি অনবদ্য কাজের জন্য)। ভারত থেকে শ্যামল দত্ত রায়, পি. এস. চন্দ্রশেখর, এম. এ. করিম, সাম আদাইকালাসামী, আকরে মনোহর, বাবলা সেনাপতি, যতীন দাস, কে. চন্দ্রনাথ আচার্য, চিন্তামণি কর, ওমপ্রকাশ, আনন্দময় ব্যানার্জী, আনীস ফারুকী, সাবিবর,

হাসান কাজী, গুরুচরণ সিংহ, কালিদাস পান্ডার প্রমুখ যোগদান করেন। এখানকার বহু গুণজ্ঞের কাছে তাঁদের কাজ প্রশংসিত হয়েছে। ওই প্রদর্শনীতে বাংলাদেশের ৭৭ জন খ্যাতনামা প্রবীণ আর নবীন শিল্পী যোগ দেন।

'৫০, '৬০ এবং ৭০-এর দশকে বাংলাদেশের শিল্পীরা পূর্ব আর পশ্চিমের বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন স্কুলের আধুনিক শিল্পীদের সংস্পর্শে আসার সুযোগ পান। তাতে তাঁদের দক্ষতা বাড়ে, অভিজ্ঞতার পরিধি প্রসারিত হয় এবং তাঁরা প্রভাবিত হন তাঁদের দ্বারা। আমাদের শিল্পীদের আবেগ আর বুদ্ধি সমান্তরালভাবে প্রকাশ পায় এই তিরিশ বছরের চিত্রশিল্পে। এই সময় লক্ষ করা যায় নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক কাজ। এই ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়েই আমাদের চারুকলা এগোচ্ছে, যদিও সমকালীন শিল্পী-দের সাফল্য বা ব্যর্থতা সম্পর্কে চূড়ান্ত রায় দেবার সময় এখনো আসে নি। তবে লক্ষ করা যাচ্ছে, আমাদের এখনকার চিত্রশিল্পে লোকজ মোটিফ ব্যবহার অনেক হ্রাস পেয়েছে, পক্ষান্তরে তরুণ শিল্পীরা বিমূর্ত কাজের প্রতিই বেশি উৎসাহী।

গত তিন দশক যাবৎ আমাদের দেশ যে-সামাজিক তথা রাজনৈতিক ঘাতপ্রতিঘাত আর উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে চলেছে তার চিহ্ন আমাদের চিত্রশিল্পে ব্যাপক না হলেও অনুল্লেখযোগ্য নয়। এ দেশের মানুষের জীবনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য তথা গৌরবোজ্জ্বল ঘটনা '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধও বাংলাদেশের শিল্পীদের অনেকখানি প্রভাবিত করেছে। জয়নুল আবেদীন থেকে এখনকার তরুণতম শিল্পী পর্যন্ত অনেকেই সামাজিক সমস্যা দ্বারা বিদ্ধ, যদিও সমকালীন শিল্পীদের বিপুল অধিকাংশই রোমানটিক। তাঁদের ছবিতে মানুষের চেয়ে মানুষের পরিবেশই অধিক গুরুত্ব পাচ্ছে। অনেকে সমাজসচেতন হয়েও ফরমের দিক থেকে বিমূর্ত রীতির প্রতিই বেশি আগ্রহী। আধুনিক কলাকৌশল আজ অনেকেই করায়ত্ত করেছেন, কিন্তু বিষয়ের ব্যাপারে তাঁরা বাংলাদেশের ভূগোলকেই বেছে নিয়েছেন। বাংলাদেশের নদনদী, আদিগন্ত প্রান্তর, ফসলের মাঠ, নীলিমা, মেঘমালা, ঋতুতে ঋতুতে এ মাটির প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য আমাদের চিত্র-শিল্পের বিরাট জায়গা জুড়ে আছে। তবে, আমার ধারণা, দেশের মানুষের চেয়ে নিসর্গই প্রাধান্য পাচ্ছে আমাদের শিল্পে।

জয়নুল আবেদীনের পরেই আমাদের প্রধান শিল্পী কামরুল হাসান (জ. ১৯২১—)। কলকাতা আর্ট স্কুলে তাঁর শিক্ষাজীবন সমাপ্ত হয় চল্লিশের দশকে। লোকশিল্পের মোটিফ ব্যবহার করে শিল্পসৃষ্টিতে তাঁর সিদ্ধি প্রশ্নাতীত। প্রবলভাবে ঐতিহ্যসচেতন এই শিল্পীর বাঙলার গ্রামীণ জীবন তথা লোকশিল্প সম্পর্কে অভিজ্ঞতা প্রচুর। এখন ড্রয়িং এবং স্কেচের প্রতিই তাঁর অধিক ঝোঁক। তাঁর খেরো-খাতা ভরে উঠছে অনবদ্য ড্রয়িং এবং স্কেচে। বিপুল-সংখ্যক প্রাঞ্জল চিত্রকর্মের তিনি স্রষ্টা। রোমানটিক হয়েও তিনি একজন বিশিষ্ট সমাজসচেতন শিল্পী।

জয়নুল এবং কামরুলের প্রায় সমসাময়িক শফিউদ্দিন আহমদ (জ. ১৯২২—) কলকাতা আর্ট স্কুলেরই ছাত্র। পরবর্তী কালে তিনি ঢাকা আর্ট কলেজে শিক্ষকতা করেন। '৫৬-৫৭ সালে তিনি লনডনে গ্রাফিক শিল্পে উচ্চশিক্ষা লাভ করেন। তাঁর বহু মূল্যবান তেলরঙ ছবি ছাড়াও বহু চমৎকার ড্রাইপয়েনট, অ্যাকোয়াটিনট এচিং এবং ডীপ এচিং-এ বহু কাজ রয়েছে। বর্তমানে তিনি অবসর জীবন যাপন করছেন।

সপ্তম জাতীয় চিত্রশিল্পের প্রদর্শনীতে যোগদাতা ৯৪ জন শিল্পীর মধ্যে যে আটজন প্রবীণ শিল্পী বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হয়ে তাঁদের শিল্পকর্ম পাঠিয়েছিলেন তাঁরা হলেন : কামরুল হাসান, শফিউদ্দিন আহমদ, মোহাম্মদ কিবরিয়া (জ. ১৯২৯—), আমিনুল ইসলাম (জ. ১৯৩১—), মুর্তজা বশীর (জ. ১৯৩৩—), কাইয়ুম চৌধুরী (জ. ১৯৩৪—) সৈয়দ জাহাঙ্গীর (জ. ১৯৩২—) এবং কাজী আবদুল বাসেত (. ১৯৩৫—)। এঁদের মধ্যে কামরুল হাসানের ড্রয়িং, আমিনুল ইসলামের কোলাজ এবং আর-সকলের কাজ তেলরঙের।

প্রদর্শনীতে যেসব শিল্পকর্ম স্থান পায় তার অধিকাংশই তেলরঙ। তা ছাড়া ছিল কিছু পানিরঙ, কাঠখোদাই, ড্রয়িং, অ্যাকুয়াটিনট এচিং, কোলাজ, ট্যাপেসট্রি, লিথোগ্রাফি, মাটি আর কাচ, পাথর, টেরাকোটা, মিশ্রমাধ্যম, বিভিন্ন ধাতু যেমন অ্যালুমিনিয়াম, সিসা আর ব্রোনজ এবং সিমেনট, পশম প্রভৃতির কাজ।

আর্ট কলেজের প্রবীণ অধ্যাপক কাইয়ুম চৌধুরী বাংলা দেশের অন্যতম প্রধান শিল্পী : ইলাসট্রেশনে তিনি এখনো অপ্রতিদ্বন্দ্বী। দেশের প্রধান লেখকগণ তাঁদের গ্রন্থের প্রচ্ছদের জন্য প্রথম তাঁরই শরণাপন্ন হন। তাঁকে প্রচ্ছদশিল্পের জাদু-কর বললে অত্যুক্তি হয় না। কাইয়ুম চৌধুরী লোকশিল্পের মোটিফ আর ডিজাইন ব্যবহার করে আধুনিক শিল্প সৃষ্টি করেন। বাঙলার লোকশিল্পের প্রতি তাঁর অনুরাগ অবিচল। তাঁর সাম্প্রতিক কালের ছবির মধ্যে 'আমার গ্রাম' এবং 'পানিমগ্ন গ্রাম' সিরিজের কাজগুলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ আবদুর রাজ্জাক পঞ্চাশের দশকের অন্যতম প্রধান শিল্পী। ঢাকা আর্ট কলেজ এবং মারকিন যুক্তরাষ্ট্রে তিনি শিল্পকলায় উচ্চশিক্ষা লাভ করেন। দেশ-বিদেশে তাঁর বেশ কিছু প্রদর্শনী হয়েছে।

প্যারিস আর মাদ্রিদে শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং বিশেষভাবে মারক শাগাল-ধারা প্রভাবিত রশীদ চৌধুরী দেশজ লোক-ঐতিহ্যের সঙ্গে মিশিয়েছেন আধুনিক পাশ্চাত্ত্য শিল্পের উপাদান। ট্যাপেসট্রির কাজে এখানে তিনি অনন্য।

আমিনুল ইসলাম, মুর্তজা বশীর, সৈয়দ জাহাঙ্গীর এবং কাজী আবদুল বাসেত প্রমুখের চিত্রকর্মও নিজস্বতা-বর্জিত নয়। এঁরা সকলেই বিদেশে চিত্রকলায় উচ্চশিক্ষা লাভ করেছেন এবং পশ্চিমের আধুনিক শিল্প-আন্দোলনের গতি-বিধি সম্পর্কে সজাগ। এঁদের দানে বাংলাদেশের 'চিত্র-শিল্পের ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হয়েছে। এবারের প্রদর্শনীতে 'সময়ের স্রোত' নামক ছবিটির জন্য শ্রেষ্ঠ শিল্পী হিসেবে পুরস্কৃত হয়েছেন মনিরুল ইসলাম (জ. ১৯৪৩—)। এক সময় ছিলেন তিনি ঢাকা আর্ট কলেজের ছাত্র এবং শিক্ষক, অতঃপর স্পেন সরকারের বৃত্তি নিয়ে ১৯৭০-এ তিনি মাদ্রিদ যান। বর্তমানে সেখানেই অবস্থান করছেন। প্রতি-শ্রুতিশীল ছাপচিত্রকর এবং এচিং শিল্পী হিসেবে তিনি দেশে এবং বিদেশে সুনাম অর্জন করেছেন।

ষাটের দশকের শিল্পীদের মধ্যে সমরজিৎ রায়চৌধুরী, রফিকুন্নবী, হাসেম খান প্রমুখের বেশ কিছু ভালো কাজ এই প্রদর্শনীতে দেখা গেছে। এই তিন জনই ইলাসট্রেশনে পারদর্শী। এঁদের মধ্যে রফিকুন্নবী (রনবী ছদ্মনামে) কার্টুন এঁকে খ্যাতি অর্জন করেছেন।

অপেক্ষাকৃত তরুণ শিল্পীদের মধ্যে শহীদ কবির, আবদুল সাত্তার, বনিজুল হক, চন্দ্রশেখর দে, হাসি চক্রবর্তী, মনসুর-উল করীম, বীরেন সোম, কাজী হাসান হাবীব, অলোকেশ ঘোষ, আবুল বারক্ আলভী, কে. এম. আবদুল কাইয়ুম, ফরিদা জামান, রতন মজুমদার, কালিদাস কর্মকার, মাহমুদুল হক, মোহাম্মদ মমিনুল রেজা, মোহাম্মদ ইউনুস, হামিদুজ্জামান খান প্রমুখ ইতোমধ্যেই দর্শক ও চিত্রসমা-লোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এঁদের অনেকেরই বয়স এখন পঁচিশ থেকে পঁয়ত্রিশের মধ্যে। সাধনা অব্যাহত থাকলে ভবিষ্যতে এঁরা অনেকেই উল্লেখযোগ্য শিল্পী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবেন।

পেইনটিং, গ্রাফিকস প্রভৃতি শিল্পীর তুলনায় আমাদের ভাস্করের সংখ্যা অতি নগণ্য। সম্প্রতি শামীম সিকদার, হামিদুজ্জামান খান প্রমুখ ভাস্কর্যে মনোনিবেশ করেছেন। কাঠখোদাইয়ে অবশ্য অনেকেই কমবেশি কাজ করছেন। তাঁদের মধ্যে তরুণতম শিল্পী ২৮ বছর বয়স্ক রাশা-র নাম বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য। রাশা-র প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা তেমন নেই, কিন্তু নিরলস সাধনায় তিনি ইতোমধ্যেই কয়েকটি অসামান্য কাজ করেছেন। তিনি নানা সময় পুরস্কৃতও হয়েছেন।

বাংলাদেশের আর-একজন মেধাবী শিল্পী এস. এম. সুলতান। তিনি জয়নুল আবেদীনের সমসাময়িক। এখন তাঁর বয়স প্রায় সত্তর। পাশ্চাত্ত্যের অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ এই শিল্পীর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা খুব বেশি নয়, চল্লিশের দশকের গোড়ার দিকে তিনি কলকাতা আর্ট স্কুলে কিছুকাল পড়ে-ছিলেন। সেই সময় সোহরাওয়ার্দী পরিবারের সংস্পর্শে এসে তাঁর জীবনের গতি পরিবর্তিত হয় : তিনি বেছে নেন ছন্নছাড়া বোহিমিয়ান জীবন। উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল ছাড়াও পঞ্চাশের প্রারম্ভে তিনি বহুদিন পাশ্চাত্ত্যের দেশ-গুলোয় ঘুরেছেন। সেখানকার বহু মেধাবী শিল্পীর সংস্পর্শে এসে নির্মাণ করেছেন নিজস্ব শিল্পভাষা। তিনি আমাদের একজন প্রধান বাস্তববাদী শিল্পী। বোহিমিয়ান জীবনযাপনে অভ্যস্ত হওয়ায় ঢাকার শিল্পীদের সঙ্গে সুলতানের এক ধরনের দূরত্ব রচিত হয়েছে। শিল্পীজীবনের অধিকাংশ সময়ই কেটেছে তাঁর গ্রামে, কিছুকাল আগেও যশোরের এক অজ পাড়াগাঁয়ে তিনি থাকতেন। অসামান্য কিছু চিত্রশিল্পের স্রষ্টা সুলতানকে সম্প্রতি ঢাকার শিল্পকলা একাডেমীর 'আবাসিক শিল্পী'-র পদে নিয়োগ করা হয়েছে। তাতে তাঁর আর্থিক দুরবস্থা কিছুটা লাঘব হয়ে থাকবে। আজীবন শিল্পের প্রতি নিবেদিত থাকায় কোনো বৈষয়িক ধনসম্পত্তির অধিকারী ছিলেন না সুলতান। ১৯৮৩-তে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জেনারেল এরশাদ তাঁর বিশেষ তহবিল থেকে যশোরের অদূরে নড়াইলে চিত্রা নদীর তীরে এক একরেরও কিছু বেশি জমির উপর দুই লক্ষ তিরিশ হাজার টাকা ব্যয়ে একটি বাড়ি তাঁকে তৈরি করে দেবার ব্যবস্থা করেছেন। প্রচারবিমুখ এই মহান শিল্পী লোক-চক্ষুর আড়ালে থাকতেই পছন্দ করেন।

বাংলাদেশের চিত্রশিল্প আর চারুকলার অগ্রগতি সম্পর্কে বলতে গেলে বলা যায়, একটি অনগ্রসর, উন্নয়নকামী এবং দরিদ্র দেশে শিল্পকলার কোনো একটি মাধ্যমকে জাতীয় জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্র থেকে আলাদা করে দেখা যায় না। তবে একথা অনস্বীকার্য যে, শিল্পসাহিত্যের অন্যান্য ক্ষেত্রের তুলনায় আমাদের চিত্রশিল্পীরা পিছিয়ে নেই, বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রের তুলনায় বাংলাদেশের চিত্রশিল্পীদের অগ্রগতি উল্লেখযোগ্য। সমাজ তথা সরকারের কাছ থেকে আরো উৎসাহ পেলে এই শতকের শেষ নাগাদ এদেশের চিত্রশিল্পের জগতে বহু প্রতিভা বিকশিত হবে, আশা করা যায়।

সৈয়দ আবুল মকসুদ

· আলোচনা

সংরক্ষণ নিয়ে কেন এই সংঘর্ষ ?

আমাদের সংবিধানের ১৫ এবং ১৬ ধারা রক্ষা করছে আমাদের একটি মৌলিক অধিকার :

১৫ (১) : "রাষ্ট্র কেবলমাত্র ধর্ম, জাতি, বর্ণ, স্ত্রী-পুরুষভেদ, জন্মস্থান, এবং এর যে-কোনো একটির কারণে কোনো নাগরিককের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক আচরণ করবে না।"

১৬ (১) : "সকল নাগরিক চাকরির ব্যাপারে এবং রাষ্ট্রের অধীন কোনো পদে নিয়োগের ব্যাপারে সমান সুযোগ পাবে।"

১৬ (২) : "কোনো নাগরিক কেবলমাত্র ধর্ম, জাতি, বর্ণ, স্ত্রী-পুরুষভেদ, জন্মসূত্র, জন্মস্থান, বসবাসের স্থান এবং এর যে-কোনো একটির কারণে কোনো চাকরির এবং রাষ্ট্রের অধীন কোনো পদে নিয়োগের অযোগ্য বিবেচিত হবে না।"

বলা বাহুল্য, এ হল নাগরিকমাত্রেরই আইনের চোখে প্রথম শ্রেণীর নাগরিক বলে বিবেচিত হবার অধিকার। দেশের সংবিধান যে ভেদাভেদ স্বীকার করে না, সেরকম উচ্চনীচ, অধিকারী-অনধিকারী ভেদাভেদে কোনো নাগরিককে অন্যায়ভাবে শিক্ষা-দীক্ষার এবং কর্মে নিয়োগের কোনো সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হবে না, তার ক্ষমতা, যোগ্যতা এবং অন্তর্নিহিত সম্ভাবনার সদ্ব্যবহার এবং বিকাশের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করা হবে না, এ হল তার সাংবিধানিক গ্যারানটি। যে সংবিধান ন্যায়বিচারের ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত, বলা বাহুল্য, এই অঙ্গীকার তার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

এর মধ্যে যদি আর কোনো কথা না থাকত, অর্থাৎ আমাদের সংবিধান যদি সুস্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এইটুকু বলেই ক্ষান্ত হতে পারত, আমেরিকানরা যেমন বলে পীরিয়ড, বলে মুখ বন্ধ করে ; সংবিধানও যদি তেমনি বলতে পারত, ভেদাভেদ চলবে না, ব্যস, তা হলে সে বড়ো সুখের হত সন্দেহ নেই। কিন্তু ১৯৫১ সালেই, সংবিধানের প্রথম সংশোধনেই, ১৫ ধারার সঙ্গে যুক্ত হল (৪) উপধারা :

"এই ধারার অন্তর্গত, অথবা ২৯ ধারায় (২) উপধারার অন্তর্গত কোনো কিছু, সামাজিক অথবা শিক্ষাগত ভাবে অনগ্রসর, কোনো শ্রেণীসমূহের, অথবা তফশীলভুক্ত বর্ণ অথবা তফশীল উপজাতিসমূহের উন্নতির জন্যে রাষ্ট্রের বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণে প্রতিবন্ধক হতে পারবে না।"

দেশে বিদেশে

২৯ (২) উপধারায় আছে : "রাষ্ট্র যার ব্যয় নির্বাহ করে, অথবা রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে যে সাহায্য পায় এমন কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কেবলমাত্র ধর্ম, জাতি, বর্ণ, ভাষা, কিংবা এসবের কোনো একটি কারণে কোনো নাগরিককে ভরতি না করতে পারবে না।"

আর, ১৫ ধারার সঙ্গে (৪) উপধারা প্রথম থেকেই ছিল। তাতে আছে :

"এই ধারার অন্তর্গত কোনো কিছু, নাগরিকদের যে অনগ্রসর শ্রেণীসমূহ রাষ্ট্রের মতে রাষ্ট্রের অধীন পরিসেবাগুলিতে যথেষ্ট সংখ্যায় স্থান পায় নি, তাদের অনুকূলে পদ এবং চাকরিতে সংরক্ষণের জন্যে রাষ্ট্রের কোনো ব্যবস্থাগ্রহণে প্রতিবন্ধক হবে না।"

অতএব, এইসব ধারা এবং উপধারা মিলিয়ে এখন দেখা যাচ্ছে, চাকরিবাকরি এবং শিক্ষাদীক্ষার সুযোগের ব্যাপারে রাষ্ট্র সকলের প্রতি সমদৃষ্টিসম্পন্ন হলেও, বিশেষ বিশেষ জনগোষ্ঠীর প্রতি বিশেষ বিশেষ সংবিধান-অনুমোদিত কারণে রাষ্ট্র বিশেষ আনুকূল্য করতে পারে।

কিন্তু, নির্বিশেষ সমদৃষ্টি যেখানে আমাদের রাষ্ট্রের মৌলিক অঙ্গীকার, সেখানে এই বিশেষ আনুকূল্য কেন? এ প্রশ্ন আগে উঠেছে, এখন উঠছে, এবং যত দিন সংরক্ষণের ব্যবস্থা বহাল থাকবে, ততদিনই উঠবে। প্রশ্নটা যাঁরা তুলছেন তাঁরা কেউই যে এর উত্তর জানেন না, তা নয়। তাঁদের অনেকে আসলে মনে করেন না যে উত্তরটা গ্রহণযোগ্য।

সংবিধানেরই অন্যত্র এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়। ৪৬ ধারায় আছে :

"রাষ্ট্র বিশেষ যত্নসহকারে জনগণের দুর্বলতর শ্রেণীসমূহের এবং বিশেষত, তফশীলী বর্ণ এবং তফশীলী উপজাতিসমূহের শিক্ষাগত এবং আর্থিক স্বার্থের উন্নয়ন করবে এবং সামাজিক অবিচার আর সর্বপ্রকার শোষণ থেকে তাঁদের রক্ষা করবে।"

এই ধারাটি সংবিধানের চতুর্থ ভাগের ডিরেকটিভ প্রিনসিপলস অব স্টেট পলিসির অন্তর্গত। আইনের সাহায্যে আদালতের হুকুমে এই ধারাকে বলবৎ করা যায় না বটে, কিন্তু সংবিধানেই নির্দেশ আছে, আইন-প্রণয়নকালে রাষ্ট্র এই নীতি প্রয়োগ করবে, কেননা সংবিধান অনুযায়ী, এই দেশ শাসনে এই নীতি মৌলিক বলে বিবেচিত। অনুমান করতে পারি, সংবিধান-প্রণেতারা চেয়েছিলেন, এই মৌলিক নীতির পালনে সংবিধানের ১৫, ১৬ এবং ২৯ (২) ধারা অর্থাৎ সমদৃষ্টির নীতিটি যেন বাধা হয়ে না দাঁড়ায় ; যাতে প্রয়োজনবোধে অনগ্রসর দুর্বলতর শ্রেণী এবং গোষ্ঠীসমূহের জন্যে চাকরির ক্ষেত্রে এবং শিক্ষাদীক্ষার সুযোগের ক্ষেত্রে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা যায়। শুধু তাই নয়, সংবিধান-নির্দিষ্ট কর্তব্য পালনের জন্যে রাষ্ট্র সংবিধানে প্রদত্ত ক্ষমতা ব্যবহার করবে ; প্রত্যাশাও তাই। এ বিষয়ে দ্বিমত হওয়ার অবকাশ নেই।

তা হলে কেন আবার এই সংরক্ষণের প্রশ্নে একটা ঘোর অশান্তি দেশে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে?

বিশেষত, গুজরাতে সংরক্ষণ-বিরোধী আন্দোলন যেরকম গুরুতর আকার নিয়েছে তাতে মনে হয় জনমতের এক বড়ো এবং শক্তিশালী অংশ এ নিয়ে একটা হেস্তনেস্ত এখনই চাইছে ; যেন ঘোরতর একটা অন্যায় এবং অবিচার অনেক দিন মুখ বুজে বরদাস্ত করা হয়েছে, আর নয়—এইরকম মরিয়াভাব। গুজরাত সরকার আপোস করতে চাইছেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন, অনগ্রসর শ্রেণীর জন্যে সংরক্ষণের কোটা বাড়াবার যে সংকল্প তিনি নির্বাচনের আগে ঘোষণা করেছিলেন, এবং যা নিয়েই এবারকার আন্দোলনের সূত্রপাত, তা আপাতত কার্যকর হবে না। তবু, আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেবার, এমনকি মুলতুবি রাখবার মতো মনোভাবও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। ভাবগতিক দেখে মনে হয়, অন্দোলনকারীরা মনে করছেন, লোহা বেশ তেতে উঠেছে, হাতুড়ির ঘা মারতে হয় তো এই বেলা। তাতে যদি কোথাও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাই বেধে ওঠে, দু-পাঁচজন নিরীহ লোকের যদি প্রাণই যায়, আমরা নাচার। শুধু নতুন বাড়তি কোটা বলেই নয়, সমস্ত সংরক্ষণব্যবস্থাটাই ভিতসুদ্ধু নড়ে উঠেছে। এ ব্যাপারে সরকারের দুর্বলতাটাই সবার চোখে ধরা পড়ে গিয়েছে, এখন সময় এসেছে, সংরক্ষণকে সমূলে উৎপাটিত করবার।

এ কথা ঠিক, সরকারি তরফে কোনো দুর্বলতা—তার সংকল্পে হোক, নীতিনির্ধারণে হোক, বড়ো রকমের কোনো একটা ফাঁকি কিংবা অসংগতি যদি না থাকে তাহলে এত বড়ো আকারের আন্দোলন গড়ে ওঠা কঠিন। গত তিন-মাস ধরে যে আন্দোলন গুজরাতে চলছে, তাতেও জ্বালানি যুগিয়েছে একদিকে যেমন সংরক্ষণের নীতি সম্পর্কেই সমাজের এক বৃহৎ এবং অগ্রণী অংশের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ, আরেক দিকে আবার তেমনি গুজরাত সরকারের দ্বিধা, আত্মখণ্ডন, নিজের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং কর্মপন্থার ওপর নিজেরই আস্থার অভাব। একটা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য প্রকাশ্যে ঘোষণা করে তার অভিমুখে একটা কর্মপন্থা প্রকাশ্যে স্থির করে, সেই পন্থা ধরে সেই লক্ষ্যের দিকে অবিচলিত পদক্ষেপে এগিয়ে যাওয়া—এ বোধহয় রাজনীতিকের স্বভাববিরুদ্ধ।

যে রাণে কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী গুজরাত সরকার অনগ্রসর শ্রেণীসমূহের জন্যে সংরক্ষণের হার শতকরা ১০ থেকে বাড়িয়ে শতকরা ১৮ করলেন, তার রিপোর্ট সরকারের হাতে জমা পড়েছিল অকটোবর ১৯৮৩-তে। সেই রিপোর্ট তাঁরা চাপা দিয়ে রাখলেন দীর্ঘ ১৫ মাস। তারপর নির্বাচনের প্রাক্কালে ঘোষণা করলেন তার সুপারিশের একটিমাত্র অংশ কার্যকর করবেন, সংরক্ষণ শতকরা ৮ ভাগ বাড়াবেন। কিন্তু সেই রিপোর্টটিও প্রকাশ করলেন না, যতদিন না গুজরাত হাইকোর্ট আদেশ দিলেন রিপোর্ট রাজ্যবিধানসভার সামনে হাজির করতে হবে। তখন বোঝা গেল, কেন এই গোপনীয়তা।

অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি শ্রী রাণের নেতৃত্বে গঠিত সেই কমিশন সুপারিশ করেছিলেন, জাতি-বর্ণ নয়, বৃত্তি এবং আয়ের ভিত্তিতে নির্ধারণ করতে হবে—সংবিধানের ১৫ (৪) এবং ১৬ (৪) ধারা অনুযায়ী কারা সামাজিকভাবে এবং শিক্ষাগতভাবে অনগ্রসর শ্রেণী। স্পষ্ট বোঝা গেল সরকার সংরক্ষণের যে নীতি অবলম্বন করেছেন, তাঁদের নিজেদের নিয়োজিত কমিটির বিবেচনাতেই তা অযৌক্তিক। এর পরে সরকারি নীতিকে উৎখাত করবার জন্যে আন্দোলনের ডাক আসবে, তাতে আর সন্দেহ কী?

১৯৮১ সালে এই সংরক্ষণ নিয়ে যে আন্দোলন হয়েছিল, রাজ্যের বুদ্ধিজীবীরা সাধারণভাবে তার নিন্দাই করেছিলেন, কিন্তু ১৯৮৫-তে এই আন্দোলন সম্পর্কে সমীক্ষা করে দেখা গেল, শুধু ছাত্রসম্প্রদায়ই নন, কলেজের অধ্যাপক, সমাজতত্ত্ববিদ, সাধারণভাবে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের এক বৃহৎ অংশ আন্দোলনটাকে পুরোপুরি সমর্থন করছেন। অবশ্য তাঁদের অনেকে বলেছেন, তফশীলী সম্প্রদায়সমূহের জন্যে সংরক্ষণের তাঁরা বিরোধী নন, কিন্তু অন্য অনগ্রসর শ্রেণীসমূহের জন্যে যে অতিরিক্ত সংরক্ষণের ব্যবস্থা ঘোষিত হয়েছে, তাঁরা তার বিরোধী। আবার, সঙ্গে-সঙ্গে তাঁরা একথাও বলেছেন, সংরক্ষণের সমস্ত ব্যবস্থাটা—তা সে হরিজনদের জন্যেই হোক আর অনগ্রসর শ্রেণীর জন্যেই হোক—নতুন করে পর্যালোচনা করা উচিত। একটা শব্দ এখন খুব শোনা যাচ্ছে, মেরিটোক্রেসি। যাঁরা যোগ্য, প্রয়োজনীয়গুণসম্পন্ন—তাঁদের দ্বারা শাসন পরিচালনা।

এদিকে সুপ্রিম কোর্টের পাঁচ-বিচারপতি-সম্বলিত যে কনস্টিটিউশন বেনচ, তার বৃহত্তর অংশের অভিমত মে মাসের ১০ তারিখে জানা গেছে। তাঁরা বলেন, দারিদ্র্যকেই সংরক্ষণের জন্যে মাপকাঠি করা উচিত, বর্ণ-সম্প্রদায়কে নয়। কর্ণাটক সরকার এ বিষয়ে তাঁদের কাছ থেকে গাইড-লাইন চেয়েছিলেন। তাঁরা কোনো আদেশ জারি করেন নি, আইনগত বাধ্যবাধকতা কিছু নির্দিষ্ট করে দেন নি। তবে তাঁরা যে মত জানিয়েছেন, মোটামুটিভাবে বলা যায়, সেটা আর্থিক বিবেচনার দিকেই ঝুঁকেছে। প্রধান বিচারপতি বলেছেন, তফশীলী সম্প্রদায়গুলির জন্যে আরও ১৫ বছর সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকতে পারে। কিন্তু তার পরে আর্থিক সামর্থ্যেরও বিচার করতে হবে। বিচারপতি সেন কিন্তু স্পষ্ট তাঁর মত জানিয়েছেন, সংবিধান অনুযায়ী কাদের জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা করা প্রয়োজন তা ঠিক করবার জন্যে

"সর্বপ্রধান এবং একমাত্র" বিবেচ্য বিষয় হওয়া উচিত দারিদ্র্য। আরও বলেছেন, নাগরিকদের কোনো শ্রেণী সামাজিক আর শিক্ষাগত ভাবে অনগ্রসর কিনা তা নির্ধারণ করার মতো যথেষ্ট ব্যবস্থা আদালতের নেই। কেন্দ্রীয় সরকারকে তাঁর অনুরোধ ,তাঁরা যেন বিবেচনা করে দেখেন, অনগ্রসর শ্রেণীসমূহের জন্যে এমন একটি জাতীয় কমিশন স্থাপন করা যায় কিনা, যাঁরা নিরন্তর বিভিন্ন এলাকায় সমাজতাত্ত্বিক এবং অর্থনৈতিক অনুসন্ধান চালাবেন। (ইনডিয়ান একসপ্রেস, ১১ মে, ১৯৮৫)

সংরক্ষণের ব্যবস্থা এই মুহূর্তে তুলে দেবার প্রস্তাব অবাস্তব। সংরক্ষণ-বিরোধীরা সত্যি করে তা হয়তো চাইছেন না। বরং তাঁদের মধ্যে থেকে এখন এ কথা শোনা যাচ্ছে—আস্তে-আস্তে সংরক্ষণের বিলোপ করা হোক। ভারত সরকারও পুনরায় ঘোষণা করেছেন, সংরক্ষণ থাকবে। একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যায়, দীর্ঘকালব্যাপী যে সামাজিক অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল, তা যেহেতু এখনও দূর হয় নি, অতএব সংরক্ষণের প্রয়োজনও এখন পর্যন্ত বর্তমান। যদিও ১৯৫০ থেকে প্রথম দফায় ১০ বছরের জন্যে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল, তবু দেখা গেল, দফায়-দফায় এতদিন ধরে তার আয়ু বাড়িয়েও তার প্রয়োজনের অবসান ঘটানো যায় নি। অনেকের মতে, এটাও একটা বড়ো যুক্তি—সংরক্ষণের বিলোপের পক্ষে।

অন্তত নতুন করে বিষয়টা নিয়ে যে ভাবা দরকার, সে রকম একটা মনোভাব ক্রমশ প্রবল হচ্ছে। শ্রী রাজীব গান্ধীও বলেছেন সংরক্ষণ-প্রশ্নে একটা জাতীয় সহমত গঠন করা দরকার। সম্প্রতি শ্রীচন্দ্রশেখরও সেই একই কথা বলেছেন। দেখা যাক, এই নতুন চিন্তা-ভাবনা সমস্যাটিকে কোনো নতুন রাস্তা দেখাতে পারে কিনা।

পারমাণবিক যুগে গণতন্ত্র

আমাদের এই পারমাণবিক যুগে, পারমাণবিক শক্তি যে যুগে মানুষের করায়ত্ত হয়েছে, রাষ্ট্র যে যুগে সামূহিক বিনাশের ক্ষমতা লাভ করেছে, পুরোনো এবং প্রচলিত অনেক ধ্যানধারণা সম্পর্কে আবার নতুন করে ভাবনাচিন্তার প্রয়োজন অনেকেই অনুভব করছেন। তার মধ্যে একটি হল গণতন্ত্রের ধারণা, এবং তার বাস্তবতা সম্পর্কিত।

গণতন্ত্রের ধারণার মধ্যে সারবস্তু যদি কিছু থেকে থাকে, তা নিশ্চয় এই যে দেশের সামনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে প্রশ্নগুলো আসবে, অন্তত সেগুলোর সম্পর্কে দেশবাসীর বিচার-বিবেচনার অবকাশ থাকবে, এবং সেসব বিষয়ে দেশবাসীর মতামত রাষ্ট্রশক্তিকে পরিচালিত না করুক, অন্তত প্রভাবিত করবে। গণতন্ত্রেও প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত প্রশাসনকর্তৃপক্ষকেই নিতে হয়, কিন্তু রাষ্ট্রপরিচালনার ক্ষেত্রে নীতি-সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত জনপ্রতিনিধিরা গ্রহণ করবেন, জনপ্রতিনিধিরা আবার জনসাধারণের মতামত,—খুঁটিনাটির ব্যাপারে নয়, কিন্তু বৃহত্তর নীতির ব্যাপারে—প্রতিফলিত করবেন। এ না হলে গণতন্ত্রের আর কী তাৎপর্য থাকে?

বলা বাহুল্য, জনসাধারণ একমাত্র তা নিয়েই ভাবনাচিন্তা করতে পারেন যার সম্বন্ধে তাঁরা অবহিত, এবং একমাত্র সে বিষয়েই তাঁদের মতামতের কোনো মূল্য থাকতে পারে যে বিষয়ে তাঁরা ভাবনা-চিন্তা করছেন। অতএব, গণতন্ত্র একমাত্র তাহলেই অর্থবহ, যদি (১) জাতীয় জীবনের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ এবং বৃহত্তর নীতিসংক্রান্ত প্রশ্নের সর্বদিক বিবেচনা করে দেখবার মতো তথ্য জনগণের গোচরে আনা হয়, (২) সে বিষয়ে জনসাধারণের মতামত এবং মনোভাব সরকারি সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও নীতিনির্ধারণে সহায়ক হয়, (৩) বিভিন্ন বিকল্পের মধ্যে যে নীতি অথবা সিদ্ধান্তটি সরকার গ্রহণ করলেন তার তাৎপর্য যতটা সম্ভব জনসাধারণের বোধগম্য করা হয়।

এখন যে প্রশ্নটা অনেকের চিন্তার বিষয়, তা হল পারমাণবিক অস্ত্রঘটিত যেসব রাষ্ট্রীয় নীতি এবং সিদ্ধান্ত মানবজাতির সমগ্র অস্তিত্বের পক্ষে মারাত্মক রকমের গুরুত্বপূর্ণ, তার বিষয়ে, যেসব বিচার-বিবেচনার ভিত্তিতে সে নীতি এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে সে বিষয়ে, অন্য কী বিকল্প নীতি এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারত সে বিষয়ে জনসাধারণ কতদূর অবহিত? পারমাণবিক অস্ত্র মজুদ সংক্রান্ত সরকারি নীতি; পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে সেগুলোর স্থাপনের কর্মসূচি; কখন, কী অবস্থায় সেগুলো ব্যবহৃত হবে, সে সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত—এসবই জনসাধারণের বাঁচা-মরার, মানবজাতির বাঁচা-মরার প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত, অথচ, যাঁরা এসব বিষয়ে নীতিনির্ধারণ করেন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, এবং যাঁদের পরামর্শের ওপর ভিত্তি করে নীতি এবং সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, তাঁরা জনসাধারণের সামনে বিবেচ্য প্রশ্নগুলি খুলে ধরেন না, এবং যে সিদ্ধান্ত তাঁরা গ্রহণ করলেন, যে নীতি অবলম্বন করলেন, তার পরিণতি কী হতে পারে তাও জনসাধারণকে বুঝিয়ে বলেন না। সর্বোচ্চ স্তরের কতিপয় বিশেষজ্ঞ এবং কতিপয় রাজনীতিক এইসব প্রশ্ন রুদ্ধদ্বার বৈঠকে বিবেচনা করেন, এবং তারপর যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, মনে হয় যেন মানবজাতির জন্যে সেইটিই বিধির বিধান।

এর মধ্যে গণতন্ত্র কোথায়? জনসাধারণ তার নিজের ভাগ্য নিজে নিয়ন্ত্রণ করবে, তার অবকাশ কোথায়? সারা দেশের মানুষ, আর যত চিন্তাশীল ব্যক্তি, যত দার্শনিক, যত পণ্ডিত, শিল্পী, সাহিত্যিক, কবি—তাঁরা কি ওই কয়েকজন বিশেষজ্ঞ এবং রাজনীতিকের হাতে দেশের ভাগ্য সমর্পণ করে দিয়ে বসে থাকবেন? অতি সাধারণ একজন গৃহস্থও কি মনে করেন, তাঁর, তাঁর পরিবারের, তাঁর প্রতিবেশীদের, তাঁর শহরের ভাগ্য চোখ বুজে তাঁদের হাতে তুলে দিতে পারেন?

আমার চায়ের প্যাকেটের ওপর সরকার দু পয়সা ট্যাক্স বসাবেন কিনা, সে বিষয়ে আমার মতামত সরকারের বিবেচ্য, কিন্তু আমার একমাত্র বাসভূমি, একমাত্র আশ্রয়, এই পৃথিবীকে তেজস্ক্রিয় ভস্মে পরিণত করবার জন্যে যা কাজে লাগতে পারে তেমন অস্ত্র-সম্ভার পুঞ্জীভূত করবার আগে আমি জানতেও পারি না, কিসের যোগাড়যন্তর চলছে। এ যদি ডেমোক্রাসি হয়, তা হলে অটোক্রাসি কাকে বলে?

ভরসার কথা, গোপনীয়তার পরদা ফাঁস হতে আরম্ভ করেছে। পারমাণবিক শক্তিধর যে দুটি অগ্রগণ্য দেশ, তার একটি, আমেরিকার পক্ষে যে-কোনো বিষয়েই সম্পূর্ণ গোপনীয়তা রক্ষা করা অত্যন্ত কঠিন, কংগ্রেস আছে, তার সব কমিটি আছে, এবং একবার তাঁরা নড়েচড়ে বসতে আরম্ভ করলে সরকারের আব্রু বজায় রাখা দুরূহ। তার ওপরে পত্রপত্রিকা তো আছেই।

ঠিক এই মুহূর্তে আমেরিকাতে পারমাণবিক অস্ত্রসংক্রান্ত এবং সামরিক ক্ষেপণাস্ত্র সংক্রান্ত নানা প্রশ্ন নিয়ে এমন ব্যাপক এবং এমন তীব্র আলোচনা চলছে, এত বইয়ে এত লোক সেসব প্রশ্ন নিয়ে গভীরতর বিচার-বিশ্লেষণে রত হয়েছেন যে আগে কখনো এমনটি দেখা যায় নি। প্রেসিডেনট রেগানের "স্টার ওয়ারস" প্রকল্প নিয়ে কী রকমের বিতর্ক বিশেষজ্ঞদের এবং রাজনীতিকদের একেবারে সর্বোচ্চ স্তরে চলেছে তার খানিকটা পরিচয় আমরা আগে দিয়েছি। মনে হয়, এই যে দেশব্যাপী চিন্তাভানাব দরজা জানালা খুলে দেওয়ার একটা হিড়িক পড়েছে, শেষ পর্যন্ত তার ফল ভালোই হবে।

২৫ মে, ১৯৮৫

ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

সংগীত

আকাশবাণীর রবীন্দ্রজন্মোৎসব

আকাশবাণীর বহুবিঘোষিত রবীন্দ্রজন্মোৎসবের অনুষ্ঠান শুনে কোনো বিশেষ পরিকল্পনার পরিচয় পাওয়া গেল না। এই প্রোগ্রাম ভোরবেলা পাঁচটা থেকে শুরু না করে দিনের যে-কোনো সময় করা যেতে পারত। একটা বিশেষ অনুষ্ঠানের জন্যে বিশেষ চিন্তার প্রয়োজন; কিন্তু চিন্তার কিছুই এতে ছিল না—সেই মামুলি গান এবং রবীন্দ্রকাব্যের আবৃত্তি অতি সাধারণভাবে আচরিত হতে দেখা গেল; এমনকি অনেকের গান বা আবৃত্তি সুখশ্রাব্য পর্যন্ত হয় নি।

রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের পর এক প্রজন্ম প্রৌঢ়ত্বে এসে পেঁৗছেছে, আর-এক প্রজন্ম তরুণ। এঁদের কারুরই রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ কিছু জানা নেই। এঁদের কাছে রেকর্ড কোম্পানির আর্টিস্টের গাওয়া রবীন্দ্রসংগীতই যথার্থ রবীন্দ্রনাথের গান এবং গ্রুপ থিয়েটারের নটনটী বা শখের কবিতা-পাঠকপাঠিকাদের আবৃত্তিই রবীন্দ্রকাব্যের যথার্থ পাঠ। কিন্তু, এর কোনোটাই আসল সত্য নয়, কোনোটাতেই রবীন্দ্র-আর্টের যথার্থ প্রতিফলন হয় না। অতএব আকাশবাণী যদি সেই মূলসূত্র দুটি ধরিয়ে দিতে পারতেন তাহলে তাঁদের অনুষ্ঠান সাফল্যলাভ করত; কিন্তু এরকম চিন্তাকেই তাঁরা বাহুল্য মনে করেছেন।

আমরা যারা রবীন্দ্রনাথকে দেখেছি, তাঁর কণ্ঠ শুনেছি, অভিনয় প্রত্যক্ষ করেছি, তাদের কাছে এযুগের রবীন্দ্রসংগীত বা রবীন্দ্রকাব্যের আবৃত্তি অনেকটাই অন্যরকম মনে হয়, অন্তত কবির নিজস্ব ধারাটা কোনো ক্ষেত্রেই এরকম ছিল না। রবীন্দ্রনাথ সুদক্ষ অভিনেতা ছিলেন; তাঁর গানেও এই অভিনয়ের ভঙ্গিটি বিশেষভাবেই বর্তমান ছিল। গানের প্রতিটি কথা, প্রতিটি ইঙ্গিত ঠিক তার স্বাভাবিক আবেদন নিয়ে প্রতিভাত হত রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে। দিনেন্দ্রনাথের গানেও ঠিক এই বৈশিষ্ট্যটিই দেখা যেত। ফলে কবির প্রত্যেকটি গানে একটা বিশেষ ধ্বনি (আলংকারিক অর্থে) থাকত যা সুরকে শ্রোতার কাছে অত্যন্ত প্রত্যক্ষ করে তুলত। এই বস্তু বর্তমানে স্বরলিপি থেকে তোলা গানে কিছুমাত্র পাওয়া যায় না এবং আর্টিস্টদের সেই ইমাজিনেশনের পরিচয়ও পাওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথের গানের সবচেয়ে বড়ো কথা হচ্ছে এই রূপায়ন,—এটা সার্থক না হলে রবীন্দ্রসংগীত সার্থকতার পর্যায়ে উঠতে সক্ষম হবে না। রবীন্দ্রনাথ গলায় কৃত্রিমতা আনার একেবারে বিপক্ষে ছিলেন। খোলা গলায় কণ্ঠস্বরকে পাখির মতো সঞ্চরণ করাতে তিনি পছন্দ করতেন। সে সময় শান্তিনিকেতনে যাঁরা গানে যোগদান করতেন তাঁরা সকলেই এইভাবেই গাইতে অভ্যস্ত ছিলেন। আজকে সেই খোলা গলার গান শোনা দুর্লভ হয়ে উঠেছে। মাইক্রোফোন-নামক যন্ত্রের সামনে অস্ফুট কণ্ঠে গাইতে-গাইতে শিল্পীরা তাঁদের স্বাভাবিক কণ্ঠের পরিচয় নিজেরাই বিস্মৃত হয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের আবৃত্তি ছিল একটি সুন্দর আর্ট। ছন্দকে তিনি অতি নিপুণভাবে লীলায়িত করতেন তাঁর কণ্ঠে। প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথের বহু আবৃত্তির সঙ্গে খোল বা তবলার সঙ্গত হতে পারত অনায়াসে এবং একাধিক ক্ষেত্রে তা হয়েওছে—যা আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। কিন্তু তা বলে তাঁর আবৃত্তি যে পুরোপুরি মিউজিক্যাল হত তা নয়, আবৃত্তির ধর্ম তাতে যথেষ্ট বজায় থাকত। পরন্তু তার সঙ্গে অভিনয়ের ভাব সংযোজিত হয়ে একটি উৎকৃষ্ট পাঠ্যবস্তু হয়ে দাঁড়াত। আজকালকার অনেক আবৃত্তিকারের আপত্তি রবীন্দ্রনাথ অতিমাত্রায় লিরিক্যাল ছিলেন এবং তাঁর পঠনভঙ্গি ছিল একান্তভাবে গীতিধর্মী। কিন্তু এই ভঙ্গির কিছুমাত্র পেলেও তাঁরা ধন্য

হয়ে যেতেন। এঁরা অধিকাংশই ছন্দে পুঙ্খ, লয়, তাল জিনিসটা সম্বন্ধেও এঁদের ধারণার যথেষ্ট অভাব। এযুগের বিরস নাটকে অভ্যস্ত হওয়াতে এঁদের পঠনভঙ্গিতে লালিত্য জিনিসটার একান্ত অভাব। এ ছাড়া উচ্চারণেও এঁদের অনেকে পারদর্শিতা অর্জন করেন নি। ফলে, রবীন্দ্রনাথের কাব্য পাঠের সময় এঁদের কণ্ঠে একটা গদ্যভাব এসে পড়ে, অভিনয়ের সৌকর্য আদৌ ফুটে ওঠে না ; ফলে যেটা হয় সেটা খুব হালকা ধরনের ব্যক্তিত্বহীন কথকতা, যা একালের তথাকথিত গ্রুপ থিয়েটারে মানিয়ে যেতে পারে। এ নিয়ে গৌরব করবার মতো কিছু নেই এবং রবীন্দ্রনাথের আবৃত্তি সম্বন্ধে মতামত প্রদানের আগে নিজের পটুত্বকে সুশিক্ষিত করা তাঁদের সর্বাগ্রে দরকার।

রবীন্দ্রজন্মোৎসবে এই প্রজন্মকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে পরিচয় করিয়ে দেওয়াটা একান্তভাবে প্রয়োজন বলেই তো আমাদের মনে হয়। আকাশবাণীর ভাণ্ডারে রবীন্দ্রনাথের অনেক আবৃত্তির রেকর্ড থাকবার কথা। কয়েক বৎসর আগেও এরকম বেশ কিছু রেকর্ড শুনেছি বলে মনে পড়ছে। এইগুলি পর-পর প্রচারিত করলে কিছু অসংলগ্ন ব্যাপার হত না। এর সঙ্গে আকাশবাণীর কর্তৃপক্ষ কিছু ভূমিকা যোগ করতে পারতেন। রবীন্দ্রনাথের কিছু গানের রেকর্ডও আছে, সেগুলিও বাজানো যেতে পারত। কবিগুরুর গান যখন রেকর্ড করা হয়, তখন তাঁর গানের গলা আগের মতন ছিল না ; কিন্তু তথাপি অনেক বিশেষত্ব ছিল যেগুলি এখনকার গাইয়েদের গলায় কিছুতেই ফুটে ওঠে না। গানগুলি প্রচারের সময় এ বিষয়েও কিছু বিশেষজ্ঞের ভূমিকা যোগ করা যেতে পারত। এ ছাড়া দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অমলা দাশ, অমিতা সেন, সমরেশ চৌধুরী, সুনীল রায় প্রমুখ প্রয়াত গায়কগায়িকাদের রেকর্ড বাজানো যেত ; কারণ সমরেশ চৌধুরী পর্যন্ত সাক্ষাৎ রবীন্দ্রধারার গায়কী পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করবার সময় তৎকালীন গায়কগায়িকা, যাঁরা আজ নেই, তাঁদেরও স্মরণ করা দরকার। তবু ভালো, শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের একটা আবৃত্তি বোধহয় ছিল, সেটা নিয়মরক্ষা। আকাশবাণী এ দিকটা একেবারেই চিন্তা করেন নি, অথচ তাঁরাই এটা করে উঠতে পারতেন। যেটা তাঁরা করেছেন, সেটা আজকালকার অতি পরিচিত প্রথা, অর্থাৎ একটা বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে কতিপয় আর্টিস্টকে বখশিশধন্য করে পরিতুষ্ট করা। এই আয়োজনের নির্গলিত উদ্দেশ্য যদি কিছু থাকে তবে সেটা এর বেশি কিছু নয়।

রাজ্যেশ্বর মিত্র

স্মরণে

প্রমথনাথ বিশী

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে প্রমথনাথ বিশী একটি বিশিষ্ট নাম। গত ১০ মে শুক্রবার চুরাশি বছর বয়সে তাঁর দেহান্ত হয়েছে। প্রমথনাথ বরেন্দ্রভূমির সন্তান। ১৯০১ সালের ১১ জুন রাজসাহী জেলার জোয়াড়ি গ্রামে তাঁর জন্ম। দশম বর্ষে শিক্ষালাভের জন্য প্রেরিত হন শান্তিনিকেতনে। সেখানে সতেরো বছর ছিলেন। ১৯১৯ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, ১৯২৭ সালে আই. এ.। তারপর রাজসাহী কলেজ থেকে ১৯২৯-এ ইংরেজি সাহিত্যে সাম্মানিক স্নাতক হন। তিন বছর পরে প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসাবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ. পরীক্ষায় বাংলায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম। বছর তিনেক রামতনু লাহিড়ী সহকারী গবেষক থাকার পর রিপন [অধুনা সুরেন্দ্রনাথ] কলেজে অধ্যাপনা শুরু। চোদ্দ বছর পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেন এবং দশ বছর পরে রবীন্দ্র-অধ্যাপক পদে বৃত হন। অধ্যাপনা থেকে অবসর গ্রহণ করেন সত্তর বছর বয়সে।

শান্তিনিকেতনে সতেরো বছর রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ ছাত্র হিসাবে কবিগুরুর সান্নিধ্যলাভ পরম সৌভাগ্যের বিষয়। প্রমথনাথ অবশ্য শান্ত সুবোধ ছাত্র ছিলেন বলে মনে হয় না। কিন্তু কবিগুরু তাঁর ছাত্রের মধ্যে উচ্চকোটির সাহিত্যমানসের সন্ধান পেয়েছিলেন। 'আশ্রম' পত্রিকায় তাঁর প্রথম কবিতা প্রকাশের পর প্রবীণ আচার্যগণের ভ্রু কুঞ্চিত হয়েছিল, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ প্রেমের স্বপ্ন-দেখা এই তরুণ কবিকে ভর্ৎসনার বদলে উৎসাহই দিয়েছেন, তাঁর কবিসত্তাকে সযত্নে লালন করেছেন। বস্তুত শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে অনেকেই পরবর্তী জীবনে নিজ নিজ ক্ষেত্রে খ্যাতিমান হয়েছেন, কিন্তু সাহিত্যের সার্বভৌম ক্ষেত্রে উজ্জ্বলতম নাম প্রমথনাথ বিশী।

কুড়ি-একুশ বছর বয়সেই প্রমথনাথের সাহিত্যপ্রতিভা স্ফুরিত হয়েছে। ১৯২১ সালে সজনীকান্ত রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎলাভের জন্য শান্তিনিকেতন যান। 'আত্মস্মৃতি'তে তিনি লিখছেন, 'এবারকার একক তীর্থযাত্রায় রবির যে গ্রহটি সর্বাপেক্ষা আমার চিত্ত আকর্ষণ করিলেন, তিনি হইতেছেন প্রমথনাথ বিশী। দেখিতে বালকের মত, বেঁটেখাটো কিন্তু তখনই খ্যাতিমান, অন্তত আমার প্রভূত হিংসার উদ্রেক করিবার মত তাঁহার খ্যাতি। কাব্যে গল্পে প্রবন্ধে ভ্রমণকাহিনীতে বিশ্ব-সাহিত্য-সমালোচনায় তখনই তিনি সার্থক সাহিত্যিক, তদুপরি রবীন্দ্রনাট্য, সংস্কৃত নাট্য ও যাত্রাগান অভিনয়েও যথেষ্ট কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছেন, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে সমীহ করিয়া চলেন।'

'সমীহ' কথাটা সুপ্রযুক্ত কিনা জানি না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে প্রমথনাথের সাহিত্যকৃতিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিতেন তার একটি প্রমাণ উদ্ধার করা যায়। ১৩৩০ সালের অগ্রহায়ণের প্রবাসীতে 'রথযাত্রা' নামে তাঁর একটি নাটিকা প্রকাশিত হয়। পরে তা 'রথের রশি' নামে 'কালের যাত্রা'র অঙ্গীভূত হয়েছে। প্রবাসীতে প্রকাশের সময় 'রথযাত্রা'র প্রথমেই কবি স্বীকার করেন 'আমার স্নেহাস্পদ ছাত্র শ্রীমান প্রমথনাথ বিশীর কোনও রচনা হইতে এই নাট্যদৃশ্যের ভাবটা আমার মনে আসিয়াছিল।' এই প্রসঙ্গে সাহিত্যিক সত্যরক্ষার জন্য একটা কথা বলা প্রয়োজন। রথযাত্রা বা রথের রশির ভাবটা প্রমথনাথেরও আগে কুমুদরঞ্জন মল্লিকের 'উজানি' কাব্যের প্রথম কবিতা 'চণ্ডালী'তে পরিস্ফুট হয়েছিল। উজানি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩১৮ সালে। রথযাত্রা রচনার সময় চণ্ডালীকে রবীন্দ্রনাথের মনে পড়ে নি। মনে পড়েছে কুমুদরঞ্জনের অধমর্ণ, নিজের স্নেহাস্পদ ছাত্রকে।

শান্তিনিকেতন পরিত্যাগের পূর্বেই প্রমথনাথের চারখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। 'ঘোষযাত্রা' নাটক [১৯২২], 'দেয়ালি' কাব্য [১৯২৩], 'দেশের শত্রু' উপন্যাস [১৯২৪], এবং 'বসন্তসেনা ও অন্যান্য কবিতা' [১৯২৭]। অর্থাৎ, মূলত কবি হলেও রসসাহিত্যের ত্রিবিধ প্রকরণ—কাব্য, কথাসাহিত্য এবং নাটকে তিনি যে দক্ষ শিল্পী একথা প্রথম থেকেই প্রমাণিত হয়েছে। কবি হিসাবে বসন্তসেনাতেই তিনি কাব্যরসিকসমাজের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। পরবর্তী কালে তাঁর উল্লেখ্য কাব্যগ্রন্থের মধ্যে আছে বিদ্যাসুন্দর, শকুন্তলা ও অন্যান্য কবিতা, হংসমিথুন, উত্তরমেঘ, কিংশুক বহ্নি প্রভৃতি। কবিধর্মে প্রমথনাথ রোমান্টিক প্রেমের কবি। তাঁর আত্মকথার শ্রেষ্ঠ বাহন হল সনেট ও সনেটকল্প চতুর্দশপদী কবিতা। 'বাংলা সাহিত্যে সনেট' গ্রন্থের লেখক বলেছেন, প্রমথনাথ বিশীই বাংলা সাহিত্যে সর্বাধিক চতুর্দশপদী কবিতার রচয়িতা। 'প্রাচীন আসামী হইতে' এবং 'প্রাচীন পারসীক হইতে'—এই দুটি কাব্যসংকলনে যথাক্রমে ১৩৩ ও ১৮০টি বিচিত্র রীতির চতুর্দশপদী কলিত হয়েছে। দেয়ালি এবং হংসমিথুনেও বিচিত্র গোত্রের একুশটি চতুর্দশী স্থান পেয়েছে। 'প্রাচীন আসামী হইতে'র কবিতাগুলি যখন রচিত হয় তখনো কবি শান্তিনিকেতনের ছাত্র। আত্মগোপনের প্রয়োজনেই তিনি অনুবাদকের ছলনা অবলম্বন করেছিলেন। ইংরেজি সাহিত্যে এলিজাবেথ ব্যারেটের 'সনেটস ফ্রম দ্য পর্টুগীজ'-এর মতোই 'প্রাচীন আসামী হইতে' এবং 'প্রাচীন

পারসীক হইতে' অনুবাদের ছদ্মবেশে কবির নিগূঢ় আত্মকথা।

প্রমথনাথের কবিপরিচয় কিছুটা চাপা পড়েছে তাঁর গল্প-উপন্যাস-নাটকের রচনাসম্ভারে। বঙ্গশ্রীতে 'পদ্মা' লিখে তিনি কথাসাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত হলেন। তারপর 'কোপবতী', 'চলনবিল', পেরিয়ে 'কেরী সাহেবের মুন্সী' লিখে প্রথম সারির ঔপন্যাসিকের খ্যাতি ও স্বীকৃতি পেলেন। অতীতচারী কল্পনায় ইতিহাসের প্রাণস্পন্দনকে ধরলেন লালকেল্লায়। পুনশ্চ ফিরে এলেন সদ্য-বিলীয়মান জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবারের উদয়াস্ত রচনার রসরহস্যে।

প্রমথনাথ বিচিত্রমনা বাণীশিল্পী। তাঁর মানসলোকের এক কোটিতে আছে রোমান্টিক প্রেমের কবি, অন্য কোটিতে ব্যঙ্গসুনিপুণ হাস্যরসস্রষ্টা। তাই একাধিক ছদ্মনামে তাঁর শিল্পব্যক্তিত্ব নব নব রূপ পরিগ্রহ করেছে। কখনো আনন্দবাজারের 'কমলাকান্তের আসরে'র কমলাকান্ত শর্মা, কখনো শনিবারের চিঠির 'নূতন কথামালার গল্প'-লেখক বিষ্ণু শর্মা। কিন্তু তাঁর প্রসিদ্ধতম ছদ্মনাম প্রনাবি। প্রনাবি বাংলা সাহিত্যের জি-বি-এস। প্রনাবি ঋণং কৃত্বা, ঘৃতং পিবেৎ, মৌচাকে ঢিল, পরিহাস-বিজল্পিতম্ প্রভৃতি রঙ্গ-ব্যঙ্গ নাটকের স্রষ্টা। প্রনাবিই আবার 'গালি ও গল্প', 'চাপাটি ও পদ্ম', প্রভৃতি ছোটগল্পের জন্মদাতা। যখন প্রসিদ্ধ ছোটগল্পকারগণের 'শ্রেষ্ঠ গল্প' প্রকাশিত হচ্ছে তখন বেরোচ্ছে প্রনাবির নিকৃষ্ট গল্প, নিকৃষ্টতর গল্প। এই বিপরীতধর্মী ব্যক্তিত্ব তাঁর সাহিত্যে যতটা বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছে ততটা উৎকর্ষ দিতে পেরেছে কিনা ভেবে দেখার বিষয়।

তা ছাড়া প্রমথনাথের সাহিত্যসাধনা রসসৃষ্টিতেই সমাপ্ত হয় নি, মননশীল প্রবন্ধ-নিবন্ধেও পূর্ণায়ত হয়েছে। বাংলার প্রবন্ধ-সাহিত্যে, বিশেষ করে সাহিত্যসমালোচনার ক্ষেত্রে, প্রমথনাথ সাহিত্যরসিক অধ্যাপক-জীবনের মহৎ কৃত্য সম্পন্ন করেছেন। তাঁর সাহিত্য-সমালোচনার মূলসূত্রটির ইঙ্গিত দিয়ে তিনি 'বঙ্কিম-সরণী' গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন, 'বঙ্কিম-সরণী তত্ত্ব-প্রণোদিত গ্রন্থ নয়, বঙ্কিমসাহিত্য পাঠে লেখকের আনন্দের প্রকাশ মাত্র। অর্থাৎ বইখানা লেখকের নিতান্ত ব্যক্তিগত অনুভূতি ও উপলব্ধির ফল।' মোটামুটিভাবে এই মূলসূত্র দিয়েই তাঁর সাহিত্য-সমালোচনার মূল্যায়ন করতে হবে। অর্থাৎ তাঁর সমালোচনা বিশুদ্ধ রসিকের রসদৃষ্টিসম্ভূত অলোচনা। এই রসদৃষ্টি নিয়েই তিনি উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যের দিক্‌পালগণের সাহিত্যবিচার করেছেন। 'বাংলা সাহিত্যের নরনারী'র চরিত্রচিত্রণেও এই দৃষ্টিই ক্রিয়াশীল। তবে এই দৃষ্টি সর্বত্র সুপ্রযোজ্য নাও হতে পারে। ব্যক্তিগত অনুভূতি ও উপলব্ধির সীমা আছে; তন্ময়ীভূত সহৃদয়তা না এলে সাহিত্যমূল্যায়ন বিঘ্নিত হয়।

প্রমথনাথ বিশীর সাহিত্যবিচারের কেন্দ্রভূমিতে আছেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর কাব্য, নাটক ও ছোটগল্পের আলোচনা প্রমথনাথের সমলোচনা-সাহিত্যের একটা বড়ো অংশ। 'রবীন্দ্রকাব্য-প্রবাহ' নিয়েই তাঁর যাত্রা শুরু। এই গ্রন্থেই তিনি রবীন্দ্রনাথকে নতুন পাদপীঠে স্থাপন করলেন। সন্ধ্যাসংগীত থেকে বলাকা পর্যন্ত ছিল তাঁর আলোচনার পরিধি। তাঁর প্রথম বক্তব্য ছিল, মানবমুখিতাই রবীন্দ্র-কবিপ্রতিভার প্রধান ধর্ম। তাই ভগবদ্‌মুখী গীতাঞ্জলি-পর্বকে তিনি তাঁর আলোচনায় বর্জন করেছিলেন। তাঁর দ্বিতীয় বক্তব্য ছিল, রবীন্দ্রনাথ মানবমুখী কবি হলেও সুখদুঃখপূর্ণ মানবজীবনের অন্তঃপুরে প্রবেশ করতে পারেন নি, সিংহদ্বারে বসে বাঁশি বাজানোই তাঁর নিয়তি। বলাই বাহুল্য, এই দৃষ্টি যে তন্ময়ীভূত সহৃদয়ের দৃষ্টি নয় তা পরিণত প্রজ্ঞায় প্রমথনাথ বুঝতে পেরেছিলেন। এই ত্রুটি তিনি সংশোধন করলেন প্রায় দুই যুগ পরে লেখা 'রবীন্দ্র-সরণী' গ্রন্থে। 'রবীন্দ্র-সরণী'তে গীতাঞ্জলি-পর্ব যথাস্থানে সংন্যস্ত হল, এবং রবীন্দ্রনাথ যে মানব-জীবনের অন্তঃপুরে প্রবেশ করতে পেরেছিলেন, এই সত্যও স্বীকৃত হল। প্রমথনাথের রবীন্দ্রপ্রতিভার মূল্যায়ন রবীন্দ্রসরণীতেই সার্থক হয়ে উঠল।

রবীন্দ্রনাথের পরে বাংলা সাহিত্যের সৃজনশীল ও মননশীল রচনার ক্ষেত্রে প্রমথনাথ বিশীর মতো সর্বতোমুখী প্রতিভার আবির্ভাব অল্পই হয়েছে। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে যাকে কল্লোল-যুগ বলা হয় সেই যুগেই তাঁর আত্মপ্রকাশ। কিন্তু তিনি কল্লোলের শরিক ছিলেন না। তিনি বিশ্বাস করতেন, পুরাগত ঐতিহ্যের সঙ্গে সমন্বিত হলেই নবাগত প্রতিভার স্ফুরণ সার্থক হয়। তাই প্রগতিপন্থীরা তাঁর শক্তিমত্তাকে স্বীকার করেও তাঁকে ঈষৎ রক্ষণশীল বলে মনে করতেন। কিন্তু সমকালের বিচারই শেষ বিচার নয়। কালান্তরের রুচিবদলের দিনেই চিরায়ত সাহিত্যের যথার্থ মূল্যায়ন ঘটে। আমাদের বিশ্বাস প্রমথনাথ বিশীর ন্যায্য পাওনা ভাবীকালের হাতেই রয়েছে।

জগদীশ ভট্টাচার্য

অরুণ ভট্টাচার্য

তাঁর দেহাবসানের সংবাদসূত্রে ৯ই মে ১৯৮৫-র দিনলিপিতে লিখেছি—আমাদের বিস্তৃত বয়েসকালের বিশিষ্ট এক কবিবন্ধু, সংগীত-সাধক, 'উত্তরসূরি'র অন্যতম পত্রকার অরুণ ভট্টাচার্যও 'মুখোমুখি বসিবার' নাক্ষত্রকাল অতীত হয়ে গেলেন।

এই দিনলিপি যা ছিল আমার একান্ত নিভৃতির শুদ্ধ পবিত্র পটচিত্র, নতজানু বিনতিতে যার অবলোকন ছিল সুধু আমারই অধিকারে, এক্ষণ যে তা বিবৃত করতে হবে তার কিছুই ভেবে উঠতে পারি নি। যেহেতু আমি এই দিনলিপিতে লিখেছিলেম অরুণের মৃত্যুর অতি স্বাভাবিক অথচ অপ্রার্থিত ঘটনার বিমূঢ় ভাবনায়, লিখেছি—বাসনালোকের এই নৌকা থামা অন্ধার্ত তীরে/হিরণ্যগর্ভ অমৃত আলো অনিল হাওয়ারে, প্রশ্বাসে/অনুচ্চারিত স্বরকুঞ্জে মালতি মিলিত বিনতি/অবিরল তুমিই রয়েছ তুমি সমর্পিত শৈশবে।

অরুণের দুরারোগ্য ব্যাধির কথা জেনেও ওর মুখোমুখি হবার মতো সাহসীও আমি হতে পারি নি। যতকাল আমাদের অস্তিত্ব ও স্মৃতি ততকাল যা ফুরাবে এবং ফুরাবে না তা না মনে করেও তো পারি না। সময় অকথ্য অলীক হলেও কী বলব, স্মৃতি বড়ো একটা অব্যাহতি দেয় না!

এই স্মৃতির কথায় আমি খুব মনে করতে পারি তিরিশ বছর কিছু আগে এবং তদবধি তিরিশ বছর পরবর্তী কালের কথা।

অরুণ তখনও তিরিশোর্ধ-বয়েসি নয়, অতিশয় যুবক, অথচ 'সায়াহ্ন' নামক ওর কবিতাগ্রন্থ তৎকালে প্রকাশিত হয়েছে। 'উত্তরসূরি'র প্রথম বর্ষ প্রকাশকালে এক সংখ্যায় দেখছি ওর সেই কাব্যগ্রন্থের পর্যালোচনায় লিখেছি "এক স্নিগ্ধ সংবেদনার নিচু গলার স্বরই উচ্চারিত হয়েছে তার কবিতায় —তবু তো ভাবিনি আমার তোমার অথবা সকলের মনে/কখন বৈশাখ এসে গেছে/ভরে দিয়ে গেছে এই হৃদয়কে কি এক নিবিড় উত্তাপে।।" তদবধি অরুণের কবিতার ঐসকল সুবেদী উপাদানে আমি প্রতিস্পন্দিত হই।

আমার মনে পড়ছে ১৯৫২ বা ওই সমসাময়িক কালে এই শহরের উপান্ত সিঁথি অঞ্চলে একদিন এক ইটবাঁধা রাস্তায় বকুল ঝরেছিল। এই শহরে তখনও বকুলঝরা পথে বন্ধুজনের সাক্ষাৎকার অসম্ভব ছিল না, এবং এই পথেই একদিন অরুণকে দেখেছিলাম—সেই সুস্মিত, শুভ্র, কৃশ এবং বেদনাহত অরুণের সেই মুখের আলো পড়ন্ত বেলার এক শুদ্ধ বিনম্রতায় মাখামাখি হয়েছিল। মনে রেখেছি এক কিশোরীর প্রণয়ে প্রাণপণ হয়ে সেদিন অরুণ এই অঞ্চলে একটি বাসগৃহের সন্ধানে এসেছিল। অরুণের সঙ্গে সেই পরিচয়ের আরম্ভকাল এতই চমৎকার এবং অন্তরঙ্গ ছিল যার ফল হল অভাবিত—আমারই বাসগৃহের বিপরীত এক বাড়িতে অরুণ গৃহস্থ হল। আচরণে গৃহস্থ আত্মায় মহাসরস্বতীর এক সাধক 'সিদ্ধকর্মী'র অন্তরঙ্গ ও যথাযথ জ্ঞান এবং সূক্ষ্মবোধ আর ধৈর্য তার অন্তর্জ্ঞানী মনের সচেতন হস্তের পরিচ্ছন্ন নিভুলতা সরস্বতীর সাধন প্রসাদেই অরুণ অবিরত ছিল। সেইসব দিনে সবিস্ময়ে, শ্রদ্ধায় অরুণের কাব্য-সংগীতচর্চার তন্ময়তা দেখেছি। ওস্তাদ আতা হোসেনের নিকট শাস্ত্রীয় সংগীত শিক্ষাকাল থেকে স্বামী প্রজ্ঞানন্দের সংগীত-গবেষণার নির্দেশনা লাভ, রবীন্দ্রসংগীতে আচার্য শৈলজারঞ্জনের স্নেহসান্নিধ্য অরুণকে কীরূপ সংগীতসাধনায় তন্নিষ্ঠ ও মৌলিক ভাবনায় নিযুক্ত রেখেছিল তা সিদ্ধকর্মীর যথাযথ আর অন্তরঙ্গ জ্ঞানেরই পরিচয় দেবে।

এই সুবাদে 'স্টেটসম্যান' দৈনিকে আমাদের এক বন্ধু, বার্তাসম্পাদক, অরুণকে ওই পত্রিকায় সংগীতালোচকের কর্মে নিযুক্ত করেছিল। অনেক কাল যোগ্যতার সঙ্গে অরুণ সে কাজ করে গেছে।

অরুণের সংগীতে গবেষণাকর্মের শাস্ত্রীয় সংগীতের গবেষণামূলক পুস্তক 'এ ট্রিটিজ অন এনসিয়েনট হিন্দু মিউজিক' পরবর্তী কালে প্রকাশিত হয়েছিল। এই সংগীতের তন্নিষ্ঠ চর্চার কারণে অরুণ সরকারি চাকরি থেকে স্বেচ্ছা-অবসর নিয়েছিল (১৯৭৬), এবং শেষ অবধি রবীন্দ্র-ভারতী, বিশ্বভারতী এবং খয়রার সংগীতবিভাগে অধ্যাপনার কাজ করেছিল, ক্রমান্বয়ে।

এই স্মৃতিচারণায় অরুণের সুদীর্ঘকাল সংগীত আর সাহিত্য এবং কাব্যের পঞ্জীকরণ সম্ভব নয়। বারংবার সেই পঞ্চাশ দশকের আরম্ভকালের কথাই আমার মনে পড়ছে। আমার মনে পড়ছে 'উত্তরসূরি' পত্রিকার প্রকাশ-উদ্যোগের কথা। এই পত্রিকার যিনি নামকরণ করেছিলেন এবং একটিমাত্র সংখ্যা সম্পাদনা করেছিলেন, তিনি প্রয়াত অঙ্কুর মুখোপাধ্যায়। পুনর্বার যে উদ্যোগ হল (১৯৫৫)—তা ওই সিঁথি অঞ্চলে কতিপয় নবীন-লেখক-যুবক-বন্ধুদের সমবায়ে। এই সমবায়ে উল্লেখ্য কৃতী সাহিত্যিক গৌরকিশোর ঘোষ, বিমল কর যেমন ছিলেন, ছিলেন পঞ্চাশের সর্বাপেক্ষা উল্লেখনীয় কবি প্রয়াত অরুণকুমার সরকার।

এই পত্রিকার প্রকাশে সহৃদয় কাব্য আর সাহিত্যানুরাগী দলমতনির্বিশেষে অনেকেই ছিলেন এবং ওই পত্রিকার সম্পাদনাক্ষেত্রে শিবনারায়ণ রায় এবং নারায়ণ চৌধুরীর মতো দুজন শ্রদ্ধেয় অগ্রজকে দুই সম্পাদক নির্বাচিত করেছিলাম আমরা। দুই সম্পাদক সাহিত্যের চিন্তাভাবনায় অদ্বৈত ছিলেন না, তবু পত্রিকা চলেছিল এক বছর। অতঃপর সিদ্ধান্ত হল, অরুণ একক-ভাবে উত্তরসূরি পত্রিকার সম্পাদক এবং পরিচালনার দায়িত্ব নেবে। এই সিদ্ধান্তে আমরা উৎসাহী ছিলাম, কেননা ধৈর্য আর পরিশ্রমী সততায় অরুণ আমাদের মাথা নুইয়ে দিত।

সাহিত্য ও শিল্পভাবনা এক প্রাতিস্বিক কর্ম—আমরা অনেকেই এই চিন্তাভাবনায় সমদর্শী ছিলাম না, না ছিল আমাদের সমাধিকার। কিন্তু 'উত্তরসূরি' পত্রিকার পরিমণ্ডলে পঞ্চাশ দশকের প্রথমার্ধে প্রতিশ্রুতি-সম্পন্ন প্রতিষ্ঠিত অনেক তরুণ এবং অগ্রজ কবির সাহিত্যিকের সহৃদয়তা ও সৌহার্দ্যের ভিন্নতা ছিল না এই সৌহার্দ্য ছিল আমাদের বহুধাবিস্তৃত —২০২ রাসবিহারী এভেন্যুর 'কবিতা-ভবনে' বুদ্ধদেবের সান্নিধ্যে, ৫৪

গণেশ এভেন্যুর 'পূর্বাশা' পত্রিকার সম্পাদক সঞ্জয় ভট্টাচার্য এবং 'চতুরঙ্গ' পত্রিকার অধ্যাপক হুমায়ুন কবির আর প্রয়াত বন্ধু আতাউর রহমানের বৈঠকী গৃহে। এই প্রসঙ্গে, স্মরণ করতে পারি আমরা যারা কতিপয় প্রতিবাদী অথচ কবিতা-সাহিত্য-শিল্পে অনুরক্ত ও বিরক্ত যুবক ছিলাম, 'উত্তরসূরি' পত্রিকার পাদপীঠে বহু বৈঠকী জমায়েত করেছি, সিঁথি অঞ্চলের সেইসব বৈঠকী আড্ডায় কবিতা ও সংগীত ছিল সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত উপাদান যা আমাদের সুন্দর আর শুদ্ধ চেতনাকে প্রতিস্পন্দিত করত, এবং যে কারণে অরুণ এবং 'উত্তরসূরি'র সুবেদী তরুণেরা তৎকালে বুদ্ধদেব, জীবনানন্দ, বিষ্ণু দে, অমিয় চক্রবর্তীর মতো অগ্রজ কবিদের স্নেহধন্য ছিল—এবং আমাদের অনায়াসলব্ধ হয়েছিল অতুল গুপ্ত, হিরণকুমার সান্যাল এবং প্রখ্যাত বহু গুণিজনের আনুকূল্য। উৎসাহের হাত তাঁদের সদাই প্রসারিত ছিল উত্তরসূরি পত্রিকার প্রতি। সেই সকল উৎসাহ-আনুকূল্যের ফলশ্রুতি হিসাবে 'উত্তরসূরি' আরম্ভকালে ওই পত্রিকায় যুক্ত অধিকাংশ যুবজনের দ্বারা কলকাতায় বঙ্গসংস্কৃতি সম্মেলনের প্রবর্তনের কথা স্মরণ করতে হবে এবং স্মরণ করব সেই যুবকদের কলকাতার পথে 'আরও কবিতা পাঠের' অভাবিত মিছিলের কথা। ১৯৫৬-৫৮ তে কলকাতায় রবীন্দ্রভারতী প্রাঙ্গণে 'কবিতা-মেলা'র যে-সকল অনুষ্ঠান সম্ভব হয়েছিল তাও উত্তরসূরি পত্রিকার অন্যতম সাহচর্যেরই অবদান। ঐ অনুষ্ঠানে বুদ্ধদেব বসু এবং সঞ্জয় ভট্টাচার্যকে কবির মানপত্র নিবেদন 'উত্তরসূরি'র যুবকরাই গৌরব অর্জন করেছিল। কোনও প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা নয় বা কোনো দলের মুখপত্র নয়, 'উত্তরসূরি'র দীর্ঘ তিরিশ বছরের সাহিত্য, কবিতা, শিল্প, সংগীতের শুদ্ধ নির্মাণকর্মে অরুণ যে ফলাকাঙ্ক্ষায় নিষ্পৃহ আর তন্নিষ্ঠ প্রয়াস ওই পত্রিকার প্রকাশ ও সম্পাদনকর্মে আমৃত্যু অব্যাহত রেখেছিল তা বিস্ময়কর। এই ভগ্নদশা অথচ আমাদের অতীব ভালোবাসার কলকাতা শহরে যখন পুরস্কার আর প্রাতিষ্ঠানিক মূল্যমানে শিল্পমন্দিরের নিভৃতি এবং শুদ্ধতাকে ক্রমাগত ঘুইয়ে ফেলা হচ্ছে তখন অরুণ ভট্টাচার্যের সাধনকর্মের কোনো তোলমানই খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। সম্ভবত আজ আর অন্য কারও কথা বড়ো বেশি করে ভাবা যাবে না যিনি অরুণ ভট্টাচার্যের মতো প্রাতিষ্ঠানিক আনুকূল্য বিনা সাহিত্য-শিল্পের অনপেক্ষ পত্রকাররূপে মহাসরস্বতীর শুদ্ধতায় নিজেকে সম্পূর্ণ উৎসর্জন করতে পেরেছেন।

সন্তোষ গঙ্গোপাধ্যায়

অরুণ ভট্টাচার্যের কয়েকটি বিশিষ্ট সাহিত্যকর্ম কাব্যগ্রন্থ—সায়াহ্ন, মধ্যরাত্রি, সময় অসময়ের কবিতা।

পাঠকের দৃষ্টিতে

প্রসঙ্গ : ভবতোষ দত্তের প্রবন্ধ 'প্রগতি এবং দারিদ্র্য'

১

১৯৫০-এর চেয়ে ১৯৮৫-র এই ভারতবর্ষে কৃষিতে উৎপাদন, শিল্পে উৎপাদন, জাতীয় আয়, মাথাপিছু আয়—সমস্তই অপেক্ষাকৃত বেশি। অর্থাৎ, আমরা এগিয়েছি। স্বাভাবিক নিয়মেই প্রগতির হাত ধরে আমাদের এই এগোনো। স্বাভাবিক এ কারণে যে সভ্যতা এগোচ্ছে। ব্লোতের সে টানেই তো এগিয়ে এলাম ক-বছরে। তবে গোটাটাই যে টানে টানে এমন তো নয়। বিনা চেষ্টায় কি আর কিছু লাভ করা যায়? সেদিক দিয়ে, এই যে 'প্রগতি', তার 'কৃতিত্ব' থেকে রাষ্ট্রকে বঞ্চিতই বা করি কিভাবে?

১৯৫১-র ১ এপ্রিল (রসিকতা তো নয়, বাস্তবিকই এমন দিনেই যে পড়ল) থেকে শুরু করে ছ-ছটা পরিকল্পনা পেরিয়ে এলাম। রাষ্ট্র প্রতিক্ষণেই স্মরণ করালেন যে, দেশের অর্থনৈতিক ভাগ্যনিয়ন্তা তাঁরাই (অবশ্য, কয়েকটি ছোটো-খাটো ক্ষেত্রে, যেমন, ওপেক তেলের দাম বাড়ালে—ভারত কীই বা আর করতে পারে?)। কিন্তু, পরিকল্পনার অভিজ্ঞতায় যা কিছু উল্লাস, সে তো, গ্রাফ আর চার্টে। সময়বিশেষে যা সংখ্যাসমষ্টি ছাড়া আর কিছুই তো নয়। দেশের বড়ো অংশ যে গরিব, হায়! স্বাধীনতার প্রায় চার দশক পরেও, সে গরিবই রয়ে গেল।

গোড়াতেই বলা হল, ভারতীয় অর্থনীতিকে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচ দেওয়াটাই নাকি উদ্দেশ্য। সেইমতোই পর পর পাঁচশালা পরিকল্পনা। পরবর্তী কালে আধুনিক ভারতে মূলতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বা ওই ব্যবস্থাভিত্তিক পরিকল্পনাকেই শ্রেয় বলে মনে করা হচ্ছে। পরিকল্পনার ভিত্তি যে 'মডেল', সেই মডেল সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতেই কত দ্বিধা। যে মডেলকেই ভিত্তি করা হোক না কেন, পরিকল্পনার সাফল্য নির্ভর করে পরিকল্পনাটি মডেলের সঙ্গে তাল মেলাতে পারল কি না তার উপর।

একমাত্র প্রথম পরিকল্পনা ছাড়া এতাবৎ বাকি পাঁচটিই লক্ষ্যপূরণে ব্যর্থ। ব্যর্থতার আপাত কারণ—ক. অধিকাংশ নীতিরই কোনো আঙ্কিক রূপ দেওয়া যায় নি। খ. নীতিগুলোর প্রাসঙ্গিকতার প্রশ্নটি এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। গ. লক্ষ্যগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক যথেষ্ট অস্পষ্ট থেকে গেছে। ফলে লক্ষ্যটা যে আদৌ কী, সেই সম্পর্কে সংশয়ের অবকাশ থেকে যায়।

সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির মূল পদক্ষেপ হল গুরুত্বপূর্ণ শিল্পগুলির রাষ্ট্রায়ত্তকরণ। সেই কাজটা কিন্তু সঠিকভাবে পালিত হল না। অবশ্য, 'গুরুত্বপূর্ণ' শব্দটির গোলমেলে ব্যবহার যদি খানিকটা প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে থাকে তবে সে দোষ না হয় ভাষারই, নীতিনির্ধারকদের নয়। সুতরাং 'সমাজতন্ত্র' তার যাবতীয় ঔজ্জ্বল্য নিয়ে আমাদের সংবিধানের প্রস্তাবনাতেই শুধু এখন বিরাজমান।

অবশেষে, বর্তমান ভারতের অর্থনীতি বাস্তিগত মূলধনের মালিকদের উদ্যোগের উপর অধিক মাত্রায় বিশ্বাসী হতে শুরু করেছে। এক্ষেত্রে দুটি বিষয়ের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে, প্রথমত দেশীয় মূলধনীদের বেশি মাত্রায় সুযোগ-সুবিধা দান, এবং দ্বিতীয়ত বহুজাতিক সংস্থাগুলিকে সুযোগ-সুবিধা দান। উদ্দেশ্য, বিদেশী কারিগরির সাহায্যে দেশীয় মূলধনীরা প্রগতির পথ যাতে আরো মসৃণ করতে পারেন তেমন ব্যবস্থা করা।

দেশীয় মূলধনীরা সুযোগ পেলে দেশে বিনিয়োগ বাড়বে, ফলে অর্থনীতি পুনরুজ্জীবিত হবে—তত্ত্বটি সহজ। কিন্তু বাস্তবে রাষ্ট্র সম্পদ সংগ্রহে ব্যর্থ। ফলে, ওই 'সুযোগ'-টুকুও যথাযথ তৈরি করে দেবার ক্ষেত্রে অসুবিধার সম্মুখীন। এ ছাড়া দেশের বাজারে স্থিতাবস্থা চলছে। মানুষের ক্রয়-ক্ষমতা বাড়ছে না। চাহিদা নেই। অতএব দেশীয় মূলধনীরা আদপেই বিনিয়োগে উৎসাহিত হবেন কিনা সেই প্রশ্নের সদুত্তর নেই। অতএব এই তত্ত্বটির সাফল্য যেখানে রাষ্ট্রের ভূমিকার উপর অনেকাংশেই নির্ভর করছে সেখানে রাষ্ট্র জমি বা ইনফ্রা-স্ট্রাকচার-তৈরির কাজটি কিভাবে সমাধা করবেন, সেটা এখনও স্পষ্ট নয়।

আমদানি নীতিটিকে সরলীকরণের মাধ্যমে বিদেশী কারিগরিকে নিমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। আশা, ভবিষ্যতে আমরাও কারিগরিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে পড়ব। বহুজাতিক সংস্থাগুলির বিনিয়োগের উপর ভিত্তি করে দেশ এগোতে পারে না। তাদের কারিগরিটুকু সাময়িকভাবে সাহায্য করে যাতে ভবিষ্যতে সেই কারিগরিকে আয়ত্ত করা যায়।

উন্নত কারিগরির আমদানির ফলে ভারতে ইলেকট্রনিক্স বিলাসদ্রব্যের যোগান বাড়ছে। কিন্তু সেক্ষেত্রে ভারতীয় মূলধনীদের কাজটুকু হচ্ছে নানা যন্ত্রাংশ একত্র করে দ্রব্যটির পূর্ণাঙ্গ রূপ দেওয়া বা আমদানি দ্রব্যটিই বাজারে বিক্রি করা। কাজটা অনেকটা বিক্রয়-প্রতিনিধির মতো। যেমন মারুতি-সুজুকি গাড়ির ক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে সোজাসুজি প্রায় গোটা গাড়িই আমদানি করা হয়েছে।

ইলেকট্রনিক্স শিল্প হিসেবে প্রচণ্ড গতিশীল। কিন্তু এই গতিশীলতার সঙ্গে ভারতীয় কারিগরি ভবিষ্যতেও যে পাল্লা দিতে পারবে, অতীত অভিজ্ঞতা সেটা কিন্তু নিশ্চিত করতে পারে না। গত পঞ্চাশ বছরে যেমন মোটরগাড়ির ক্ষেত্রে ভারতীয় অগ্রগতির হার উল্লেখযোগ্য নয়। ফলে, সন্দেহটা রয়েই যাচ্ছে।

ভারতীয় অর্থনীতির অন্য সমস্যা হল বিদেশী ঋণের

বোঝা। লক্ষণীয় যে এক্ষেত্রে, ভারতের অবস্থা অনেকটা ফাঁদেপড়া শিকারের মতো। আশঙ্কা, ভারত কবে থেকে শুধু ধার মেটাবার জন্যেই ধার নেওয়া শুরু করবে।

ফলে, গোটা ছবিটাই অত্যন্ত অস্পষ্ট, একটা ধাঁধার মতো। নীতিনির্ধারকদের বাস্তবজ্ঞানের অভাবকে এমন অবস্থার জন্য দায়ী করতে হলে পর্যাপ্ত ধৃষ্টতার প্রয়োজন। আবার, ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের শ্রেণীচরিত্র চিহ্নিত করার কাজটাও যথেষ্ট বিতর্কিত। অতএব, অঙ্ক তো কিছুতেই মেলে না।

পুষ্কর গুপ্ত
ব্লক বি, ২১২ বাঙুর অ্যাভিনিউ,
কলকাতা

২

প্রবীণ অর্থনীতিবিদ ড. ভবতোষ দত্তের লেখাটির মধ্যে একটা রোম্যানটিক অপটিমিজম বড়োই প্রকট হয়ে উঠেছে। রেটরিক আর রিয়লিটি কতটা অসমঞ্জস, সেসব প্রশ্নে তিনি একেবারেই ঢুকতে চান নি, এবং সুন্দর এই যুক্তি দিয়েছেন যে, যেহেতু ওইসব নিয়ে অনেক জায়গায় অনেক কিছু লেখা হয়েছে তাই ওইসবের উল্লেখ তিনি জ্ঞানতই করছেন না। উনি যে বিষয় নিয়ে লিখতে বসেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত যা লিখেছেন তাতে যে রেটরিকের প্রাধান্য—সেও তো খুব পুরনো কাসুন্দি।

তৃতীয় অনুচ্ছেদে ড. দত্ত লিখেছেন, "অবশ্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির কথা আলাদা...তবে এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, ওইসব দেশে উচ্চতম আয় এবং নিম্নতম আয়ের মধ্যে এবং বিশেষত উচ্চতম সম্পদাধিকার আর নিম্নতম সম্পদাধিকারের মধ্যে পার্থক্য অন্য দেশের তুলনায় অনেক কম।'—ধরে নেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। বর্তমানে আমাদের হাতে যেসব তথ্য আছে বা আসছে, তা থেকে স্পষ্টভাবেই একথা বলা যায়। যেমন, চীনে ইনসেনটিভ-কাম-পেনালটি সিসটেম কাজ করে চলেছে।

ভবতোষবাবু লিভিং ওয়েজেস, মিনিমাম ওয়েজেস—এইসব লেজিসলেশনের কথাই জোর দিয়ে বলেছেন, (রেটরিক এবং রিয়লিটির মধ্যে পার্থক্য যে অনেকখানি তাও স্বীকার করে নিয়েছেন দ্বাদশ অনুচ্ছেদের শেষের লাইনগুলিতে)। যে দেশে ১ কিমি দূরের জায়গা থেকে রোজ পানীয় জল আনতে হলেও সেই গ্রামকে প্রবলেম ভিলেজ বলা হয় না, সেখানে জনকল্যাণ কথাটা শোভা পায় না।

ষষ্ঠ-সপ্তম অনুচ্ছেদে অ্যাবসলিউট পভার্টির কথা বলতে গিয়ে তিনি কিছু রিলেটিভ মেজার নিয়ে অনেক কিছু বলেছেন এবং শেষ পর্যন্ত এ ধরনের বিশ্লেষণের অসারত্ব স্বীকার করে নিয়েছেন। বিলাস-উপকরণ উৎপাদনের দিকে ঝোঁক আছে এবং এই ঝোঁক সার্বিকভাবে অর্থনৈতিক স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর একথা তিনি লিখেছেন। কিন্তু এই ঝোঁক কেন, সে অনুসন্ধান এই লেখায় নেই। ৯৫৮ পৃষ্ঠায় ২৩ অনুচ্ছেদে যেখানে তিনি প্রশাসনিক স্থবিরতার কথা বলেছেন, তার সঙ্গে ৯৬১ পৃষ্ঠার ৪০ অনুচ্ছেদে প্রশাসনিক দক্ষতার যে প্রসঙ্গ, তা খাপ খায় না। বর্তমান অবস্থার হাত থেকে মুক্তি পেতে তিনি যে পথ নির্দেশ করেছেন তা প্রশাসনিক স্থবিরতার আবর্তেই ঘুরপাক খাবে।

মাও সেতুঙের নিউ হিউম্যান কনশাসনেসের প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত আজ আমাদের চোখের সামনে। ঠিক তেমন কিছুই আজ আমাদের দরকার। চীনেও সারপ্লাস পকেট থেকে ডেফিসিট পকেটে ট্রানসফারের ব্যাপার আছে। এই ব্যবস্থাকে যেখানে কেউ বৈষম্যমূলক মনে করে না।

এখানে, যোজনার আয়তন, প্রায়রিটি, এমন কি প্ল্যানিং হরাইজন—সবই রাজনৈতিক দাদাদের মুখাপেক্ষী। এর হাত থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় সোশ্যাল ট্রানসফরমেশন ; নয়তো এই ঘুনধরা আবর্তে ছোটোখাটো পরিবর্তন হারিয়ে যাবে।

অসীমকুমার মুখোপাধ্যায়
সি-ডি, ১৬২ সল্ট লেক
কলকাতা-৬৪

৩

গোপন রোগ গোপনে রাখার মতো আমাদের অর্থনীতিবিদেরা যে সত্যটি সযত্নে গোপন রাখার চেষ্টা করে যান, তা হল সমাজে শ্রেণীসমূহের অবস্থান, এবং শ্রেণীগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক। একথা অপ্রিয় হলেও সত্য যে, সংবিধানের সমাজতান্ত্রিক প্রস্তাবনার আড়ালে আমাদের দেশে প্রকৃতপক্ষে মূলধনশাসিত অর্থনৈতিক কাঠামোই বিদ্যমান—অনিবার্যভাবে যার মৌল নীতিই হল শোষণ। এটি এমনই একটি ব্যবস্থা যার মধ্যে দেখা যায় কোনো ব্যক্তি যত অর্থ-সম্পদের মালিক হোন না কেন, সেই সম্পদ কতদিন স্থায়ী হবে তার কোনো গ্যারানটি নেই। এই অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মোকাবিলার জন্য আমরা সবাই কত বেশি পরিমাণ অর্থ আর সম্পদ সঞ্চয় করতে পারি তার জন্যই প্রাণপাত করে চলেছি। ওভারটাইম থেকে উৎকোচ গ্রহণ—সবই ওই একই উদ্দেশ্যে। ভেজাল দেওয়া থেকে কর ফাঁকি প্রভৃতি সমস্ত অর্থনৈতিক অপরাধের ওই একটিই উৎস—অনিশ্চিত ভবিষ্যতের আতঙ্ক। কিন্তু সকল মানুষের অর্থ উপার্জন করার ক্ষমতা এবং উপার্জিত অর্থকে রক্ষা করার ক্ষমতা সমান নয়। তাই ক্ষমতার তারতম্য অনুসারে সমাজের বিভিন্ন মানুষের হাতে বিভিন্ন পরিমাণ অর্থ আর সম্পদ কেন্দ্রীভূত হচ্ছে। এরই পরিণতি হল একদিকে মুষ্টিমেয় মানুষের হাতে অপরিমেয় অর্থ আর সম্পদের পাহাড়, অন্যদিকে ক্রমবর্ধমান বিত্তহীন মানুষের সংখ্যা।

এই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতবর্ষে আজকের সমাজের শ্রেণীচরিত্রটি বিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে। পুরাতন মার্কসবাদী ধারণার বশবর্তী হয়ে সমাজকে কেবলমাত্র শোষক-শোষিত বা মালিক-শ্রমিক এই দু-ভাগে বিভক্ত দেখলেই চলবে না। কার্যত, সম্পদের সাথে সম্পর্ক ঘিরে আমাদের বর্তমান সমাজে তিনটি শ্রেণীর অবস্থান রয়েছে,—১. মালিক, ২. শ্রমিক-কর্মচারী ৩. সম্পদহীন। বলা বাহুল্য, তৃতীয় শ্রেণীর মানুষেরাই সামাজিক আর আর্থিক দিক থেকে সবচেয়ে পিছিয়ে-পড়া শ্রেণী। পরিসংখ্যান বলে এরাই অন্য দুই শ্রেণী অপেক্ষা সংখ্যায় অনেক বেশি, যদিও অনগ্রসর।

মালিকশ্রেণী যেমন চায় না অন্য কেউ এসে তাদের মালিকানায় ভাগ বসায়, তেমনি এই শ্রমিক-কর্মচারীও চায় না নীচুতলার মানুষ উঠে এসে তাদের জীবন আর জীবিকার উপর ভাগ বসায়। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষেরাই হল বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ, প্রশাসক এবং প্রশিক্ষক। এদেরই উপর দায়িত্ব আছে দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচীর সকল রূপায়ণের। দ্বন্দ্বটা এইখানেই। এই প্রসঙ্গে ভারত সরকারের ডিপারটমেনট অব পারসোনেল অ্যানড অ্যাডমিনিসট্রেটিভ রিফরমস-এর জয়েনট সেক্রেটারি শ্রীহরিমোহন মাথুরের একটি উক্তি প্রণিধানযোগ্য : তিনি জারনাল অব রুরাল ডেভলাপমেনট (খণ্ড ২, সংখ্যা ৩, ১৯৮২) পত্রে তাঁর 'রুরাল ডেভলাপমেনট ইন ট্র্যাডিশনাল সোসাইটিজ : অ্যান অ্যানথ্রোপলজিক্যাল পারসপেকটিভ' প্রবন্ধে এক জায়গায় লিখেছেন, "তৃতীয় বিশ্বের বেশির-ভাগ পরিকল্পনাকার আর প্রশাসকরা আসেন নাগরিক প্রতিবেশ থেকে। তাঁদের জগৎ আর গ্রামের দরিদ্রদের জগৎ একেবারেই ভিন্ন।"

শ্রীমাথুর গ্রামীণ উন্নয়ন প্রসঙ্গে কথাটি বললেও এটি গ্রাম এবং শহর উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। সুতরাং সম্পূর্ণ 'প্রতিদ্বন্দ্বী শ্রেণীর মানুষের মাধ্যমে দরিদ্র শ্রেণীর সামাজিক এবং আর্থিক উন্নয়নের আশা আত্মপ্রতারণা।

তাহলে প্রশ্ন আসবে, বিদেশের মাটিতে আমাদের কারিগরি প্রশাসকদের সার্থকতার কারণ কী? কারণ একটাই। সেখানে এই শ্রেণীপ্রতিদ্বন্দ্বিতার ভয় নেই, বরং সময়মত সার্থক রূপায়ণে উপার্জন বেশি হওয়ার সম্ভাবনা।

তবে কি এদেশের মানুষের দারিদ্র্যমুক্তির কোনো উপায় নেই? যতদিন শ্রেণীবিভক্ত সমাজ থাকবে ততদিন অন্তত নয়। বিদেশের কাছে দেনায় দেনায় চুল বিকিয়ে গেলেও গরিব মানুষের জন্য চিড়ে, গুড়, পলিথিন শীট আর সময়ে সময়ে কিছু নগদ ডোল ছাড়া কিছুই মিলবে না।

পৃথ্বীশ সানা
৭৬ টালিগঞ্জ রোড
কলকাতা-৩৩

৪

বাঙলা ভাষায় অর্থনীতির কতকগুলি জটিল আর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করে ড ভবতোষ দত্ত সাধারণ আগ্রহী পাঠকের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। আলোচ্য নিবন্ধেও ড দত্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ের অবতারণা করেছেন। স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমাদের অগ্রগতি হয়েছে নিঃসন্দেহে, কিন্তু দেশের জনসংখ্যার ব্যাপক অংশ এখনও 'দারিদ্র্যসীমা'র নীচেই রয়ে গিয়েছে। উত্তরোত্তর এই অবস্থার অবনতিই ঘটছে, সোজা করে বলতে গেলে—ধনী আরও ধনী হচ্ছে, গরিব আরো গরিব হচ্ছে। দেশের সম্পদ এবং সৃষ্ট সম্পদের বেশির ভাগটাই কুক্ষিগত করেছে মুষ্টিমেয় একটা শ্রেণী। আজকের অবস্থা : জনসংখ্যার প্রায় আধাআধি দারিদ্র্যসীমার নীচে—গ্রামাঞ্চলে বা শহরাঞ্চলে এই সংখ্যার কিছু তারতম্য অবশ্য রয়েছে, কিন্তু মূল বিষয়ের ক্ষেত্রে তাতে হেরফের কিছু হচ্ছে না। একদিকে নিদারুণ দারিদ্র্য, বেকারি, অনাহার ; অপরদিকে সম্পদের একচেটিয়া আধিপত্য। স্বল্পপরিসর রচনায় সহজ কিছু পরিসংখ্যানে বিষয়টিকে অধ্যাপক দত্ত আমাদের কাছে স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন।

কিন্তু সম্পদবণ্টনের এই যে বৈষম্য, আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার বিশেষ সম্পর্কেই তা নিয়ন্ত্রিত। তাই সমস্যার কথা যত স্পষ্ট করে ফুটে উঠেছে, তার সমাধানের যে পন্থার কথা তিনি উল্লেখ করেছেন, তা আমাদের দ্বিধার সম্পূর্ণ অবসান ঘটাতে পারে নি। আমাদের দেশটা বড়ো, বিরাট জনসংখ্যা, বিভিন্ন ধরনের জটিল সমস্যা রয়েছে নিঃসন্দেহে ; কিন্তু আমরা স্বাধীন হয়েছিও প্রায় চল্লিশ বছর, তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে পরিকল্পিত অর্থনীতির পথ গ্রহণ করেছি, বস্তুত ব্যাপক জনসংখ্যার পক্ষে অবস্থা সবটাই প্রতিকূল, সার্বিক পরিস্থিতিও জটিলতর হয়েছে মাত্র। শিল্পের অনগ্রসরতা আর শিল্পায়নের শ্লথগতি, পাশাপাশি মূলধনের কেন্দ্রীভবন, বিদেশী মূলধনের আধিপত্য—শিল্পক্ষেত্রে এটাই প্রধান চিত্র। অপরদিকে কৃষি-অর্থনীতির অবস্থা আরও হতাশাজনক—আমাদের দেশ কৃষিপ্রধান, অথচ কৃষিব্যবস্থায় ব্যাপক পশ্চাৎপদতা। দেশের উৎপাদন-কর্মীর দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশি কর্মী কৃষিতে নিযুক্ত ; খেতমজুর, ভূমিহীন কৃষক, বর্গাদার বা ক্ষুদ্রচাষীর ব্যাপক সংখ্যাধিক্য—যাদের হাতে আবাদযোগ্য জমির খুব কম অংশই রয়েছে। ধনী চাষি বা জোতদারের হাতেই চাষের জমি এবং অন্যান্য উপকরণের সিংহভাগ।

দেশের সংখ্যাধিক মানুষের দারিদ্র্য এবং সম্পদবণ্টনের বৈষম্য বিশেষ-সমাজব্যবস্থাপ্রসূত ঘটনা। হঠাৎ কি কোনো গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছে যে আমরা এই অবস্থার অবসান ঘটিয়ে সম্পদবণ্টনে সাম্য প্রতিষ্ঠার আশা করতে পারব? সার্বিক দারিদ্র্যমোচন সম্ভব হবে? এ কি কোনো প্রশাসনিক

সদিচ্ছা বা তথাকথিত দৃঢ় সংকল্পের সমস্যা? প্রায় চল্লিশ বছর ধরে আমরা অনেক প্রতিশ্রুতি পেয়েছি, কিছু কিছু সদিচ্ছা বা দৃঢ়সংকল্পও হয়তো ছিল, গ্রামাঞ্চলে দারিদ্র্য দূরীকরণের অনেক পরিকল্পনা গ্রহণ আর রূপায়ণ করা হয়েছে, বহু নির্দেশ নিয়ন্ত্রণ আইন বলবৎ হয়েছে, তা আবার শিথিল করা হয়েছে, নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার করা হয়েছে ; এখন একবিংশ শতাব্দীতে উত্তরণের চেষ্টা চালু আছে, অথচ আমরা বৃহৎ জনসংখ্যা বা দরিদ্র মানুষের পক্ষে অবস্থা ক্রমাগত খারাপ হতে দেখছি। প্রায় চল্লিশ বছরের অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিত বাদ দিয়ে অন্যভাবে সমস্যা সমাধানের কোনো মৌলিক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, তা ভাবা যায় না। স্থিতাবস্থা বা এই ব্যবস্থাটি টিকিয়ে রাখায় যাদের স্বার্থ, তারা অবশ্য ব্যাপক জনসংখ্যার নিদারুণ দারিদ্র্য আর বঞ্চনা-জনিত বিক্ষোভের উদ্বেগজনক বিস্ফোরণের সম্ভাবনা সম্পর্কে কিছুটা সচেতন আছেন—রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন প্রকল্পের মধ্যেও সেই সতর্কতার বহিঃপ্রকাশ। আর একটা কথা মনে রাখতেই হয়—প্রশাসনিক দক্ষতা বা দৃঢ়সংকল্প ইত্যাদি উপরিকাঠামোর সমস্যা, ভিত্তি তাকে প্রভাবিত করবেই। বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণে শ্লথগতি, শিথিলতা বা জড়ত্ব বা অন্যান্য গুরুতর ত্রুটি কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। আর একটা কথা আমরা ভুলতে পারি না—স্বাধীনতার এতদিন পরও সরকারি প্রশাসনের ঔপনিবেশিক কাঠামোটির সামান্যতম পরিবর্তন ঘটানো হয় নি।

একটা প্রশ্ন এখানে খুব সংগতভাবেই আসতে পারে। অধ্যাপক দত্ত তাঁর আলোচনায় সমস্যা সমাধানের জন্য যে প্রস্তাবগুলি রেখেছেন তা রূপায়িত করা সম্ভব কিনা বা রূপায়ণ সম্ভব হলে সম্পদবণ্টনের বৈষম্য দূর হবে কিনা, বা দারিদ্র্য আর কর্মহীনতার অবসান ঘটানো সম্ভব হবে কিনা?

তাঁর প্রস্তাবগুলি রূপায়ণের কোনো কাজই কঠিন নয়, এই কথাই বলেছেন ড দত্ত। এবং তিনি মনে করেন, এই অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যেই এই পরিবর্তন আনা সম্ভব। আমাদের মনে হয়েছে, যে প্রস্তাবগুলি তিনি রাখছেন তার রূপায়ণ অনেকটাই অর্থনৈতিক আর সামাজিক সম্পর্কের মৌলিক পরিবর্তন ছাড়া সম্ভব নয়। এটা হতে পারে, নতুন কর্মসংস্থান বাড়বে, আর সম্পদ বা আয়সৃষ্টি, উৎপাদনবৃদ্ধি ঘটবে। কিন্তু জনসংখ্যার ব্যাপক চাপ এবং সম্ভাব্য বৃদ্ধি অন্যান্য জটিলতার সংমিশ্রণে পরিস্থিতির খুব বদল ঘটাতে পারবে না। তার উপর অর্থনীতি সম্ভবত একটা মোড় নিতে চলেছে, মৌলিক কিছু নয় অবশ্য, যা অনেকটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে সাম্প্রতিক (৮৫-৮৬) কেন্দ্রীয় বাজেটে। অন্যত্র ড দত্ত যে কথা বলেছেন, 'সাপ্লাই সাইড ইকনমিকস'-এর তত্ত্ব আমরা সম্ভবত গ্রহণ করেছি। ঘাটতি বাজেট এবং অন্যান্য প্রতিক্রিয়ায় অভূতপূর্ব মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে। লোকসভায় খাদ্য আর অসামরিক সরবরাহ মন্ত্রী জানিয়েছেন : চার সপ্তাহে দেশে পাইকারি মূল্যবৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে ২·৩ শতাংশ। বছর-শেষে এই মূল্যবৃদ্ধি ৩০ শতাংশ ছাড়িয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে, খুচরো স্তরে এই মূল্যবৃদ্ধি ৪০ শতাংশ ছাড়িয়ে যাবে। যাই হোক, যে কথা বলা হচ্ছিল—'উৎপাদন বা তার বণ্টন দুই-ই সাম্যমুখী' করা এই আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় কোনো অবস্থাতেই সম্ভব নয়। অধ্যাপক দত্তের অন্যান্য অনেক প্রস্তাবও বাস্তবে রূপায়িত হওয়ার মতো অবস্থার উদ্ভব হওয়া কঠিন। দারিদ্র্যমোচন আর সমবণ্টনের সমস্যা তাই নিঃসন্দেহে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে একটা বিরাট, ব্যাপক এবং মৌলিক পরিবর্তন-সাপেক্ষ বিষয়।

তাই পনেরো বছর পর, এই শতাব্দীর প্রান্তে, সেদিনের কোনো অর্থনীতিবিদের জন্য কোনো উজ্জ্বল চিত্র সম্ভবত আমরা রাখতে পারছি না—ব্যাপক জনসমষ্টির পাণ্ডুর, জীর্ণ, নিরন্ন চেহারার এক নিদারুণ চিত্রই আমাদের সামনে ভেসে আসে। ইতিহাসের গতি যদি হঠাৎ বিস্ফোরণে অন্যদিকে মোড় নেয় তো স্বতন্ত্র কথা।

নীলমণি ধর
গড়িয়া স্টেশন রোড
কলকাতা-৮৪